ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ ঃ একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা সংসদের অন্তর্গত
দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত
গবেষণাপত্র

বর্ষ - ২০২২

ইন্দ্রাণী সেন

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

Certified that the Thesis entitled

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ ঃ একটি সমীক্ষা submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor (Dr.) Gangadhar Kar. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor :	Candidate :
Professor (Dr.) Gangadhar Kar Dated :	Indrani Sen Dated :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁর অকৃপণ ও নিরলস সহযোগিতা, আশীর্বাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনায় আমি এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি রচনা করতে সক্ষম হলাম, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই তথা গুরু অধ্যাপক (ডঃ) শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য। আমি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং শ্রদ্ধাবনতমস্তকে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছি। শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময় থেকেই যাঁদের কাছে পাঠগ্রহণের ফলে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তৈরী হয়, তাঁরা আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সমীর কুমার চক্রবর্তী এবং অধ্যাপিকা (ডঃ) মিতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পরলোকান্তরিতা অধ্যাপিকা (ডঃ) কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসতে পারি, যাঁর অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি। যাদবপুর বিশ্ববিধ্যালয়ে এম.ফিল করার সুযোগ পাই অধ্যাপিকা (ডঃ) রত্না দত্ত শর্মার কাছে। ন্যায়শাস্ত্রের যেকোন বিষয়ের উপর তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জ্ঞাপন করছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানকালীন বিভাগীয়প্রধানা অধ্যাপিকা (ডঃ) অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাচ্ছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিদ্যুৎবিহারী সরকার এবং সহকারী শ্রীমতি কাকলি জোয়ারদার - এঁদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। করিমপুর পান্নাদেবী কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করার পর যে

সব সহকর্মীদের থেকে গবেষণার কাজটি শেষ করার উৎসাহ পেয়েছি , তাঁদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

যাঁদের আশীর্বাদে এবং উৎসাহে এই নিবন্ধটি পূর্ণরূপ পেল, আমার সেই পিতৃদেব শ্রীশিলাজিৎ সেন এবং মাতৃদেবী শ্রীমতি সুস্মিতা সেন-এর চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বামী শ্রীভাস্কর রায়কে, যাঁর উপস্থিতি আমাকে গবেষণাসংক্রান্ত প্রযুক্তিগত বিষয়ে সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ করেছে। গবেষণার কাজ করার এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের নানা ওঠা-পরা, মানসিক যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠে পুনরায় পড়াশুনার কাজে মনোনিবেশ করতে পেরেছি যার কারণে, সে আমার অত্যন্ত আদরের কন্যা ঐশী রায়। ওর প্রফুল্লিত মেজাজ আমাকে সবসময় মনোবল দিয়েছে। সর্বোপরি, যাঁর ইচ্ছা ও কৃপা ব্যতীত গবেষণার কাজটির সূচনা বা সমাপ্তি কিছুই সম্ভব হত না, সেই পরমকরুণাময়ী জগজ্জননী মা তারার চরণকমলে প্রণামাঞ্জলি নিবেদন করছি।

বিষয়-সূচি

বিষয়	*পৃষ্ঠাঙ্ক*
ভূমিকা	১ - ১৫
প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান	১৬ - ৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ	৫৪ - ৯২
তৃতীয় অধ্যায় : অন্যান্য আস্তিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ	৯৩ - ১৬০
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব	১৬১ - ২০০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ দুঃখই মুক্তির সোপান	২০১ - ২৪৭
উপসংহার	২৪৮ - ২৬৬
গ্রন্থপঞ্জী	২৬৭ - ২৭৩

ভূমিকা

''সুখতরে সবাই কাতর, কে বা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা?
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা।।'' - স্বামী বিবেকানন্দ

জীবমাত্রই সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত বদ্ধ জীব সর্বদা সুখের জন্য লালায়িত এবং তাদের সব কর্মের সম্পাদন বা যাবৎ কর্মে প্রবৃত্তি এই সুখের কথা ভেবেই। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে জল ভেবে পথিক যেমন সেই পথে ধাবিত হয়, তেমনি মানুষ যেখানেই সুখের বিন্দুমাত্র সন্ধান পায়, সেখানেই সুখান্বেষণে ছুটে চলে। 'এই সুখের জন্য দাতা দান করেন, গ্রহীতা হাত পাতে; সুখের জন্যই রাজা রাজমুকুট মাথায় পরেন, অপরদিকে একটু সুখের আশায় কাঙালিনী ভিখারী তৃণগুচ্ছ ও পাতার দ্বারা কুটির বাঁধে। সুখের দুর্নিবার আকর্ষণে কেউ গঞ্জিকা সেবন করে, কেউ বা রঙিন দ্রব পদার্থকে সুরাপাত্রে ঢালতে ঢালতে সুখে বিভোর হয়ে পড়ে। এই সুখের জন্যই চোর চুরি করে, কেউ বা ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে।''[১] কিন্তু জীব সুখের কাঙ্গাল হলেও সুখমাত্রই দুঃখ সম্পৃক্ত। সংসার সুখ ও দুঃখময়। মানুষের জীবনে দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে। দুঃখ সর্ব জীবের অনুভবসিদ্ধ পদার্থ। দুঃখ আমাদের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় এর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রমাণিত হয়। জগতে এমন জীবের সন্ধান পাওয়া দুর্লভ যার কখনো কোন দুঃখের অনুভূতি হয়নি। দুঃখের অস্তিত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারেনা।

[১] নীল আকাশের নীচে, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০২১।

ন্যায়দর্শনে দুঃখকে 'প্রতিকূলবেদনীয়' বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে বেদনা বা অনুভূতি আমাদের প্রতিকূল, তাই হল দুঃখ। অন্য ভাষায় বলা যায় যে, যে অনুভূতি হওয়ামাত্র আমরা বুঝি যে সেটা আমরা চাই না, সেই অনুভূতিই হল দুঃখ। প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ায় দুঃখকে আমরা কেউই সচেতনভাবে কামনা করি না। অর্থাৎ কোন জীবই দুঃখ চায় না, কারণ দুঃখ হ'ল বেদনাস্বরূপ।

ধর্মার্থকামমোক্ষ - এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংসারে জরা, মৃত্যু আদি দুঃখ যেমন আছে তেমনি সুখও আছে। সুখ জীবনে আছে বলেই মানুষ বাঁচতে চায়। সুখ ও দুঃখের অতিরিক্ত স্বর্গ বা নরক বলে কিছু নেই।

তবে নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাক দর্শন মোক্ষকে পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার না করলেও জৈন ও বৌদ্ধ - এই দু'টি নাস্তিক দর্শন কিন্তু মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন। জৈনদর্শনে দুঃখক্লিষ্ট সংসারী আত্মাকে জীব বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবমাত্রেরই দুঃখভোগ অনিবার্য। বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে বাকী পুরো আলোচনাই দুঃখকেন্দ্রিক। এই দর্শনের চতুর্বিধ আর্যসত্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আর্যসত্য হল দুঃখ। জন্ম থাকলেই জরা, মরণ, ব্যধি, শোক, নৈরাশ্য ইত্যাদি থাকবেই; এগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। এইসবই দুঃখ।

ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দুঃখ অন্যতম। দুঃখকে একাদশ প্রমেয়ের স্থানে রাখা হয়েছে। নৈয়ায়িকগণের মতে, প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান থেকেই সাক্ষাৎভাবে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। কাজেই, দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও যে মোক্ষের সহায়ক, তা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। এই বিষয়টি থেকে একথাও পরিস্কারভাবে বোঝা যায়

যে, দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়ই মিথ্যাজ্ঞান আছে, যে কারণে দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজনীয়। সুতরাং, দুঃখ বিষয়ে আলোচনার আবকাশ আছে।

বৈশেষিক দর্শনে দুঃখকে গুণ নামক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, গুণ মাত্রই কোন না কোন আশ্রয়ে থাকে। গুণ নামক পদার্থের আশ্রয় হল দ্রব্য। দুঃখ নামক গুণের আশ্রয় দ্রব্য হল আত্মা। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার, জ্ঞান - এগুলিকে জীবাত্মার বিশেষ গুণ বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রেও মহর্ষি দুঃখকে আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ বলেছেন।[২]

সাংখ্যদর্শনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিন গুণের অর্থাৎ উপাদানের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হয়েছে। সত্ত্বাদি হল প্রকৃতির উপাদান। সত্ত্ব গুণ সুখোৎপাদক। রজঃ গুণ দুঃখস্বরূপ এবং জীবের সকল দুঃখের কারক। এই দর্শনে দুঃখকে রজঃগুণের পরিণাম বলা হয়েছে। আর তমঃ গুণ আবরক এবং মোহ সৃষ্টিকারী। জগতের সব বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ থাকায় জাগতিক বস্তুমাত্রই সুখ, অথবা দুঃখ অথবা মোহের জনক হয়ে থাকে।

সাংখ্যদর্শনেরই প্রায়োগিক দর্শন হল যোগ। যোগদর্শনে বলা হয়েছে, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'; অর্থাৎ যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা লয়ই। চিত্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে তা বিষয়াকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকার ধারণরূপ পরিণাম বা বিকারই হল চিত্তবৃত্তি। যোগদার্শনিকগণ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি - এই পাঁচপ্রকার চিত্তবৃত্তি স্বীকার করেছেন। এগুলির মধ্যে বিপর্যয় হল মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই যাবৎ দুঃখের মূল।

পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্মই গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনে বলা হয়েছে, বেদের বিধি অনুসরণ করাই হল ধর্ম। ধর্ম পালনের মাধ্যমে যে অদৃষ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে অপূর্ব বলা হয়েছে। ধর্মের সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন এই অপূর্বই জীবের সুখের কারক।

[২] 'ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১০।।

অপরদিকে, বেদবিধি অমান্য করলে যে অধর্মের উৎপন্ন হয়, তার ফলে জীব দুঃখভোগ করে থাকে। যদিও ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনাই এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় দুঃখ সংক্রান্ত আলোচনা এই দর্শনে পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের সূচনা হয়েছে, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' - এই সূত্রের দ্বারা। ব্রহ্মের প্রতিপাদনই বেদান্ত দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। সেখানে বলা হয়েছে, সংসারই বন্ধন। অর্থাৎ বদ্ধজীবই জাগতিক দুঃখ, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি ভোগ করে থাকে। তবে, শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে এটিই দেখিয়েছেন যে, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীবের দুঃখাদি থাকলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগত হল মিথ্যা বা মায়া। অর্থাৎ দুঃখ বলে আদৌ কিছু নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আবার, রামানুজাচার্য বলেছেন যে, সংসারে আবদ্ধ তথা বদ্ধজীবই সাংসারিক দুঃখভোগ করে থাকে।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সব দর্শনেই কম-বেশী দুঃখের আলোচনা হয়েছে। জগতে যে দুঃখ আছে, অর্থাৎ জগত দুঃখময় - একথা সকলেই স্বীকার করেছেন; কারণ তা জীবমাত্রের প্রত্যক্ষবেদ্য। তবে, ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবের দুঃখ আছে - একথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তাঁরা এই দুঃখজয়ের পথ নির্দেশ করেছেন। বস্তুতঃ দুঃখ আছে বলেই তা নিবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে। দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের অনুসন্ধান করেছেন ভারতীয় দার্শনিক। ক্ষুধা, তৃষ্ণাজন্য যে দুঃখ, তা খাদ্যগ্রহণ, জলপানের মাধ্যমে যেমন নিবৃত্ত হয়, তেমনি যাবৎ দুঃখ-নিবৃত্তিও অসম্ভব নয়।

দুঃখের অভিঘাতের ফলেই জীবের দুঃখ থেকে মুক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়ে থাকে। আমরা আমদের দৈনন্দিন জীবনে দেখি যে, আমাদের শরীর খারাপ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই; মানসিক কোন সমস্যা হলে বা মন খারাপ হলে মনোবিজ্ঞানী বা মনোসমীক্ষকের দ্বারস্থ হই;

আবার, হর্ষ দ্বারা শোকের উপশম করি। এগুলি সবই লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তির উদাহরণ। এই উপায়ে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয় বটে, তবে তা পুনরায় ফিরে আসে। দুঃখের পুনরায় আগমনের ফলে দুঃখের নিবৃত্তি সামগ্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ জীব একটি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেলেও অন্য এক বা একাধিক দুঃখ তার পশ্চাদ্ধাবন করে; অথবা সেই দুঃখই কালান্তরে ফিরে আসে। তা ছাড়া, লৌকিকভাবে দুঃখনিবৃত্তির যে উপায়গুলি প্রসিদ্ধ, সেগুলি নিশ্চিতভাবে দুঃখনিবৃত্তি সবক্ষেত্রেই করতে পারবে - এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন, কোন একটি ওষুধ যে নির্দিষ্ট প্রকারের রোগ নিরাময়ের জন্য নির্দিষ্ট, সেটি যে সব রোগীর উপর সমানভাবে কার্যকর হবে, সেকথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং, দুঃখনিবৃত্তির লৌকিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়না। আবার, আনুশ্রবিক উপায় বা যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমেও দুঃখের নিবৃত্তির কথা মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে। তবে, যাগাদির অনুষ্ঠানের ফলে জীবের যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই স্বর্গসুখও কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না; কারণ, অনুষ্ঠিত কর্মজন্য পুণ্য ক্ষয় হলেই স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের জরা-মরণ সম্পৃক্ত জগতে পুনরাগমন ঘটে।[৩] তা ছাড়া, যাগযজ্ঞের ফলে পশুবধাদিজন্য পাপের ভোগ জীবের অনিবার্য। ফলতঃ যাগাদিও দুঃখের চিরনিবৃত্তি ঘটাতে অসমর্থ।

তা হলে প্রশ্ন হয় যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কীভাবে সম্ভব? বস্তুতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করতে হলে দুঃখের মূল কারণকে সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন; কেননা কারণের উচ্ছেদ হলেই কার্যের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন যে, সংসারে জন্মগ্রহণই হল দুঃখের মূল কারণ। যেহেতু আমরা

[৩] 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'- গীতা ৯।২১।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে দুঃখের অনুভব করে থাকি, সেহেতু জীবের শরীর পরিগ্রহই হল দুঃখের মূল কারণ।

এখানে কেউ বলতে পারেন যে, শরীরাবচ্ছেদে তো জীবের সুখের অনুভবও হয়ে থাকে। তবে, জীবের শরীর পরিগ্রহ বা জন্মগ্রহণ শুধুমাত্র দুঃখের নয়, তা সুখেরও কারণ; কিন্তু তবুও জ্ঞানীগণ এই সুখকে যথার্থ সুখ বলে মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁরা জাগতিক সুখকে দুঃখেরই প্রকার বলে মনে করেছেন। যেমন, ন্যায়দর্শনে সুখকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়নি; বরং সুখকে ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর একবিংশতি প্রকার দুঃখের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সাংখদর্শনে বলা হয়েছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিনটি গুণ জাগতিক সব বস্তুর মৌলিক উপাদান। রজঃ গুণ দুঃখময় হওয়ায় জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই দুঃখ উৎপন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্ত্ব গুণ সুখের কারক হওয়ায় এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ থাকায় একই বস্তু, যা এক ব্যক্তির কাছে সুখের সঞ্চার করে, তা অপর ব্যক্তির কাছে অথবা ভিন্ন কালে সেই ব্যক্তির কাছেই দুঃখের কারক হয়ে থাকে। সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, ''তদপি দুঃখকা চলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষেপন্তে ৰিৰেচকাঃ''; অর্থাৎ যা আপাতদৃষ্টিতে সুখকর বলে প্রতীত হয়, তাও দুঃখমিশ্রিত; এই কারণে বিবেকী ব্যক্তিগণ সুখকেও দুঃখ বলেই বিবেচনা করে থাকেন। আবার, বিষয়মাত্রকেই বিবেকী ব্যক্তি দুঃখরূপে জ্ঞান করবেন - একথা যোগদর্শনে বলা হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, 'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিৰিরোধাচ্চ দুঃখমেৰ সর্ব্বং ৰিৰেকিনঃ'; অর্থাৎ পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এবং গুণবৃত্তির বিরোধ হেতু সংসারের সবই বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখময়। সুতরাং, যথার্থ সুখ বলে কিছু নেই; সুখ বা দুঃখ কোনটিই নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুভব করা যায় না; সুখ মাত্রই দুঃখ-সম্পৃক্ত।

যাই হোক, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলি পাঠ করলে আমরা জানতে পারি যে, চার্বাক ব্যতীত সব দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক; সব দর্শনই জীবের দুঃখনাশের উপায় নির্ধারণে নিয়োজিত। জীবের সুখলাভ বা ইষ্টপ্রাপ্তি হোক বা না হোক, দুঃখনাশ অর্থাৎ অনিষ্ট পরিহারের উপায় অন্বেষণ করাই সব দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। সব নদীর গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাগরে মিলিত হওয়াই সেগুলির উদ্দেশ্য; ঠিক একইরকম ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিরও মূল উদ্দেশ্য জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিনাশ, যদিও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ অর্থাৎ উপায় সব দর্শনগুলিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং, মূলে সব দর্শনের মধ্যেই সমন্বয় বর্তমান। দর্শনগুলি সংসারকে দুঃখময় বলে নির্দেশ করেছেন। এই কারণে সব দর্শন সম্প্রদায়ই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হয়েছেন। এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

এখন, এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই কোন দর্শনে নিঃশ্রেয়স, কোন দর্শনে কৈবল্য, কোথাও নির্বাণ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। ঠিক যেমন 'জল' নামক পদার্থকে কখনো পাণীয়, কখনো সলিল, কখনো জীবন ইত্যাদি বিভিন্ন নাম বা শব্দ দ্বারা বোঝানো হলেও বস্তুগতভাবে 'জল' পদার্থের কোন ভিন্নতা বা পরিবর্তন হয়না, তেমনি জীবের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থাটিও বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্নভাবে অভিহিত হলেও তা আসলে একই। জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির যে অবস্থা অর্থাৎ জীবের মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেছেন, জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই হল মুক্তি। বৈশেষিক দর্শনানুসারে, পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-জ্ঞান দ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাই হল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। সাংখ্য বলেছেন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিহেতু কৃতকৃত্যতাই মুক্তি। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, মুক্তি হল জীবের অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ - এই দর্শনগুলিতে এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে,

সুখলাভ হোক বা না হোক, সর্বতোভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হলেই মুক্তিলাভ হয়। এইদিক থেকে বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণ এবং ন্যায়াদি দর্শনে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি একই পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের মতে মুক্তির স্বরূপ অন্যান্য দর্শনের থেকে স্বতন্ত্র; কারণ, এই দর্শনে শুধুমাত্র দুঃখের বিনাশকেই সার বলে মনে করা হয়নি; বরং দুঃখনিবৃত্তির পরবর্তী যে আনন্দময় অবস্থা, যে অবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অভেদ উপলব্ধ হয়, সেই অবস্থাপ্রাপ্তি হল মুক্তি। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মঃ'; অর্থাৎ ব্রহ্ম হ'ল সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সূর্যের প্রতিবিম্ব জলের উপর প্রতিফলিত হলেও সেখানে সূর্যের যে প্রভা, তার থেকে সূর্যমণ্ডলস্থিত প্রভার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে সংসারের সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের।

আসলে জগৎ-সংসারে দুঃখ আছে বলেই মুক্তির এত কদর। দুঃখই হল বন্ধন, সংসার-বন্ধন। বস্তুতঃ দুঃখই হল মুক্তির সোপান। দুঃখ আছে বলেই আমরা তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে। দুঃখ অনুভূত হলেই আমরা চাই কতক্ষণে দুঃখটা দূর হবে। কাজেই দুঃখের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই মুক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা পায়। যদি আমরা ন্যায়দর্শনের প্রমেয় বিভাগের দিকে দৃক্‌পাত করি, তা হলেও এই বিষয়ে একটি প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশের সময় দুঃখের অব্যবহিত পরেই অপবর্গের উল্লেখ করেছেন। দুঃখ না থাকলে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় না। দুঃখকে জয় করেই আনন্দলোকের পথে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং, দুঃখই হল মুক্তির সোপান।

বস্তুতঃ প্রয়োজনই জীবের সকল প্রবৃত্তির প্রযোজক। প্রয়োজন ছাড়া কোন নির্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। জীবের প্রয়োজনসাধনই যেকোন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ন্যায়শাস্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। জীবের প্রয়োজন হল চতুর্বর্গ পুরুষার্থ; অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি।

মোক্ষ বা অপবর্গই হল শাস্ত্রানুসারে পরম পুরুষার্থ। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রের প্রথমেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হল ঐ প্রয়োজনের সাধন। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে যে নিঃশ্রেয়স জন্মায়, তা অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। যা প্রকৃষ্টরূপে মেয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তাই হল প্রমেয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বস্তু বা বিষয়মাত্রই প্রমেয়। অর্থাৎ যা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ, তাই প্রমেয়। কিন্তু আত্মা থেকে অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই আত্মাদি পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে। কাজেই, মুমুক্ষুর পক্ষে আত্মাদি পদার্থই প্রকৃষ্টরূপে মেয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়। এই কারণেই মহর্ষি আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে প্রমেয় বলেছেন। কিন্তু এরূপ বললে প্রশ্ন হয় যে, প্রমেয় ভিন্ন অন্যান্য পদার্থের প্রয়োজনীয়তা কী? বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্র হল বিচারশাস্ত্র। এই শাস্ত্রে শুধুমাত্র বিচার পদ্ধতির প্রয়োগই হয়নি, বরং বিচার পদ্ধতির বিশ্লেষণও হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্র আমাদের বলেছে যে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান - এই পদার্থগুলি বিচারের সহায়ক। যেমন, সংশয় বিচারের পূর্বাঙ্গ; নির্ণয় হল বিচারের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য পদার্থগুলি নির্ণয়ে পৌঁছাতে সহকারী হয়ে থাকে। কাজেই, প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান যে অর্থে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, সেই অর্থে সংশয়াদি উক্ত চতুর্দশ পদার্থ মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় নয়। বরং, চরম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায়রূপে যে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎকারণ, সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়, সেই পদ্ধতির প্রয়োগ ও বিচারের স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে উক্ত চতুর্দশ পদার্থ সহায়ক হয়। আর জ্ঞান মাত্রের প্রতি

প্রমাণ অসাধারণ কারণ হওয়ায় প্রমাণও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক হলেও সাক্ষাৎকারণ নয়। সুতরাং, ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় ব্যতিরেকে অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থ পরম্পরায় মোক্ষের কারণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

'প্রদীপঃ সৰ্ববিদ্যানামুপায়ঃ সৰ্বকর্মনাম্।

আশ্রয়ঃ সৰ্বধৰ্মাণাং ৰিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।।'[৪]

অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য প্রমাণাদি পদার্থকে অবলম্বন ক'রে অন্যান্য শাস্ত্র নিজ নিজ প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদন করে। তাই ন্যায়শাস্ত্র সকল বিদ্যার প্রকাশক, তা সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্র সকল কর্মের উপায়স্বরূপ; কারণ, অন্যান্য শাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্মগুলির উপায়জ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রমাণাদির দ্বারাই হয়। তা ছাড়া, এই শাস্ত্র সকল ধর্মের আশ্রয় বা রক্ষক; কারণ, স্বপ্রতিপাদ্য কর্মে পুরুষকে প্রবৃত্ত করা সকল শাস্ত্রের ধর্ম। ন্যায়শাস্ত্র প্রতিপাদিত প্রমাণাদির সাহায্যে বিমৃশ্যকারী পুরুষগণ কর্তব্য নির্ণয় ক'রে তত্তদ্ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। এইভাবে ন্যায়শাস্ত্র সর্ববিদ্যা বা শাস্ত্রের প্রদীপ, সর্ব কর্মের উপায় ও সর্ব ধর্মের আশ্রয় বলে বিদ্যার উদ্দেশ্যেই প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়েছে। এইভাবে বাৎস্যায়ন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন। ভাষ্যকারের এই বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির এমন কোন কর্ম নেই যাতে ন্যায়শাস্ত্র আবশ্যক নয়।

আমার গবেষণামূলক নিবন্ধটির শিরোনাম হল ঃ ''ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ ঃ একটি সমীক্ষা''। আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়, যেগুলির তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে চরম নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক, দুঃখ তাদের মধ্যে মধ্যে অন্যতম। আমরা আগেই দেখেছি যে, সংশয়

[৪] ন্যায়সূত্র ১।১।১ - এর ভাষ্য।

যেকোনও বিচারের পূর্বাঙ্গ। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আলোচিত দুঃখ বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয়টি কী ? উত্তরে বলা যায় যে, সংশয়টি হল - অপবর্গ বা মোক্ষপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে দুঃখের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? জীবের দুঃখকে কী মুক্তির সোপান বলা যায়? পাঁচটি অধ্যায়ে আমার গবেষণামূলক নিবন্ধটিকে বিভক্ত ক'রে দুঃখ সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান'। জীব তার প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগের জন্যই বারবার সংসারে ফিরে আসে এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। সাংসারিক সুখ মাত্রই দুঃখ মিশ্রিত হওয়ায় খাঁটি সুখভোগ করা সংসারদশায় জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে, দুঃখকে জীব কোনভাবেই চায় না। আমরা সবাই চাই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে। ভারতীয় দর্শন চর্চার মধ্যেই দুঃখকে জয় করার মন্ত্র লুকিয়ে আছে। তবে, দুঃখ থাকলেও তা জয় করা সম্ভব - এই আশার আলোই বারবার জাগিয়েছেন ভারতীয় দার্শনিকগণ। যেমন, নাস্তিক বৌদ্ধদর্শন বলেছেন, দুঃখ আছে, দুঃখের কারণও আছে; আবার, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ও আছে। আস্তিক অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতকে মিথ্যা বা মায়া বললেও ব্যাবহারিক দিক থেকে জগতকে , জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে অস্বীকার করেননি। শুধু ভারতীয় দর্শন নয়, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রে আমরা এমন বহু চরিত্র ও উপাখ্যান পাই, যেগুলির পরতে পরতে শুধু দার্শনিকভাবই প্রকাশিত হয় না, বরং সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুঃখ-সম্পৃক্ত।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। এই কারণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দুঃখের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, দুঃখ সর্বজীবের প্রতিকূলবেদনীয়। যা কিছু এই দুঃখের সাথে অনুষঙ্গবিশিষ্ট , সেই সবই দুঃখ । এই কারণে জন্ম-মাত্রই দুঃখ। শুধু তাই নয়, দুঃখসম্বন্ধশূন্য

সুখ না থাকায় সুখও দুঃখ। ন্যায়বার্ত্তিককার একবিংশতিপ্রকার দুঃখের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেছেন। তবে, সুখ বা দুঃখের একটিও অপরটির অভাব নয়; তাছাড়া, দুঃখ জ্ঞানস্বরূপও নয় ইত্যাদি আলোচনার পাশাপাশি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে সত্যই পুরুষার্থ বলা যায় কিনা, দুঃখের কারণসমূহ ইত্যাদি বিষয়।

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, অদ্বৈতবেদান্ত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ - এই সব আস্তিক দর্শন অনুসারে দুঃখের লক্ষণ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে জীবের অনন্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক - এই তিন প্রকার দুঃখের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। দুঃখকে রজঃগুণের একপ্রকার পরণাম বলা হয়েছে এবং তা প্রত্যাত্মবেদনীয়। এটিই দুঃখের অস্তিত্বে প্রমাণ। তবে, সাংখ্য মতে দুঃখ জিহাসার বিষয় হলেও দুঃখের বিনাশ হয়না। সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় সাংখ্যগণ এই মত পোষণ করেছেন। এছাড়াও সাংখ্যগণ বলেছেন যে, দুঃখের সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত করানো সম্ভব। সৃষ্ট পদার্থ একদিকে যেমন জীবের ভোগের কারণ, তেমনি অন্যদিকে অপবর্গেরও কারণ। তাই ন্যায়দর্শনের মতো সাংখ্যদর্শনেও বৈরাগ্যকেই অপবর্গের সাধন বলা হয়েছে। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের সমানতন্ত্র হওয়ায় সাংখ্যকথিত দুঃখ সম্পর্কিত সব বক্তব্যই স্বীকৃত হলেও এই দর্শনে পঞ্চবিধ ক্লেশ সম্পর্কে আরো কথা বলা হয়েছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ - এই পাঁচ প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি, তা শিথিল করার উপায় ইত্যাদিও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া, পাঁচপ্রকার ক্লেশের আবার স্থূলবৃত্তি ও সূক্ষ্মবৃত্তি - এই দ্বিবিধ অবস্থা রয়েছে। আবার, পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ ও গুণবৃত্তিবিরোধজনিত দুঃখের কারণে যোগী বা বিবেকীর বিষয়ভোগও যে দুঃখ বলে প্রতীত হয়, সেগুলির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই অধ্যায়ে। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ - এগুলি বেদান্ত

দর্শনের অন্যতম প্রধান কয়েকটি শাখা। এই প্রত্যেকটি মতবাদ অনুসারে জীবের প্রকার বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে; কারণ, দুঃখ তো জীবই ভোগ করে। প্রত্যেকটি শাখাই বলেছে যে, জীবের সংসার তথা দুঃখভোগের কারণ হল তার পূর্বকৃত কর্ম। তবে বেদান্ত দর্শনের এই শাখাগুলির মধ্যে দুঃখ সম্বন্ধে যে স্বতন্ত্রতা বর্তমান, সেগুলি সবই এই অধ্যায়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

'ব্যাবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের জীবনে দুঃখের অভিঘাত কীভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণই তা আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের দুঃখের শিকার হয়ে থাকি এবং আমরা দেখি যে, দুঃখ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকে। কিন্তু দুঃখের গুরুত্ব আমাদের জীবনে অপরিসীম; কারণ আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ায় দুঃখকে শত্রু বলে মনে হলেও তা আসলে আমাদের বন্ধুরই মতো। বারংবার দুঃখের শিকার হয়ে জীবনের কোন না কোন সময়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই দুঃখ আমরা কেন পাচ্ছি? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ? - এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ যখন জানতে পারে যে, আমাদের পূর্বকৃত কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ, তখন সে ভবিষ্যত-দুঃখকে পরিহারের জন্য ধর্মানুসারী কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে। যেমন, নৈতিক উভয়সংকটের সময় দু'টি সমান বলশালী নৈতিক কর্মের মধ্যে ব্যক্তিকে যখন যেকোন একটি কর্ম সম্পাদন করে অপর কর্মটিকে বর্জন করতে হয়, তখন সেই অসম্পাদিত নৈতিক কর্মটির জন্য ব্যক্তির অনুশোচনাজনিত যে দুঃখ হয়, তা ব্যক্তিকে অনেক বেশী বাস্তববাদী ও সহনশীল করে তোলে। আবার, দুঃখভোগের ভয় ব্যক্তিকে নৈতিক কর্মে প্রবৃত্ত করে; যেমন - ক) পাপের ভয়ে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয় না। তবে, যদি কেউ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে থাকে, তাহলেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তার ক্ষয় সম্ভব হয়। আসলে পাপের ফলে অধিক দুঃখভোগের হাত থেকে রক্ষা

করে প্রায়শ্চিত্ত, যা অপেক্ষাকৃত লঘু দুঃখ। খ) মনুসংহিতাকার বলেছেন, কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন যেকোন ব্যক্তিকেই যত্নসহকারে বর্জন করা উচিৎ; কারণ, এগুলি পরিণামে দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে। গ) যোগদর্শনে কর্মবাদের আলোচনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে, যার মূলকথা হল - 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'। এখানে জন্মান্তরের সমর্থনেও বক্তব্য আছে। ভবিষ্যত-দুঃখের ভয়ে মানুষ যাতে পাপমূলক কর্মে লিপ্ত না হয় - এখানেই এই আলোচনার সার্থকতা। তাছাড়া, ঘ) গরুড় পুরাণ বলেছেন, কী ধরনের কর্ম করলে কোন্ যোনি প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর স্বরূপ, নরক যন্ত্রণার বিশদ আলোচনা রয়েছে এই পুরাণে, যা এই অধ্যায়ের আলোচ্য। এছাড়া, গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাও আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। তাছাড়া, আরো একটি বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনার পরিসরভুক্ত হয়েছে, যা হল - আমাদের নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণাই অন্য ব্যক্তির দুঃখ সম্পর্কে আমাদের ভাবতে সাহায্য করে। এই বিষয়টি যে শুধুমাত্র বর্তমান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানেরই আলোচ্য তা নয়, বরং ভারতীয় দর্শনেও এর উল্লেখ আছে।

সর্বোপরি, দুঃখই আমাদের বৈরাগ্যের জন্ম দেয় এবং মুক্তির পথ উন্মোচন করে। এই প্রসঙ্গেই 'দুঃখই মুক্তির সোপান' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে; কারণ, দুঃখ আছে বলেই মুক্তির এত কদর। দুঃখরূপী এই সোপান আমাদের সার্বিক পূর্ণতা প্রদান করে, কখনই আমাদের নিম্নাভিমুখী করে না। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও এই কারণেই আমরা দেখি যে, দুঃখের আলোচনার পরেই অপবর্গের আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গের স্বরূপ কী, দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তি অভাবস্বরূপ কিনা তাও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া, এই অধ্যায়ে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের আলোচনার

মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েই মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়, মানুষের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন ঃ

মাতৃগর্ভে প্রাণসঞ্চারের সময় থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে সব আচার, নিয়মবিধি আমরা পালন করে থাকি, সেই সবই আমাদের কাছে সংস্কার নামে পরিচিত। 'সংস্কার' শব্দটি থেকেই 'সংস্কৃতি' শব্দের উদ্ভব। 'সংস্কার' বলতে বোঝায় শুদ্ধিকরণ। তবে, 'সংস্কার' থেকে উদ্ভূত 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সামাজিক আচারবিধি এবং সমাজজীবনের নিয়ামক হলেও সেই আচার-আচরণ বা সামাজিক রীতিনীতির পিছনে যে মূল্যবোধ বা জীবনদর্শন নিহিত থাকে, সেগুলিও এই শব্দের অর্থের পরিসরভুক্ত। এই কারণেই ব্যক্তির আচরিত নীতির মাধ্যমেই মূল্যবোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই আচরণবিধিই এক এক ক্ষেত্রে এক এক নামে আমাদের কাছে পরিচিত; কখনো তা সংস্কৃতি, কখনো ধর্ম, আবার কখনো দর্শন।

প্রত্যেক সভ্য এবং শিক্ষিত সমাজেই কতকগুলি মৌলিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। আধ্যাত্মিকতা হল ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এখানেই ভারতবর্ষের স্বকীয়তা। আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই সংস্কৃতিকে অনন্যতা প্রদান করেছে। এক আধ্যাত্মিক আস্পৃহাই এই সংস্কৃতির নিয়ামক। এই কারণে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, ধর্মাচরণ, দর্শন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি সবকিছুই আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত। তবে, ভারতের এই আধ্যাত্মকতা অসাড় নয়। মনীষীদের চিন্তভাবনার

গণ্ডীর মধ্যেই তা আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কার্যকরী। কারণ, এই আধ্যাত্মিকতার সার্থক পরিণতিস্বরূপ ভারতবর্ষের নৈতিক আদর্শের বিদ্যমানতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। মানুষের চতুর্বিধ পুরুষার্থসমূহের মধ্যে পরমপুরুষার্থ মোক্ষের ধারণার পরেই ধর্ম তথা নৈতিকতাই প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। আর এই ধর্ম প্রসঙ্গেই দর্শনের কথা উঠে আসে। কারণ, ধর্ম হল পরম পুরুষার্থ মোক্ষে পৌছাবার সহকারী; আর, প্রতিটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সেই চরম লক্ষ্যকে স্থির রেখে নিজ নিজ পন্থার কথা বলেছেন। সুতরাং, ধর্ম ও দর্শন পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তবে, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ‘ধর্ম’ শব্দটি এখানে সংকীর্ণ, religion, অর্থে প্রযুক্ত হয়নি; বরং তা সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে কর্তব্য, নৈতিকতা, পন্থা ইত্যাদি ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তথা জীবের প্রয়োজন ঃ

যাই হোক, উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, মোক্ষই লক্ষ্য বা প্রয়োজন। বস্তুতঃ প্রয়োজনই যেকোন কর্মের প্রযোজক। প্রয়োজন না থাকলে কোন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি বা শিশু কেউই কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কোলের শিশু যখন কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাতৃক্রোড় থেকে লাফিয়ে ওঠে সেটি নেবার জন্য, তখনও সেই বিষয়টিকে তার নাগালের মধ্যে আনবারই তা প্রয়াস; অর্থাৎ সেই মুহূর্তে সেই বিষয়টি শিশুর প্রয়োজন। শুধু শিশু কেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের মধ্যেও প্রয়োজনের জন্যই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। সুতরাং, দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ণের ক্ষেত্রেও যে প্রয়োজন ছিল, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। শাস্ত্রের প্রয়োজন, শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞাত হলেই শাস্ত্র পাঠ করতে অথবা শ্রবণ

করতে পাঠক বা শ্রোতা প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। সেই কারণেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বহু স্থলেই আমরা দেখি যে, দার্শনিক তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভেই সেই গ্রন্থের প্রয়োজন বা চরম ফল বা তাৎপর্য্য কী - তা উল্লেখ করে থাকেন। প্রয়োজন নির্ধারিত হলে তা প্রাপ্তির উপায়ই হল দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তবে, দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা কী তা জানার অগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, জীবের প্রয়োজন কী?

প্রতিটি দর্শনশাস্ত্রই প্রতিভাত হয়েছে জীবের প্রয়োজনের কথা মাথার রেখে। জীবের প্রয়োজন কী - এ বিষয়ে বৈদিক দর্শনে যে ধারণাটি প্রচলিত, তা হল পুরুষার্থ। বৈদিক বা সনাতন ধর্মনীতি যে বিষয়গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে এই পুরুষার্থ অন্যতম। শ্রুতি, স্মৃতি এবং ভারতীয় দর্শনের সর্বত্রই 'পুরুষার্থ' শব্দটি বহুল প্রচলিত। পুরুষার্থের উল্লেখ ও আলোচনা নানভাবে নানাগ্রন্থে আছে। পুরুষার্থের স্বরূপ, সংখ্যা, বিভিন্ন পুরুষার্থের মধ্যে সম্বন্ধ বা তাদের সমন্বয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা ব্যাখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পুরুষার্থ কী অর্থাৎ পুরুষার্থের স্বরূপ জানতে প্রথমেই 'পুরুষার্থ' বিষয়টিকে দু'ভাবে বোঝা যেতে পারে; যথা - ১) যা জ্ঞাত হলে 'আমার হোক্' - এরূপে অভিলষিত হয়, তাই পুরুষার্থ।

২) পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনই হল পুরুষার্থ।[৫]

পুরুষার্থের উক্ত প্রথম অর্থানুসারে, সুখ এবং দুঃখাভাবই পুরুষার্থ। অন্যদিকে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বিধ হল দ্বিতীয় অর্থে পুরুষার্থ। তবে, যে অর্থেই আমরা পুরুষার্থ বিষয়টিকে গ্রহণ করি না কেন 'পুরুষের প্রয়োজন' - এই অর্থটিই পুরুষার্থের মুখ্য অর্থরূপে প্রতীত হয়; কারণ, জীব বা পুরুষ যে বিষয়টিকে তার প্রয়োজনীয় রূপে বোধ করে, সেই বিষয়টিকেই সে

---

[৫] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, ভারতীয় দর্শনকোষ (২য় খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৪, পৃ-১০০

'আমার হোক্' - এইরূপে অভিলাষ করে বা কামনা করে। অর্থাৎ জীবের প্রয়োজনই কোন বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তির নির্ধারক হয়ে থাকে।

'পুরুষার্থ' শব্দস্থিত 'পুরুষ' বলতে বিশেষভাবে জীবকে বোঝায়। জীবের সাধারণ প্রবৃত্তি সুখের প্রতি অথবা দুঃখাভাবের প্রতি। ন্যায় মতে, সুখ মাত্রই দুঃখানুসক্ত হওয়ায় বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর সুখকেও দুঃখের প্রকাররূপে অর্থাৎ দুঃখরূপে অভিহিত করেছেন।[৬] কিন্তু সুখের প্রতি যে মানুষের প্রবৃত্তি হয়, তা অনুভবসিদ্ধ। সুখ যতই স্থূল হোক না কেন আমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন এই সুখপ্রাপ্তির জন্য, দুঃখাভাবের জন্য এবং দুঃখ পরিহারের জন্য এই দিক থেকে বিচার করলে সুখ এবং দুঃখাভাবই হল ইষ্ট। এই ইষ্টের প্রতি ইচ্ছা হয় ইষ্টজ্ঞানবশতঃ। আমরা সুখ ও দুঃখাভাব স্বভাবতঃই ইচ্ছা করি। অর্থাৎ 'আমাদের সুখপ্রাপ্তি হোক, দুঃখ না হোক' - এইরূপ ইচ্ছা স্বভাববশতঃই হয়ে থাকে। সুখ এবং দুঃখাভাবে জীবের স্বাভাবিক ইচ্ছা হওয়ায় এই উভয়কে স্বতঃপুরুষার্থ বলে। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলী টীকায় বলেছেন, যে বিষয় জ্ঞাত হওয়ামাত্র স্ববৃত্তিত্বরূপে অর্থাৎ 'আমাতে বর্তমান থাকুক' বা 'আমার হোক' - এইরূপে ইচ্ছার বিষয় হয়, সেই বিষয় হল স্বতঃপুরুষার্থ।[৭] অর্থাৎ যে বিষয় অপর ইচ্ছার অধীন না হয়ে তথা অপর ইচ্ছার অনধীন হয়ে স্বতঃই ইচ্ছার বিষয় হয়, তাই হল স্বতঃপুরুষার্থ।[৮] অপরদিকে, সুখ ও দুঃখাভাব ইষ্ট হওয়ায় যে উপায় বা সাধনের দ্বারা এই উভয়প্রকার ইষ্টপ্রাপ্তি

---

৬ ''সুখং দুঃখানুষঙ্গাৎ।'' -উদ্দ্যোতকর, গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ- ২।

৭ ''ফলন্তু সুখং দুঃখাভাৰশ্ব। তত্র ফলেচ্ছাং প্রতি ফলজ্ঞানং কারণম্। অতএৱ স্বতঃপুরুষার্থঃ সম্ভৱতি, যজ্ জ্ঞাতং সৎ স্বৱৃত্তিতয়েষ্যতে, স স্বতঃপুরুষার্থ ইতি তল্লক্ষণাৎ।'' - বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচর্য, ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মুক্তবলীটীকাসহ) - শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাবদ, ১৪৬ সংখ্যক কারিকার মুক্তাবলী, পর - ৫৫৪ - ৫৫৫।

৮ ''ইতরেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং ফলিতো২র্থঃ।'' - তদেব, পৃ - ৫৫৫

হয়, সেই উপায় বা সাধন হল ইষ্টসাধন এবং পরতঃপুরুষার্থ। সুখ ও দুঃখাভাব স্বতঃই ইচ্ছার বিষয় হলেও সুখ ও দুঃখাভাব ব্যতিরেকে অন্য সকল বস্তুর ইচ্ছা সুখসাধনতাজ্ঞানবশতঃ এবং দুঃখাভাবসাধনতাজ্ঞানবশতঃ হয়ে থাকে। এই কারণে সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন হল পরতঃপুরুষার্থ। কাজেই, ইতরেচ্ছাধীন ইচ্ছার বিষয়ই পরতঃপুরুষার্থ। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাভাব ব্যতীত আন্য সকল বস্তুর ইচ্ছা সুখেচ্ছাধীন বা দুঃখাভাবেচ্ছাধীন (অর্থাৎ ইতরেচ্ছাধীন) হওয়ায় ঐ সকল বস্তু পরতঃপুরুষার্থ।

জীবের প্রয়োজনস্বরূপ পুরুষার্থের আলোচনার পর এখন প্রশ্ন হয় যে, মোক্ষকে কেন মানুষের প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়েছে ? মোক্ষ হলো মুক্তি। যেসব দর্শন সম্প্রদায় দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, মৃত্যুই মুক্তি নয়। মৃত্যুতে ব্যক্তির জড়দেহের বিনাশ হলেও আত্মার কিন্তু মুক্তি নেই। তাকে আবার ফিরে আসতে হয় এই সংসারে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

‘ৰাসাংসি জীর্ণানি যথা ৰিহায় নৰানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি ৰিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নৰানি দেহী।।’[৫]

অর্থাৎ মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরকম দেহী তথা আত্মাও পুরাতন জীর্ণ শরীর বর্জন করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন জীবাত্মা বারবার এই জগতে ফিরে আসে? জীবাত্মা আসে তার প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগের উদ্দেশ্যে। ভোগ অর্থাৎ সুখভোগ ও দুঃখভোগ। দিনের পরে রাত, আলোর পরে অন্ধকার যেমন আসে তেমনই সুখের পরে দুঃখ আসবেই। এটি অনিবার্য নিয়মের মতই হয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জগতে কেউই পায় না। বস্তুতঃ জাগতিক সব সুখের মধ্যেই দুঃখ রয়েছে। বিশ্বকবি

[৫] শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যায় - ২ , শ্লোক - ২২

বলেছেন, 'সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে তো কেবলই যাতনাময়'। জগতে তাবৎ বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা, তা আসলে আসক্তি। এই আসক্তির বশবর্তী হয়েই আমরা যাবতীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। সেই সম্পর্ক জড় বস্তুর সাথে হতে পারে, আবার অজড় ব্যক্তি বা প্রাণীর সাথে হতে পারে। কিন্তু জগতে এমন কোন সম্পর্ক নেই যা আমাদের খাঁটি সুখ দিতে পারে। খুব প্রিয় বস্তুর বিনাশে দুঃখ, আদরের পোষা প্রণীটির শারীরিক অসুস্থতায় বা তার বিয়োগে দুঃখ, ভালোবাসার মানুষের সাথে বিচ্ছেদে বা জীবনবিয়োগে এমনকি তাদের সামান্য অবহেলাতেও আমাদের দুঃখের শেষ নেই। সুতরাং, ব্যবহারিক জীবনে দুঃখ থাকবেই। অর্থাৎ সংসারে সব সুখই দুঃখ মিশ্রিত তথা 'মধু-বিষ-সম্পৃক্তম্ অন্নম্ অত্র উদাহরণম্'।

তবে যাই হোক, এই দুঃখকে আমরা কেউই সচেতনভাবে কামনা করি না। 'দুঃখ', 'জ্বালা', 'বেদনা', 'যন্ত্রণা', 'তাপ', 'কষ্ট', 'ব্যথা' ইত্যাদি শব্দগুলির কোনটিই হুবহু অন্যটির প্রতিশব্দ না হলেও প্রত্যেকটিই দুঃখবাচক শব্দ। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, দুঃখ মানেই তা মানসিক। কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা মনের যেমন হয়, শরীরেও হয়। মনোকষ্ট যেমন বলি, তেমনই খুব খিদে পেলে আমরা বলে থাকি 'খিদেয় পেট জ্বলছে'; আবার বলি 'মাথার যন্ত্রণা করছে'। তবে, শব্দের প্রয়োগ যেভাবেই হোক না কেন প্রতিটিই দুঃখবাচক। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে 'দুঃখ' মানসিক বলে মনে হলেও ব্যাপক অর্থে শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই; কারণ, দুঃখ এমনই একটি অনুভূতি যা অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বুঝি যে, সেটা আমরা চাই না। দুঃখ শারীরিক হোক বা মানসিক, আকস্মিক হোক বা পূর্বনির্ধারিত, ক্ষণিক হোক বা দীর্ঘস্থায়ী, আঘাতজনিত হোক বা কোন প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদে হোক, বা কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবজনিত হোক - সব রকমের দুঃখেরই স্বরূপ এক। এটি আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত বলে প্রতিভাত হয় বলে আমরা সবসময়ই চাই 'এটা না হলে ভালো হতো' বা 'কখন এই অনুভবটি বন্ধ হবে'

অথবা 'এটি চলে যাক'। তাই ন্যায়দর্শনে দুঃখকে প্রতিকূলবেদনীয় বলা হয়েছে। সুতরাং, 'দুঃখটা দুঃখই নয়'[১০] যদি না সেটা থেকে বেরোবার একটা ছটফটানি আমাদের মধ্যে থাকে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা সবাই মরিয়া হয়ে থাকি।

সুতরাং, আসল প্রশ্নটা এখানেই যে, কীভাবে জাগতিক দুঃখ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব? তা কী আদৌ সম্ভব? এই প্রশ্নই সকল শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের মূল। বেদাদি শাস্ত্র, দর্শনচর্চার মূলে আছে দুঃখ জয়ের সাধনা। অর্থাৎ জীবের প্রয়োজনেই ভারতীয় দর্শনচর্চার অপরিহার্যতা অবশ্যস্বীকার্য। যেকোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কী, কীভাবে, কেন ইত্যাদি প্রশ্ন হয়ে থাকে। বিজ্ঞান কোন বিষয় কী এবং তা কীভাবে সম্ভব - এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হলেও 'কেন' প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র দর্শনই দিতে পারে। যেমন, মৃত্যু সম্পর্কে যদি প্রশ্ন হয় যে, মৃত্যু কী, তাহলে সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলবে, মৃত্যু হল এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তির হৃদ্স্পন্দনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, মস্তিষ্কের ক্রিয়া চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন যে চেতনাহীন দেহ থাকে, সেই দেহেরই মৃত্যু হয়েছে বলতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও মৃত্যুর সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে, তথাপি সেই আলোচনা আমাদের এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয় এবং তা ছাড়া, 'কীভাবে মৃত্যু হল' এরও নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে। তবে, 'মৃত্যু কেন' বা 'মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা কী' - এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ভার দর্শনের কাঁধে অর্পিত। তবে, এ জাতীয় অধিবিদ্যক বিষয়ের প্রতি মানুষের কৌতূহলের নিবৃত্তিই দর্শনচর্চার উদ্দেশ্য নয়; বরং জীবনকে দুঃখমুক্ত, সুন্দর, মহৎ করার লক্ষ্যে সকল ভারতীয় দার্শনিক দর্শনচর্চায়, দর্শনশাস্ত্র রচনায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এই কারণেই প্রতিটি দার্শনিক গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলা হয়ে থাকে যে, সেই গ্রন্থ কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ করে। প্রায় সকল দর্শনেই পরম পুরুষার্থ তথা মোক্ষকে

[১০] অরিন্দম চক্রবর্তী, মননের মধু, পৃ - ১৫৭ , দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪, গাঙচিল, কলকাতা

লক্ষ্যরূপে স্থির করে মোক্ষলাভের উপায়ের কথা বলা হয়েছে। সুতারাং, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষাই দর্শনচর্চার মূলে বিদ্যমান। কোন সম্প্রদায় বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি, কেউ বলেছেন কর্মের দ্বারা তা লাভ করা যায়; আবার কেউ জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়বাদে বিশ্বাসী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই হল দর্শন (ফিলসফি)। অর্থাৎ জ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনাই পাশ্চাত্যে মুখ্য। আর, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে মোক্ষলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য; আর তত্ত্বজ্ঞানেই মোক্ষলাভ সম্ভব (চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই তা স্বীকার করেন)। সুতরাং, জীবনের প্রয়োজনে ভারতীয় দর্শনচর্চা অনিবার্য। অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকগণের কাছে দর্শন হল এমন যা জীবননিষ্ঠ। যে দার্শনিক আলোচনা শুধুমাত্র উদ্ভট কল্পনার জাল রচনা করে, সেই দর্শন আলোচনার কোন মূল্য নেই, তা তাৎপর্যহীন। এই কারণে জীবের পরমপুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তিকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে ভারতীয় মনীষিগণ দার্শনিকগণ বিচার করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকগণ বিচার করে দেখেছেন যে, জগতে সুখের তুলনায় দুঃখের প্রাবল্য অনেক বেশী। রাতের আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে যেমন সামান্যকালের জন্য অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর ঝলক দেখা যায়, তেমনি মানুষের জীবনেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখই দীর্ঘস্থয়ী, যেখানে সুখ বিদ্যুতের প্রকাশের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কেন ভারতীয় দার্শনিকগণ একথা বলেছেন যে, মানুষের জীবনে দুঃখের বর্ষার প্রবলতা বেশী? কারণস্বরূপ বলা যায় যে, মাতৃজঠরে ভ্রূণের আবির্ভাবের কাল থেকে সেই ভ্রূণের পরিপক্ক হওয়া, শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া, শিশুর বৃদ্ধি - কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু - এই সবেই দুঃখ। আবার, মৃত্যুতেই এই দুঃখের শেষ হয় না; মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ পরলোকেও জীবের তথা জীবাত্মার নানাধরণের দুঃখ ভোগ করতে হয়; যেমন, নরকপ্রাপ্তি তো যন্ত্রণাদায়ক বটেই; স্বর্গপ্রাপ্তিও সাময়িক সুখকর হলেও তা হারানোর ভয়জনিত দুঃখ থাকেই। তারপর আবার পুনর্জন্ম। গর্ভাবস্থায় জীবের যন্ত্রণা কম নয়। মাতৃজঠরে অষ্টম মাসে ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ

হলে নবম মাসে গর্ভস্থ জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের স্মৃতির উদ্রেক হয়। পূর্বের নানাজন্মে সে যে সব যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই সব জীবনের মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ের স্মৃতি জেগে ওঠে। জীব ভাবে যে, সে বার বার দেহধারণ করেছে এবং দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ বারবার সে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে জগতের মায়ায় আসক্ত হয়ে দুঃখসাগর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আত্মোদ্ধারের পথ অবলম্বন করেননি এবং এই কারণেই তাঁকে আবার এই গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হতে হয়েছে। নবম মাসে গর্ভস্থ জীব এভাবে পরিতাপ করে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, এবার গর্ভ থেকে মুক্ত হলে যাতে এই সংসারচক্রের আবসান হয়, ভবযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেজন্য কর্মফল মুক্তিদাতা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হবে। কিন্তু শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তার এ সব আর কিছুই মনে থাকে না। জগতের বৈচিত্র্য দেখে সে আবার মোহের বশে পূর্ব পূর্ব জন্ম-মৃত্যুর স্মৃতিকে বিস্মৃত হয়।[১১] শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই কাঁদে। মাতৃজঠরে দীর্ঘদিন থাকার পর চারিদিকের উজ্জ্বল আলো, উষ্ণ অনুভূতির হঠাৎ আবসান ইত্যাদির ফলে শিশু নিজেকে অরক্ষিত মনে করে কাঁদে। সেটাও তো একপ্রকার দুঃখই, কান্না যার বহিঃপ্রকাশ। এরপর শৈশব , কৈশোর, যৌবনে মানুষ নানা ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই সকল ভোগের উপকরণ না পেলে তা যে দুঃখদায়ক হয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে, সেই সব ভোগ্যসামগ্রী পেলেও মানুষের দুঃখের অবসান হয়না; কারণ, ‘আর একটু কেন পেলাম না’ - এই ভেবে মানুষ দুঃখ পায়। অর্থাৎ মানুষের চাহিদার শেষ নেই। ঠিক যেমন আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করলে আগুন নির্বাপিত হয় না, বরং

[১১] মহাজীবনের অন্তরালে, পৃ - ৩৮ - ৩৯

দহনে আরো বেশী ইন্ধন পায়। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে, 'ন জাতু কামঃ কামানান্ উপভোগেন শাম্যতি'; অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনোই কাম পরিতৃপ্তহয় না।[১২]

এরপর কালের নিয়মে মানুষের জীবনে জরা আসে। তখন সর্বদা পরমুখাপেক্ষিতা মানুষকে দুঃখ দেয়। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যু আসে; কারণ, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'। কবি খুব সহজেই বলে দিতে পেরেছেন যে, 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান ..... মৃত্যু অমৃত করে দান।।' কিন্তু সাধারণ মানুষ কি সত্যিই মৃত্যুকে এত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে? বরং মানুষ বলে 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। অর্থাৎ আমরা কেউই মরতে চাই না। তাই, যা চাই না, তা যদি মেনে নিতে বাধ্য হই, তাহলে সেখানে দুঃখ, চোখের জল তো থাকবেই। বস্তুতঃ 'মৃত্যু' শব্দটিই আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুকে ভয় করে না , জগতে এমন প্রাণী প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকি কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদও বাঁচার জন্যই লড়াই করে; তাই আত্ম-সচেতন মানুষ যে বেঁচে থাকার প্রবল প্রয়াস করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উদ্ভিদ শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই মাটির নীচে জলের সন্ধানে শিকর বিস্তার করে, সূর্যের আলোর দিকে নিজের শাখা-প্রশাখাকে বাড়িয়ে দেয়। মানুষও শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই পেটের চাহিদা পূরণ করতে নানা বৃত্তি অবলম্বন করে। বৃত্তির ভিন্নতার জন্য মানুষের জীবনচর্চার ও জীবনচর্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তবে যে যত খারাপভাবেই তার জীবন অতিবাহিত করুক না কেন কেউই পেটের চাহিদাকে এড়িয়ে হাল ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকে না; কারণ জীবন নির্বাহ করার জন্য পেটের চাহিদাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না। খাদ্যই

[১২] মনুসংহিতা, ২/৯৪

জীবের মৌল চাহিদাগুলির মধ্যে মূল। খাদ্যের অভাবে মানুষের (যেকোন জীবেরই) মৃত্যু হতে বাধ্য। সুতরাং, বেঁচে থাকার জন্যই মানুষের সারাজীবনের কর্মলীলা, কর্মব্যস্ততা।

কিন্তু সারাজীবন যতই কর্মের মধ্যে মানুষ ডুবে থাকুক না কেন, মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য বা ক্ষমতা আমাদের কারোরই নেই; কারণ, জগতে মৃত্যু অত্যন্ত সত্য। মৃত্যুর থেকে বেশী নিশ্চিত আর কিছুই নেই। 'জন্মিলে মরিতে হবে', 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'। কাজেই, মৃত্যু সবার জন্য এক অমোঘ অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যার কোন ব্যতিক্রম নেই। জগতে সবই অনিশ্চিত হলেও এই অনিশ্চয়তার জগতে মৃত্যুই একমাত্র অনিবার্য সত্য, যা সর্বদাই দুঃখদায়ক। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই কারোরই নেই।

বস্তুতঃ যা ছিল, তাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলার নামই মৃত্যু। আর এই হারিয়ে ফেলাটাকেই আমরা ভয় পাই। নিজেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলা, প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলার ভয়ই মৃত্যুর প্রতি ভয়ের মূল কারণ। তবে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে বিরহের সঞ্চার হয়, সেই বিরহানুভূতির আশঙ্কাও মৃত্যুর প্রতি ভয়ের কারণ। যে বস্তু ভীতিপ্রদ তাকে আমরা সর্বদাই এড়িয়ে চলতে চাই। অনুরূপকারণে মৃত্যু-ভয়ও উপেক্ষণীয়। তবে, 'মৃত্যু' শব্দটির সাথে যেমন ভয়ের অনুভূতি জড়িয়ে আছে, তেমনই জড়িয়ে আছে একধরণের উদ্বেগ, ব্যথাবোধ, অসহায়তাবোধ। অর্থাৎ প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে হারানোর আশঙ্কা, আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের বাকি লোকজনদের কী হবে - এইধরণের উদ্বেগ আমাদের মনে চলতে থাকে। তা ছাড়া হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে - এরূপে আমরা মৃত্যুর কাছে অসহায়। এই অসহায়তাবোধ থেকে এক ধরণের ব্যথা আমরা অনুভব করি এবং তা হলো - অনেক কাজ বাকী পড়ে থাকলো, যা কিছু করতে চেয়েছিলাম, সেটি আর সম্পূর্ণ করা গেলো না ইত্যাদি।

এসব ছাড়াও মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা বা মৃত্যুর পর কী হবে - এইসবের এক অজানা ভয় আমাদের মধ্যে দানা বাঁধে।

উপরোক্ত আশঙ্কার কারণেই আমরা বস্তুতঃ মৃত্যুকে ভুলে থাকতে চাই। একদিন যে আমাদের সবাইকে মরতেই হবে - একথা মানুষ মাত্রেরই জানা। পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্র পাঠের প্রারম্ভেই সামান্য সদর্থক বচনের প্রসিদ্ধ উদাহরণ হিসাবে আমরা যে বচনটি প্রায় সব বাংলা গ্রন্থেই পাই তা হল - 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'। কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানী যুক্তিবিদ্যায় তুখর হলেও এই বচনটির নিহিতার্থকে হয়তো কখনই উপলব্ধি করতে পারেন না। হয়তো বা পারেন, কিন্তু তাকে ভুলে থাকার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। হয়তো বা যুক্তিশাস্ত্রের জটিল অঙ্কের সমাধান করতে গিয়েই জগতের এই অনিবার্য সত্যকে তিনি ভুলে থাকতে চান। তা ছাড়া, জন্মের সাথে মৃত্যুর অনিবার্য সম্বন্ধ আছে একথা জেনেও সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে গিয়ে আমরা কখনই বলি না যে, মানুষ মাত্রই মরণশীল। বরং নবজাতকের প্রতি শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আদি জ্ঞাপন করি, শুভাশিষ প্রদান করে থাকি। অর্থাৎ জন্মের সাথে যে কঠিন অনিবার্য সত্য জড়িয়ে আছে, তার কথা আমরা মনেই করতে চাই না। তা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, পীড়া ইত্যাদিকে ভোলার জন্য মানুষ বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে। এইসবই জীবনের নানা দুঃখকে ভুলে থাকার প্রয়াস। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন, রোগ-শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি সংসারের নিত্য ঘটনা। মানুষ সর্বদাই দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে চলেছে, কারণ সকলেই আমরা সুখ চাই। কিন্তু কর্মফলবশতঃ ভিন্ন ভিন্নরূপে নানা দুঃখ আমাদের জীবনে ঘুরে ফিরে আসে। এক দুঃখ দূর হতে না হতেই অন্য এক বা একাধিক দুঃখের কারণ এসে হাজির হয়।

তবে যাই হোক, মৃত্যুকে আমরা ভুলে থাকতে চাইলেও মৃত্যু কিন্তু আমাদের ভোলে না। জগতে এমন কোন পরিবার নেই যেখানে মৃত্যু কখনো প্রবেশ করেনি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এবং

পুত্রশোকাতুরা কিসা গৌতমীর কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেবের চরণতলে বসে মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দেওয়ার কাতর আর্তি করেছিলেন তিনি। মায়ের মন একথা মেনে নিতেই পারছিলো না যে, তাঁর সন্তান আর কখনো ফিরবে না। তাই তিনি অনুরোধে অচলা। এরকম পরিস্থিতিতে বুদ্ধদেব তাঁকে তাঁর সন্তান ফিরিয়ে দেওয়ার কথা দিলেন, তবে তাঁর একটি শর্ত ছিল। বুদ্ধদেব গৌতমীকে বলেছিলেন, যে ঘরে মৃত্যু কোনদিন প্রবেশ করেনি, সেই ঘর থেকে একমুঠো সর্ষে যদি তিনি তাঁকে এনে দিতে পারেন, তাহলেই তিনি তাঁর পুত্রকে বাঁচিয়ে দেবেন। পুত্র-বিয়োগ বিধুরা মা ভাবলেন এ তো খুবই সহজ। তাই ছুটলেন সর্ষের সন্ধানে। দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন তিনি। কিন্তু এমন একটা ঘরও পাওয়া গেল না, যে ঘরে মৃত্যু কখনো প্রবেশ করেনি। সুতরাং, মৃত্যুতে শোক করা আমাদের উচিৎ নয়। জগতের রীতি আমাদের মেনে নিতেই হয়।

ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলিতে দুঃখ ঃ

ভারতীয় দর্শন দুঃখ জয়ের সাধনা করেছে। জীবনে দুঃখ, দুর্দশা, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদিতে ভারতীয় দার্শনিক ব্যথিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের প্রবক্তা বুদ্ধদেবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজপরিবারে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। রাজপরিবারের সুখ-ঐশ্বর্য, যুবতী স্ত্রী, পুত্র - এসব কিছুর আকর্ষণ তাঁকে সংসারে বেশিদিন আবদ্ধ রাখতে পারেনি। সংসারে সুখের তুলনায় দুঃখের পরিমাণ অধিক। জীবের রোগ, জরা, মৃত্যুতে তিনি কাতর হয়ে পরেন এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের জীবনের দুঃখের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।। কেননা, দুঃখের কারণকে দূর করা গেলেই জীবনে দুঃখের সম্পূর্ণভাবে অবসান হবে। দুঃখের নিরোধই বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ নামে পরিচিত, যা মোক্ষ বা

অপবর্গেরই নামান্তর। এই দুঃখের নিরোধের জন্য তিনি দুঃখ নিরোধের উপায় আবিষ্কার করেন। কাজেই, মানুষের জীবনে দুঃখ, দুঃখের কারণ নির্ণয়, দুঃখের কারণের নিবৃত্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় - এই বিষয়গুলিতে তিনি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে এই চারটি একত্রে আর্যসত্য চতুষ্টয় ('চত্বারি আর্য সত্যানি') নামে খ্যাত। এই চারটি আর্য সত্যকে ভিত্তি করেই বুদ্ধদেবের সব শিক্ষাই প্রতিষ্ঠিত ।

প্রথম আর্যসত্যে বুদ্ধদেব বলেছেন, 'সর্বং দুঃখম্' অর্থাৎ সবই দুঃখময়। জগৎ, জীবন, জন্মের মূলেই আছে দুঃখ। জগতে যাকিছু বাসনা থেকে উদ্ভূত সেই সবই দুঃখের। তবে বুদ্ধদেব জীবনে দুঃখকে যেমন স্বীকার করেছেন তেমনই দুঃখের কারণ নির্দেশেরও চেষ্টা করেছেন। দুঃখের কারণকে বৌদ্ধদর্শনে দুঃখ-সমুদায় বলা হয়েছে। এটিই দ্বিতীয় আর্যসত্য। বুদ্ধদেব কার্য-কারণ বিষয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ অনুসারে, এই জগতে কোনকিছুই অকারণে ঘটে না, সব কিছুরই কারণ আছে। সুতরাং, দুঃখও কারণহীন নয়, তা সকারণ। দুঃখের কারণশৃঙ্খলের দ্বাদশপ্রকার অঙ্গের কথা বুদ্ধদেব বলেছেন। বৌদ্ধদর্শনে এটিই দ্বাদশ নিদান বা ভব-চক্র নামে পরিচিত। জরা-মরণ হল জাগতিক দুঃখের কারণ। জীবনে দুঃখ তথা জরা-মরণের কারণ হল জন্ম; কারণ জন্ম হয়েছে বলেই জীবনে দুঃখ ভোগের প্রশ্ন ওঠে। জন্ম না হলে এসব দুঃখভোগের প্রশ্নই উঠত না। আবার জন্মেরও কারণ আছে। ভব হল জন্মের কারণ। জন্মলাভের বাসনাই হল ভব। জন্মলাভের বাসনার জন্যই জীবের জন্ম হয়। কিন্তু জন্মলাভের বাসনার কারণ কী? জাগতিক বস্তুর সাথে সংযোগই এই বাসনার জন্য দায়ী। জাগতিক বস্তুর সাথে সংযোগ হল উপাদান। ভব-এর কারণ হল এই উপাদান। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর সাথে জীবের সংযোগ হওয়ার জন্যই জীব সেগুলির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; ফলতঃ সেগুলি ভোগের জন্য তার জন্মলাভের বাসনা উৎপন্ন হয়। উপাদান বা জাগতিক বস্তুর সাথে সংযোগের কারণ কী? উত্তর হল, তৃষ্ণা বা

ভোগবাসনাই উপাদানের কারণ। জাগতিক বস্তু ভোগ করতে চাই বলেই আমরা জাগতিক বস্তুর সাথে সংযুক্ত হই। তৃষ্ণারও কারণ আছে। আমরা জাগতিক বস্তু ভোগ করতে চাই, কারণ পূর্ব ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বেদনা আমাদের আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমরা জাগতিক বস্তুকে তৃপ্তিদায়ক বলে অনুভব করেছি বলেই আমরা চাই তা পুনরায় তৃপ্তি উৎপন্ন করুক। বেদনা বা পূর্ব ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কারণ হল ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর স্পর্শ। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর স্পর্শ না হলে আমাদের কোন প্রকার অভিজ্ঞতাই সম্ভব হত না। ইন্দ্রিয় আছে বলেই ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর স্পর্শ সম্ভব হচ্ছে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয় প্রকার; যথা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন। এই ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ষড়ায়তন বলা হয়। ষড়ায়তনই হল স্পর্শরে কারণ। ষড়ায়তনের কারণ হল নাম-রূপ। নাম-রূপ হল মানুষের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রকাশ। অর্থাৎ এই নাম-রূপের জন্য আমরা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির থেকে পৃথক করতে পারি। এই নাম-রূপের কারণ হল বিজ্ঞান, তথা চৈতন্য। বিজ্ঞান বা চৈতন্য থাকে বলেই মাতৃগর্ভে এর বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ নাম-রূপ মৃত নয়। আবার, মাতৃগর্ভস্থিত নাম-রূপের বা ভ্রূণের বিজ্ঞানের কারণ হল পূর্বজীবনের সংস্কার। পূর্বজন্মের অতীত কর্মের সংস্কারই আমাদের বর্তমান জীবনের কারণ। আর এই সংসারের কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা হল অজ্ঞান। জগতের ক্ষণস্থায়িত্বের জ্ঞান যদি আমাদের থাকত, আমরা যদি জানতাম যে জগৎ দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত, তাহলে আমরা কোন কর্মে প্রবৃত্ত হতাম না, ফলতঃ জন্মও হত না। সুতরাং, অবিদ্যাই হল সকল দুঃখের মূল। এই হল বৌদ্ধদর্শনে দ্বাদশ নিদান বা ভব-চক্র।

শুধুমাত্র বুদ্ধদেব নয়, চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দার্শনিকই বলেছেন যে, সংসার দুঃখময়। তাই তাঁরা ভেবেছেন যে, আমি কে? আমি কার? কে আমার? মৃত্যু কী? সংসার কী? বন্ধন কী? ভারতীয় মনীষীগণ বিচার করে বলেছেন যে, সংসারই হল বন্ধন। জীব কৃতকর্ম

অনুসারে কর্মফলভোগের জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করে। ভোগ ছাড়া প্রারব্ধের ক্ষয় কোনভাবেই হয় না। এই ভোগের জন্যই জীব বারবার জন্মায় এবং মরে। জীবের এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পরিভ্রমণকেই সংসার বলে। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসারের মোহে আচ্ছন্ন থাকে। মোহের আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত প্রবল। চাকচিক্যপূর্ণ বহির্বিশ্বের বৈচিত্রই আমাদের সম্মোহিত করে রাখে। এর আকর্ষণ থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না। এই কারণেই কামনা-বাসনার আঘাতে আমরা জর্জরিত হতে থাকি। সাধকের (রামপ্রসাদের) ভাষায়, 'আসার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র হল'। অর্থাৎ আমরা জগতে বারবার ফিরে আসতে চাই বলেই আসি। এটিই হল সংসার নামক মোহের বন্ধন। মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা বুঝতেই পারি না যে, জগতের কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়; সবই ক্ষণিক, অনিত্য। ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দেওয়ার সময় আমরা কোন কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিনা; এমনকি আমাদের অত্যন্ত সাধের দেহটিও এখানেই পড়ে থাকে। সংসারে পিতা-মাতা, স্বামী, সন্তান, আত্মীয় পরিজন যাঁদের আমরা একান্ত আপন বলে মনে করি, তাঁরা আসলে আমাদের কেউ নয়। আমরা সবাই আসলে এই সংসারে দুই দিনের অতিথি। স্বামী, স্ত্রী, পিতা-পুত্র ইত্যাদি মিথ্যা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আমরা জগৎ সংসার নামক নাট্যমঞ্চে অভিনয় করতে আসি মাত্র। আমরা এমনই আহাম্মক যে, সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অন্যায়-অবিচার দেখেও আমাদের চোখ খোলে না। এই সংসারকে আমরা আনন্দনিকেতন বলে মনে করি এবং নিজেদের সুখী ভাবি। কিন্তু কখনো আমরা তলিয়ে দেখি না যে, আমরা আসলে অন্ধকারে নিমজ্জিত।

বস্তুতঃ আমাদের এই বারবার আসা-যাওয়ার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিজেদেরকে পরাধীন বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে আমরা স্বাধীন, কারণ আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে। যার ফলে আমরা আমাদের

নানা বাসনা বা ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে থাকি। বাসনাই পৃথিবীতে বারবার আসার মূল কারণ। মানুষের চিত্ত অত্যন্ত দুর্বল, সদা চঞ্চল এবং বহির্মুখী। মানুষের মনের এই বহির্মুখী স্বভাবের জন্য মানুষ বৈচিত্র্যময় বস্তুজগতের দাস হয়ে থাকে। স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে থাকতে ভালোবাসে। অর্থাৎ জগতে প্রেয়বস্তুর আকর্ষণে তা প্রাপ্তির বাসনায় মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে। রূপ, রসাদিই জীবকে তথা জীবাত্মাকে বারবার ফাঁদে ফেলে। মোহ এবং অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে জীব বারবার একদেহ থেকে অন্য দেহে ভেসে চলে। অর্থাৎ পৃথিবীতে বারবার ফিরে আসার কারণ হল বাসনার নিবৃত্তি না হওয়া। সারাজীবনেও আমাদের চাহিদা মেটে না। একটা চাহিদা পূর্ণ হতে না হতেই অপর এক বা একাধিক চাহিদা মাথা চাড়া দেয়। সুতরাং, ভোগের দ্বারা বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটে না, অবরুদ্ধ হয় মাত্র। তবে ভোগের বাসনার ধ্বংস হয় না; কারণ, মৃত্যুতে জীবদেহের বিনাশ হলেও ভোগ-বাসনা থেকে যায় জীবাত্মায়।

আবার ভারতীয় মনীষীগণ এও বিচার করে দেখেছেন যে, আমাদের যাবতীয় ভোগের জন্য দায়ী আমাদের কর্ম। সাংখ্য দর্শন আমাদের বলেছেন যে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক - এই ত্রিবিধ দুঃখ মানুষকে ভোগ করতে হয়। আমাদের নিজেদের বা চেনা-জানা কাছের মানুষের জীবনে কোন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা সেই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার কোন সদুত্তর পাই না। তখনই আমরা সেইসব ঘটনা ঘটার কারণ উন্মোচনের চেষ্টা করি। সেইসব দুর্ঘটনার পিছনে কেউ ঈশ্বর, কেউ বা শয়তান, আবার কেউ পিতৃপুরুষকে দোষারোপ করে থাকেন। কিন্তু আসলে আমরা নিজেরাই আমাদের দুঃখের জন্য দায়ী। বস্তুতঃ কর্মই আমাদের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম, যা কর্মবাদ নামে পরিচিত, সেটি অমোঘ এবং অলঙ্ঘনীয়। কর্মনিয়ম অনুসারে, আমার কৃতকর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে; সেই

ফল অন্যের ঘাড়ে বর্তাবে না। আবার, আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ না করে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। কৃতকর্মের ফল পেতে খানিক বিলম্ব হলেও ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, দুঃখভোগের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এই কারণে রামায়ণে বলা হয়েছে,

'সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।।'[১৩]

কাজেই, বর্তমানে আমাদের চিন্তা এবং কর্ম যেমন হবে, তার ফল আমরা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পাব। আবার, যখন আমরা কোন দুঃখ-বেদনায় ক্লিষ্ট হই, তখন বুঝতে হবে যে, সেটি আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফল। পূর্বে কখনো কাউকে অনুরূপ দুঃখ দিয়েছিলাম; সেই অতীত দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ আমরা বর্তমানে দুঃখ ভোগ করছি।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দার্শনিকদের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উঠতে পারে। ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবনে দুঃখের আতিশয্যের কথা বলায় পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ভারতীয় দর্শনকে নৈরাশ্যবাদ বলেছেন। নৈরাশ্যবাদী হলেন তাঁরা যাঁরা জীবনে দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, অসফলতা ইত্যাদি দিকগুলিকে বড় করে দেখেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ আদৌ যথাযথ নয়। বরং ভারতীয় দর্শনচর্চার মূলে হল দুঃখ জয়ের সাধনা। নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দর্শনের প্রথম প্রস্তাব হলেও আসলে তা আমাদের দুঃখ জয়ের আশাবাদ। চতুর্বিধ পুরুষার্থের আলোচনার মধ্যেই আমরা দেখি যে, পরমপুরুষার্থ হল মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থা। এই অবস্থায় কীভাবে পৌঁছানো যায়, অর্থাৎ কীভাবে মোক্ষ লাভ করা হয় - এই পথ নির্দেশ করাই ভারতীয় দার্শনিকদের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় (চার্বাক ব্যতীত) নিজ নিজভাবে দেখিয়েছেন যে, দুঃখময় ভবসাগরকে

---

[১৩] রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬/৬

কীভাবে অতিক্রম করা যায়। গৌতমবুদ্ধের আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রথম দু'টি আর্যসত্য দুঃখ আছে এবং দুঃখের কারণ আছে - যথাক্রমে একথা বললেও তৃতীয় ও চতুর্থ আর্যসত্য কিন্তু আমাদের মনে আশার আলো জাগিয়ে যথাক্রমে বলেছে যে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে। দ্বিতীয় আর্যসত্য দুঃখ সমুদায় বা দুঃখের কারণ আছে - এটি থেকেই তৃতীয় আর্যসত্য - দুঃখ-নিরোধ অনুসৃত হয়; কারণ, যদি দুঃখের কারণ থাকে, তাহলে দুঃখের কারণের বিনাশে দুঃখ দূর হবে। দুঃখ নিরোধেরই আর এক নাম নির্বাণ, যা মোক্ষেরই নামান্তর। বুদ্ধদেবের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব। অর্থাৎ এই জীবনেই নির্বাণ লাভ আমরা করতে পারি। যেহেতু কামনা-বাসনাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ, সেহেতু দুঃখ দূর করতে হলে প্রথমেই কামনা-বাসনার উচ্ছেদ বা নিয়ন্ত্রণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বহির্জগতের বৈচিত্র্যই আমাদের কামনা-বাসনার উৎস। এই কারণে বহির্জগৎ থেকে সরে মনকে অন্তর্মুখী হতে হবে। আর্যসত্য চতুষ্টয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার জন্য বহির্জগত এবং অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা থেকে মনকে প্রত্যাহার করে সত্য চিন্তা ও অনুধ্যানে মনকে নিবিষ্ট রাখতে হবে। তবে, কীভাবে দুঃখ-নিরোধ সম্ভব - সেই উপায়ের কথাই বুদ্ধদেব চতুর্থ আর্যসত্যে বলেছেন। তিনি স্বয়ং যে পথ বা মার্গ অনুসরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন অন্যরাও সেই পথ অনুসরণ করেই দুঃখ-নিরোধ করতে পারবে। দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধদেবের এই মার্গ বা পথ আটটি ধাপবিশিষ্ট। এই কারণেই এই মার্গের নাম অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এগুলি হল - সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি।

বস্তুতঃ বৌদ্ধদর্শন হল অন্যতম নাস্তিক দর্শন। এটি একাধারে দর্শন ও ধর্ম দুই-ই। এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব বাদ দিলে বাকী পুরোটাই দুঃখ বিষয়ক আলোচনা। বলা যায় যে, এই দর্শনের ও ধর্মের প্রবর্তক ও প্রদর্শক বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভের পথের সূচনাই হয়েছিল

দুঃখ দিয়ে। সংসার আসলে জন্ম-জরা-ব্যধি-মৃত্যুর অধীন। দুঃখ-যন্ত্রণাভোগই সংসারের চরম ফল। সংসারের এই ভাবই বুদ্ধদেবকে ব্যাকুল করেছিল। কী উপায়ে সংসারের দুঃখ দূর হতে পারে, তা সন্ধানের জন্য তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, যার উদ্দেশ্য হল দুঃখের কারণ নির্ণয় ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় অন্বেষণ করা। বুদ্ধকৃত চতুরার্যসত্যের প্রথম এবং প্রধান আর্যসত্য হল দুঃখ। মানুষের জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, দুর্গতি, রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, হতাশা, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ - এই সবকিছুকে অস্বীকার করা যায় না। এই সবই বৌদ্ধ মতে দুঃখ। বুদ্ধদেব বলেছেন, 'সর্বম্ দুঃখম্'। অর্থাৎ জীবনের সব স্তরেই দুঃখ সম্পৃক্ত। তিনি বলেছেন,

' দুক্‌খ হি সম্ভোতি, দুক্‌খং বেতি তিট্‌ঠতি।
নাঞ্‌ঞত্র দুক্‌খা সম্ভোতি, নাঞ্‌ঞত্র দুক্‌খা নিরুজ্ঝতি।'[১৪]

অর্থাৎ জগতে কেবলমাত্র দুঃখের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে, দুঃখ ব্যতীত আর কিছু উৎপন্ন হচ্ছে না বা নিরুদ্ধ হচ্ছে না ও হয় না। এটিকে বুদ্ধদেব এক বাস্তব ভিত্তি বলে মনে করেছেন। তিনি বোঝেন যে, মানুষের জীবনে দুঃখ থাকলেও তা নিবারণের উপায়ও আছে। দুঃখকে স্বীকার করার অর্থ হল জীবনের কঠিন সত্যকে স্বীকার করা। আর সত্য অপ্রিয় হলেও সত্যের প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না। চার্বাকগণ যেখানে বলেছেন যে, মাছে কাঁটা আছে বলে মূর্খরাই সেই কাঁটার ভয়ে মাছ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হবেন না। অর্থাৎ জীবনে দুঃখ থাকলেও দুঃখের ভয়ে সুখভোগে অবহেলা করা মূর্খতা। কিন্তু বৌদ্ধগণ মনে করেছেন যে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কাছে সুখ কখনই কাম্য হতে পারে না; কারণ, সুখ মাত্রই প্রদাহী। অর্থাৎ সুখমাত্রই ক্ষণস্থায়ী। সুখের অবসানে দুঃখ থাকবেই।

[১৪] সুকোমল চৌধুরী, গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ এর পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৪১।

তবে, জগতের কোনকিছুই যেহেতু অকারণে ঘটে না, সেহেতু দুঃখও অকারণ নয়। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণকে দুঃখ সমুদায় বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব মনে করেছেন, জন্মই আমাদের সকল দুঃখের হেতু; কারণ, জন্ম না হলে জরা, মরণ, ব্যাধি, শোক, নৈরাশ্য ইত্যাদি কোনকিছুর সম্ভাবনা থাকে না। এইকারণে দুঃখ নাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন জন্মের রোধ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৌদ্ধগণ জগতের তাবৎ দুঃখকে আট ভাগে শ্রেণীকরণ করেছেন; যথা - ১) জন্ম দুঃখ, ২) জরা দুঃখ, ৩) ব্যাধি দুঃখ, ৪) মৃত্যু দুঃখ, ৫) অপ্রিয় সংযোগ(জনিত) দুঃখ, ৬) প্রিয়বিচ্ছেদ(জনিত) দুঃখ, ৭) ইপ্সিতের অপ্রাপ্ত(জনিত) দুঃখ, ৮) পঞ্চোপাদান স্কন্ধময় এই দেহ ও মন দুঃখ। এদের মধ্যে প্রথম চারটি আর্থাৎ জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখ হল শারীরিক দুঃখের পর্যায়ভুক্ত। অপরদিকে, প্রিয়বিচ্ছেদ আদি শেষের চারপ্রকার দুঃখ মানসিক দুঃখের পর্যায়ভুক্ত। তবে, উল্লেখ্য যে, পঞ্চোপাদান স্কন্ধের মধ্যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান - মানসিক হওয়ায় এগুলি মানসিক দুঃখের পরিধিভুক্ত; আর, রূপস্কন্ধ বাহ্যিক হওয়ায় তজ্জনিত দুঃখ বাহ্যিক বা শারীরিক।

পরবর্তিকালে এই অষ্টবিধ দুঃখকে সংক্ষেপিত করার জন্য বৌদ্ধগণ দুঃখের ত্রিবিধ প্রকারের কথা বলেছেন। অর্থাৎ দুঃখের এই ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যেই অষ্টবিধ দুঃখের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় লাঘব হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল - ক) দুঃখ-দুঃখ, খ) বিপরিণাম দুঃখ, গ) সংস্কার দুঃখ। যা স্বতঃই দুঃখ, তা হল দুঃখ-দুঃখ; যেমন - রোগ, ব্যাধি, শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি যে স্বতঃই দুঃখ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এমন অনেক দুঃখ আছে যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে সুখ বলে মনে হলেও পরিণামে তা দুঃখ বহন করে আনে, সেগুলিই হল বিপরিণাম দুঃখ। যেমন, জাগতিক অনিত্য বস্তুসমূহকে নিত্য বলে মনে করার ফলে পরিণামে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা এই বিপরিণাম দুঃখের অন্তর্ভুক্ত। আবার, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়,

পুনর্জন্মের ফলে সেই সংস্কার থেকে উৎপন্ন যে দুঃখ ব্যক্তি ভোগ করে, তা হল সংস্কার দুঃখ। বৌদ্ধদর্শনানুসারে, আত্মা হল পঞ্চস্কন্ধের সমাহার। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ - এই পাঁচটিকে একত্রে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়েছে। সংস্কারস্কন্ধ এই পঞ্চস্কন্ধের অন্যতম। লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি অকুশল মনোবৃত্তি এবং শ্রদ্ধা, স্মৃতি, অলোভ, অদ্বেষ প্রভৃতি কুশল মনোবৃত্তি সহযোগে মোট বাহন্নটি মনোবৃত্তিকে সংস্কারস্কন্ধ বলা হয়েছে। এই সকল মনোবৃত্তির সংস্কার আমাদের ভবিষ্যৎ জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সংস্কারস্কন্ধজনিত অর্থাৎ উক্ত সব মনোবৃত্তিজনিত দুঃখই হল সংস্কারদুঃখ।

চার্বাক দর্শন ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেছেন। চার্বাক দার্শনিকগণ অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণের মতো অধ্যাত্মবাদী নন; তাঁরা জড়বাদী। চার্বাকজ্ঞানতত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এই জ্ঞানতত্ত্বের উপর নির্ভর করে তাঁদের যে অধিবিদ্যা গঠিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব চার্বাকগণ অস্বীকার না করলেও অধ্যাত্মবাদীগণের মতো দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। এই কারণে তাঁরা ইহজীবন অতিরিক্ত পরলোক বা জন্মান্তরও স্বীকার করেন না। এঁদের কাছে দৈহিক সুখসম্ভোগের মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং, দৈহিক বা ইন্দ্রিয়সুখই জীবের পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ কামই, চার্বাক মতে, পরম পুরুষার্থ এবং কামের সাধনরূপে অর্থ হল গৌণ পুরুষার্থ। জীবের স্বভাবই হল সুখের সন্ধান এবং দুঃখ পরিহার করা। চার্বাকগণ মনে করেন, জীবের সুখ ও দুঃখ উভয়ই আছে। সংসারে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বিরহ, দুঃখ ইত্যাদি সবই আছে; কিন্তু তার সাথে সুখও আছে। সুখ যদি জীবনে না থাকত, তাহলে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকত না।

মানুষের স্বভাবই হল যে, সে বাঁচতে চায়। অর্থাৎ সুখ দুঃখের তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। সুখই স্বর্গ। সুখ-দুঃখ অতিরিক্ত স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই। আর, জগতে যত ধরনের সুখ আছে, তাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখই সর্বাপেক্ষা বেশী স্পষ্ট ও তীব্র। এই কারণে চার্বাকগণ ঋণ করেও ঘি খাওয়ার কথা বলেছেন ('যাৰজ্জীবেৎ সুখং জীৰেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিৰেৎ।') পাশ্চাত্যদর্শনের সুখবাদের সঙ্গে চার্বাকদের এই বক্তব্যের মিল লক্ষণীয়। সুতরাং, চার্বাক মতে, ঈশ্বর নেই, পরলোক নেই, যেহেতু এগুলি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। অতীত বিগত হয়েছে, যাকে আমরা কোনদিন ফিরে পাব না; ভবিষ্যত অনিশ্চিত, যা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমান জীবনে কর্তব্য হল কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ না করে ভোগকে যতটা সম্ভব নিশ্চিত করা। জীবন সুখ-দুঃখের মিশ্রণ হলেও দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। গোলাপ ফুলে কাঁটা থাকলেও গোলাপ ফুল ত্যাগ করা অথবা মাছে কাঁটা থাকলেও কাঁটার ভয়ে মাছ ভক্ষণ না করা, ধানে তুষ থাকায় অন্নাহার পরিত্যাগ করা আসলে মূর্খতা। সুতরাং, আমাদের উচিৎ দুঃখকে যতটা সম্ভব পরিহার করে সুখকে অকুণ্ঠচিত্তে ভোগ করা।

এরপর অন্যতম নাস্তিক দর্শন হিসেবে জৈন দর্শনের কথা বলতে হয়। জৈন শুধুমাত্র একটি দর্শন নয়, তা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। এই দর্শনানুসারে যা গুণ ও পর্যায়ের অধিকারী, তাই দ্রব্য। দ্রব্য মাত্রই সৎ। দার্শনিক উমাস্বামী বলেছেন, উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্ব-ই সৎ-এর লক্ষণ। জৈনগণ নিত্যধর্মকে গুণ এবং অনিত্যধর্মকে পর্যায় বা অবস্থা বলেছেন। গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থায়ী বা ধ্রুব হলেও পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য উৎপত্তি-বিনাশশীল। জীব বা আত্মা জৈন মতে অন্যতম অস্তিকায় অর্থাৎ বিস্তৃত দ্রব্য। জৈনরা প্রত্যেক দ্রব্যেই দুই জাতীয় ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন - নিত্যধর্ম ও অনিত্যধর্ম। নিত্যধর্ম নিয়তই দ্রব্যে বর্তমান থাকে, যাকে ছাড়া দ্রব্যকে কল্পনাও করা যায় না। তবে দ্রব্যের অনিত্যধর্ম পরিবর্তিত হয়। আত্মার

ক্ষেত্রে নিত্যধর্ম হল চৈতন্য; আর, কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ আত্মার অনিত্যধর্ম, যা পরিবর্তনসাপেক্ষ। এই দর্শন মতে, জীব স্বরূপতঃ পূর্ণ হলেও জন্মজনিত নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগকেই জীবের বন্ধন বলা হয়। বস্তুতঃ দুঃখ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট সংসারী আত্মাকেই এই দর্শনে জীব বলা হয়েছে। জীবের এই সংসারদশাই হল বদ্ধাবস্থা। জীবের সম্ভাবনা অনন্ত; সে স্বরূপতঃ পূর্ণ, অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অসীম আনন্দের অধিকারী। কিন্তু জীবের এইসব সম্ভাবনাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে পুদ্গল নামক প্রতিবন্ধক বা বাধা। দেহ হল এই পুদ্গলের দ্বারা সৃষ্ট। দেহের জন্যই জীবের পূর্ণ সত্তার প্রকার হয় না; কারণ, জীব দেহকে নিজের সাথে অভিন্ন বলে মনে করে। এখন পুদ্গল হল জড়, পরমাণুবৎ। এই কারণে পুদ্গল দেহের উপাদান কারণ হলেও নিমিত্তকারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে, জীবের কামনা-বাসনাই দেহ-গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে। জীবের কর্ম অর্থাৎ অতীত-চিন্তা, কার্য ও বাক্যই কামনা-বাসনার সৃষ্টি করে। জীব মাত্রই কামনা-বাসনার চরিতার্থ করতে চায় এবং এই কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের পুদ্গল জীবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেহের কারণ হয়। কাজেই, পুদ্গল দেহের উপাদান কারণ হলেও কামনা-বাসনা হল দেহের নিমিত্তকারণ। সুতরাং, জীবের দেহ-প্রাপ্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। জীবের পূর্ব-কর্মই জন্মের সময় জীবের দেহ, বংশ, বর্ণ, আকার, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা, আয়ুষ্কাল প্রভৃতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

ন্যায়দর্শনে যে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি হল - আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, ফল, প্রেত্যভাব, দুঃখ ও অপবর্গ। প্রমেয়ের এই প্রকার উদ্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দুঃখ ন্যায়দর্শনে একাদশ প্রমেয় পদার্থ। এই প্রমেয় পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। সুতরাং, দুঃখের তত্ত্বজ্ঞানও যে তার ব্যতিক্রম নয়, একথা বোঝাই যায়। এখন, দুঃখ বিষয়ে আমাদের মিথ্যাজ্ঞান আছে বলেই

দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। দুঃখ সম্পর্কে কী ধরনের মিথ্যাজ্ঞানের আমরা অধিকারী তা আলোচনা করার আগে প্রথমেই বলতে হয় যে, আমরা জগতে যাবৎ বিষয়ে সংশয় করতে পারলেও দুঃখের অস্তিত্বে সংশয় করতে পারি না। দুঃখকে প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় বলা হয়েছে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, দুঃখের মতো সুখও সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুখের অস্তিত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে ন্যায়সূত্রকার গৌতম সুখের উল্লেখ না করে দুঃখের উল্লেখ করেছেন। তা হলে আমাদের মনে হতে পারে যে, মহর্ষি সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। কিন্তু তা নয়। মহর্ষি সুখকে প্রমেয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হল, তিনি সুখকেও একপ্রকার দুঃখ বলে মনে করেছেন। সুখ নামক কোন মুখ্য পদার্থ নেই। রাতের আকাশে বিদ্যুতের চমকের মতো মানুষের জীবনে অনন্ত দুঃখের মাঝে আলোর মতো সুখ যে আসে, তা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। সুখ সর্বদাই আমাদের কাছে কাম্য, যেখানে দুঃখ অকাম্য বা অপ্রিয়। কিন্তু সুখের সাথে দুঃখের একটি অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। সুখ মাত্রই দুঃখানুষক্ত, দুঃখানুবিদ্ধ। এই কারণে জীবের সুখও দুঃখের থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়; তা দুঃখেরই প্রকার। আসলে 'আমি দুঃখী' - এইভাবে সকল জীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রতিকূলবেদনীয় যে দুঃখ, তা হল মুখ্যদুঃখ। বার্তিককার উদ্যোতকর এই মুখ্যদুঃখ সহযোগে মোট একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন। জীবের দুঃখের আয়তন শরীর, সেই দুঃখের সাধন ঘ্রাণাদি ষড়িন্দ্রিয়, ষড়িন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ষড়্‌বিধ বিষয়, সেই ষড়্‌বিষয়ে ষড়্‌বুদ্ধি এবং সুখ - এগুলি দুঃখের প্রকার। এইভাবে দুঃখের প্রকারের মধ্যে সুখের উল্লেখ করায় স্পষ্ট হয় যে, সুখ নামক পদার্থের অপলাপ মহর্ষি বা অন্যান্য পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ করেননি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহর্ষি গৌতম আত্মার লক্ষণে বলেছেন, 'ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।'[১৫]

[১৫] ন্যায়সূত্র ১।১।১০।।

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান - এগুলি আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ এবং লক্ষণ। কাজেই, সুখকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে মহর্ষি স্বীকার না করলেও তাকে অন্যত্র অন্যভাবে মহর্ষি স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বৈশেষিক দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, জগতের তাবৎ বিষয়কে মহর্ষি কণাদ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যথা - ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ। এই ভাবপদার্থ আবার ছয় প্রকার; যথা - দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। সপ্তপদার্থের মধ্যেই জগতের সমস্ত অভিধেয় বস্তুর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। প্রথম পদার্থ দ্রব্য আবার নয় প্রকার; যথা - ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ (এদের পরমাণু ও স্থূল পদার্থ), ব্যোম, দিক, কাল, আত্মা ও মন। দ্রব্যই হল গুণ ও কর্মের আধার। মহর্ষি কণাদ গুণের সতেরটি প্রকার উল্লেখ করলেও পরবর্তীকালে প্রশস্তপাদাচার্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণ মোট চব্বিশ প্রকার গুণের কথা বলেছেন। যদিও অতিরিক্ত সাত প্রকার গুণ, যা কণাদ কর্তৃক গুণের প্রকারের মধ্যে উদ্দিষ্ট না হলেও সেগুলির অপলাপ তিনি করেননি। যাই হোক, বৈশেষিকগণের স্বীকৃত চব্বিশ প্রকার গুণ হল - রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন , গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম। গুণের এই প্রকারের মধ্যে দুঃখের উল্লেখ থাকায় এটা স্পষ্ট যে, বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ হল এক প্রকার গুণ। গুণ মাত্রই তার একটা আশ্রয় বা আধার প্রয়োজন। আর, দুঃখ নামক গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্যটি হল আত্মা। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন , ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার - এগুলি জীবাত্মার বিশেষ গুণ।

মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল - দুঃখনিবৃত্তি। বস্তুতঃ দুঃখ আছে বলেই দুঃখনিবৃত্তির প্রসঙ্গ ওঠে। সাংখ্যকারের মতে, সংসার দুঃখময়; জ্ঞানই হল পরমপুরুষার্থ, যার দ্বারা সেই দুঃখকে দূর করা সম্ভব। এই দর্শনেও দুঃখ সম্পর্কে বিস্তৃত

আলোচনা হয়েছে। সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলেছেন, 'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।' ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন, 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।'[১৬] অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতের ফলে তার নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, এই ত্রিবিধ দুঃখ হল, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ হল দৈহিক অসুস্থতা ও মানসিক বিপর্যয়ের ফলে উৎপন্ন দুঃখ। জ্বর, পীড়া ইত্যাদি দৈহিক এবং ক্রোধ, ভয়, লোভ ইত্যাদি মানসিক দুঃখ আধ্যাত্মিক দুঃখের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক কারণজনিত দুঃখই হল আধিভৌতিক দুঃখ। নরহত্যা, সর্পদংশন, কন্টকাঘাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক জীব বা বস্তু থেকে উৎপন্ন দুঃখ এই শ্রেণীভুক্ত। অপরদিকে, ভূত, প্রেত, ঈশ্বর আদি অতিপ্রাকৃত কারণজাত দুঃখ হল আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্য মতে, মানুষ মাত্রই এই ত্রিবিধ দুঃখের শিকার হবেই।

সাংখ্যদর্শনে জগতের মূল উপাদান কারণকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা। এখানে উল্লেখ্য যে, সাংখ্যদর্শনে গুণ বলতে ধর্মকে বোঝানো হয়নি, বরং এখানে উপাদান বোদ্ধব্য। অর্থাৎ সত্ত্বাদি হল প্রকৃতির উপাদান। সত্ত্বগুণ সুখের কারণ। তৃপ্তি, উল্লাস, আনন্দ, সন্তোষ ইত্যাদি সুখেরই বিভিন্ন অবস্থা। সত্ত্বগুণের অবস্থিতির জন্যই বিভিন্ন বস্তু আমাদের মনে সুখের সঞ্চার করতে পারে। রজঃ নিজে দুঃখস্বরূপ এবং আমাদের জীবনের সকল দুঃখের কারণ। রজঃ গুণ চঞ্চল। এই গুণের প্রাধান্যের জন্যই মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখী এবং জগতের বিভিন্ন বস্তু গতিশীল। আর, তমঃ গুণ আবরক; ফলে তা অজ্ঞান, অন্ধকার ও মোহের সৃষ্টি করে। এটি রজঃ-এর চঞ্চলতায় বাধা দেয়; ফলতঃ

---

[১৬] সাংখ্যকারিকা - ১

তমঃ নিদ্রা, আলস্য, উৎসাহহীনতা, বিষাদ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এই গুণগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বর্তমান এবং প্রত্যেক গুণই অপর গুণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।

জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই এই তিনটি গুণ বর্তমান থাকে। এই কারণেই জগতের সকল বস্তুই সুখ, দুঃখ বা মোহাত্মক। আবার, একই বস্তু করোর কাছে সুখাত্মক, কারোর কাছে দুঃখজনক, আবার কারোর কাছে বিষাদের কারণ হয়ে থাকে এই গুণত্রয়ের প্রাধান্যের তারতম্যের জন্যই। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ধরা যাক, মৈত্র নামক এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী আছে এবং সত্যবতী তাঁদের মধ্যে একজন। সত্যবতীকে দেখলে মৈত্র-র মনে সুখানুভব হয়; অর্থাৎ সত্যবতীকে দেখা মাত্র মৈত্র-র মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মায়। আবার, সত্যবতী মৈত্রর প্রিয় হওয়ায় সত্যবতীকে দেখলে মৈত্রর সপত্নীগণের মধ্যে রজঃ গুণের আধিক্য জন্মায় এবং ফলতঃ তাদের দুঃখানুভব হয়। আবার, চৈত্র নামক অপর এক পুরুষ সত্যবতীকে লাভ করতে না পারায়, সত্যবতীর প্রতি তার মনে মোহ বা ঔদাসীন্য জন্মায়; তমঃ গুণের আধিক্যবশতঃ এটি ঘটে। সুতরাং, অস্তিত্বশীল বস্তু মাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির হওয়ায় সেগুলি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক।

সাংখ্যদর্শনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ঘটেছে পাতঞ্জল বা যোগ দর্শনে। সাংখ্য ও যোগ দর্শনকে ভগবদ্গীতাও এক ও অভিন্ন বলেছেন। যদিও সাংখ্য স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ছাড়াও ঈশ্বরকে অতিরিক্ত তত্ত্ব হিসেবে যোগদর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। যাই হোক, যোগদর্শনের মূলগ্রন্থ পাতঞ্জলসূত্র বা যোগসূত্র চারটি পাদে বিভক্ত - সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ। এই চারটি পাদের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ সাধনপাদে দুঃখ তথা ক্লেশ, কর্মফল, দুঃখনিবৃত্তির উপায় বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। যোগদর্শনে আত্মাকে পঞ্চক্লিষ্ট বলা হয়েছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ - এই হল পঞ্চক্লেশ। অনাত্মাকে আত্মা,

অনিত্যকে নিত্য, দুঃখকে সুখ, অশুদ্ধকে শুদ্ধ বলে মনে করাই হল অবিদ্যা। সুতরাং, এই দর্শনেও সুখকে দুঃখ বলা হয়েছে। আত্মাকে বুদ্ধি বা মনের সাথে অভিন্ন মনে করা হল অস্মিতা। রাগ হল সুখভোগেচ্ছা। দ্বেষ হল দুঃখের প্রতি বিরাগ। অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়, যা সর্বজীবের সহজাত। এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই মূল; অবিদ্যার কারণেই বাকী চারটি ক্লেশ জন্মায়। এখানে প্রসঙ্গতঃ যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হল, দ্বেষ অর্থাৎ দুঃখের প্রতি বিরাগকেও ক্লেশ বলা হয়েছে। দুঃখ আমরা কেউই কামনা করি না। ন্যায়ের ভাষায় দুঃখ হল প্রতিকূলবেদনীয়। প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ার জন্যই দুঃখ কাম্য নয়। অর্থাৎ দুঃখের প্রতি বিরাগ জন্মায়। দুঃখের প্রতি এই বিরাগ আসলে একপ্রকার ক্লেশের জনক। এর থেকে বোঝা যায় যে, দুঃখকে আমরা যত আপন বলে গ্রহণ করতে পারব, ততই তা আমাদের মোক্ষের পথকে প্রশস্ত করবে। দুঃখকে গ্রহণ করতে না পারার জন্যই অর্থাৎ তার প্রতি বিরাগের জন্যই তা আমাদের ক্লেশের কারণ হয়; বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তবে, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ সাধারণ মানুষ ভোগ করলেও ঈশ্বর হলেও বিশেষ পুরুষ যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাকের উর্ধ্বে।[১৭]

সুখ মাত্রই যে পরিণামে দুঃখের আহ্বাহক, তা বোঝানো জন্য যোগদর্শনে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখের কথা বলা হয়েছে। সুখভোগের পর যে অবসাদ, তা হল পরিণামদুঃখ; সুখভোগকালে ব্যক্তির নিজের অপেক্ষা অপরের সুখ বেশী - এই প্রকার উপলব্ধিজনিত দুঃখ হল তাপদুঃখ; আর, সুখভোগের পর সুখ-সংস্কারজন্য পুনরায় সুখলাভ করার ইচ্ছা থেকে যে দুঃখ প্রাপ্তি হয়, তা হল সংস্কার দুঃখ। সুতরাং, সুখ মাত্রই দুঃখকে ডেকে আনে। বস্তুতঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, জগতের সকল বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই ত্রিগুণবৃত্তিত্ব আছে। ফলে জাগতিক সকল বস্তুতেই সত্ত্বরূপ সুখের সাথে রজঃরূপী দুঃখ এবং

[১৭] 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।' - যোগসূত্র, সমাধিপাদ, সূত্র - ২৪।

তমঃরূপী মোহ মিশ্রিত থাকায়, জাগতিক বস্তুমাত্রই দুঃখময়। দুঃখের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে; তবে দুঃখ যে ঘটবেই তা নিশ্চিত। এই কারণে, বিবেকী ব্যক্তিগণ বস্তু মাত্রকে দুঃখময় বলে মনে করেছেন।

মহর্ষি জৈমিনী প্রবর্তিত পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই কারণে এই দর্শন কর্ম-মীমাংসা নামেও পরিচিত। চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম প্রাপ্তিই এই দর্শনের মূল প্রয়োজন। অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব নিরূপণই মীমাংসাদর্শনের লক্ষ্য। জৈমিনীকৃত মীমাংসাসূত্র গ্রন্থের প্রথম সূত্রই হল - 'অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।' অর্থাৎ ধর্ম-মীমাংসার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে। বেদ-বিধি অনুসরণ করাই হল ধর্ম।[১৮] বেদ-বিধি নানা ধরনের যাগযজ্ঞ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে। ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য নিরূপণের উপায় নির্দেশ করে বেদ।

তবে, বেদ-বিধি অনুসরণ করাই ধর্ম - এই বিষয়ে সকল মীমাংসকগণ একমত হলেও কী উদ্দেশ্যে বেদ-বিধি অনুসৃত হবে, তা নিয়ে মীমাংসকগণের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। প্রাভাকর মীমাংসকগণের মতে, বেদে বিহিত আছে বলেই বেদ-বিধি অনুসরণযোগ্য। কোনোকিছু লাভের উদ্দেশ্যে যদি বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠানের আনুসরণের কথা বলা হয়, তাহলে বেদকে হেয় করা হয়। কিন্তু ভাট্ট-মীমাংসকগণ বলেছেন, আমাদের ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াই বেদের কাজ নয়; বরং ধর্ম ও অধর্মের অনুষ্ঠান করলে কী হবে, বেদ সেই নির্দেশও দিয়ে থাকেন। যেমন, বেদ-বিহিত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয়, অর্থাৎ ধর্মের পালন করলে সুখপ্রাপ্তি ঘটে। আবার, প্রাণীবধ করলে নরকবাসের কথাও বেদে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অধর্মের সম্পাদনে দুঃখভোগ হয়ে থাকে। সুতরাং, ভাট্ট মতে, ধর্মের সঙ্গে সুখের এবং অধর্মের সঙ্গে দুঃখের সম্বন্ধ বর্তমান। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, মীমাংসা দর্শন অনুসারে, বেদ-বিহিত অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্মের

[১৮] 'চোদনালক্ষণোর্থ ধর্মঃ' - মীমাংসাসূত্র ১।১।২।

পালনের মাধ্যমেই আমরা দুঃখকে পরিহার করতে সমর্থ হয়ে থাকি। ধর্মই মীমাংসার মুখ্য আলোচ্য বিষয় হওয়ায় দুঃখ বা মোক্ষ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই দর্শনে পাওয়া যায় না।

পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে বেদের কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য থাকলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রাধান্য পেয়েছে বেদান্ত দর্শনে। বেদান্ত হল বেদের অন্তভাগ। অর্থাৎ উপনিষদ্ অবলম্বনে এই দর্শন গঠিত। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বেদান্তসূত্র, শারীরকসূত্র, শারীরকমীমাংসা , উত্তরমীমাংসা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে খ্যাত। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' - এই সূত্রের দ্বারা গ্রন্থটির সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রতিপাদনই বেদান্তদর্শনের মূল প্রয়োজন। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কী - এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয়েছে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই দর্শন অনুসারে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া। তবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে একথা সত্য হলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে শঙ্করাচার্য জগতকে অস্বীকার করেননি। এই কারণে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সংসারবন্ধন, জাগতিক দুঃখ, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি সবই আছে এবং একেই বন্ধন বলা হয়েছে। জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপ হলেও এই আত্মোপলব্ধি জীবের হয় না বলেই সে জন্মাদি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ মনে করেছেন, জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ গুণ ও গুণীর সম্বন্ধের অনুরূপ। বদ্ধজীবই সংসারদশায় আবদ্ধ হয়ে দুঃখাদি ভোগ করে।

নাট্যশাস্ত্রে দুঃখ ঃ

নাট্যশাস্ত্রেও দুঃখের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষায় 'নাটক' শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী ভাষার 'drama' শব্দটি সমার্থক। এই উভয় শব্দই আবার যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সেই অর্থে সংস্কৃত সাহিত্যে 'দৃশ্যকাব্য' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তুতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র

মতে, দৃশ্যকাব্যের দশ রকমের রূপকের মধ্যে প্রথম ও প্রধান রূপক হল নাটক। নাট্যতত্ত্বের সম্বন্ধে উপলভ্যমান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রমাণ্য গ্রন্থ হল ভরতমুণির ''নাট্যশাস্ত্র''।

চিত্তবিনোদন ও উপদেশ প্রদানই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। নাটক সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রিয়; কারণ, নাটকের দৃশ্যময়তা মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং নাটকে ভাবের অনুকরণ হয়। নাটকের মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্র, সংস্কৃতি, মানুষের জীবনচর্চা ও জীবনচর্যা, জাতি-উপজাতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি, তেমনি অন্যদিকে নাটকে মনোবিদ্যার তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বস্তুতঃ নাটকের শৃঙ্গারাদি রসের মাধ্যমে ভাবাদির মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধারণা আমরা পেয়ে থাকি, যা দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুণি নাট্যরস প্রসঙ্গে বলেছেন, রস ভিন্ন কোন বক্তব্যই অর্থবহ হয় না। নাট্যবিষয়ে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগের ফলেই রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বস্তুতঃ যা আস্বাদন করা যায়, তাই রস। একজন খাদ্যরসিক ব্যক্তি যেভাবে পঞ্চব্যঞ্জনে তৈরী খাদ্যগ্রহণ করে খাদ্যের রস আস্বাদন করেন, তেমনি সংস্কৃতিবান ব্যক্তিও মনের ভাবপ্রকাশক বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে যে স্থায়ীভাবের আস্বাদন করে সুখ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হন, তাই হল নাট্যরস। কাজেই, মনের ভাব প্রকাশক বাক্য ও অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে রত্যাদি যে স্থায়ীভাবের আস্বাদন করা যায়, নাটকর সেই স্থায়ীভাবকেই রস বলা হয়েছে। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি রসের থেকে ভাব জাত হয় ও ভাব রসের উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে।

যাই হোক, ভরতমুণি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আটপ্রকার রসের উল্লেখ করেছেন; সেগুলি হল - ১) শৃঙ্গার, ২) হাস্য, ৩) করুণ, ৪) রৌদ্র, ৫) বীর, ৬) ভয়ানক, ৭) বিভৎস এবং ৮) অদ্ভুত।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয় অপর এক রসের উল্লেখ করেছেন, যা হল শান্তরস। এই প্রত্যেকটি রসের সাথে একটি করে স্থায়ীভাব সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ভাব বলতে বোঝায় আসলে চিত্তবৃত্তি। আর, স্থায়ীভাব হল মানবচিত্তের অসংখ্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রধান চিত্তবৃত্তি, যাকে সংক্ষেপে ভাবও বলা হয়ে থাকে। উক্ত রসগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থায়ীভাবগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

রতিভাব - শৃঙ্গাররস

হাসবাব - হাস্যরস

শোকভাব - করুণরস

ক্রোধভাব - রৌদ্ররস

উৎসাহভাব - বীররস

ভয়ভাব - ভয়ানকরস

জুগুপ্সাভাব - বিভৎসরস

বিস্ময়াভাব - অদ্ভূতরস

শমভাব - শান্তরস

উপযুক্ত কারণের সংস্পর্শে এলেই এই চিত্তবৃত্তিগুলির অভিব্যক্তি ঘটে, অর্থাৎ প্রকাশ ঘটে মানুষের দেহে ও আচরণে। উদাহরণস্বরূপ, 'ভয়' মানুষের একটি স্থায়ীভাব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি। ভয়ের কারণের উদ্বোধন ঘটলেই মানুষ ভয় পায় এবং মানুষের আচরণে তার প্রকাশ পায়। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, ঘন ঘন শ্বাস পড়া, চক্ষু বিস্ফারিত হওয়া ইত্যাদি ভয়ের অভিব্যক্তি। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যখন ভয় পায়, তখন তার সাথে রস আস্বাদনের কোন স্থান নেই। কিন্তু যখনই ভয়ের উদ্বোধনের কারণ কোন কাব্য বা নাটক হয়, তখন পাঠক বা

দর্শকের চিত্তে ভয়রূপ রসের উদ্বোধন ঘটে। অর্থাৎ তখনই ব্যক্তি ভয়ের মধ্যেও আনন্দের সন্ধান পায়। অনুরূপভাবে, 'দুঃখ' বা 'শোক' একটি চিত্তবৃত্তি, যার সঙ্গে আনন্দের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু কাব্য বা নাটকের দ্বারা যখন এই শোক উদ্বোধিত হয়, তখন ব্যক্তি শোকের মধ্যেও আনন্দের আস্বাদ পায়। এই কারণেই খুব দুঃখের নাটক বা সিনেমা হলেও দলে দলে মানুষ তা দেখে উপভোগ করতে, অর্থাৎ শোক-রসের আস্বাদন করতে। সেখানে বাড়ির মহিলারা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের জল মোছে এবং কাহিনীর দ্বারা পরিবেশিত শোককে উপভোগ করে। জীবনে আমরা কেউই দুঃখ-শোক পেতে চাই না। কিন্তু সেই আমাদেরই প্রিয় গ্রন্থ, প্রিয় নাটক বা প্রিয় সিনেমাটি দুঃখেরই হয়ে থাকে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি রস আস্বাদ করেন, (অর্থাৎ প্রমাতাগণ) তিনি নিজের শরীরের মতো অভিন্নরূপে রসের আস্বাদন করেন। সুতরাং, রসাস্বাদনকালে প্রমাতা ও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মধ্যে রসগত ঐক্য ও অভিন্নত্বের উদ্ভব হয়। তৎকালিক এই রসগত অভিন্নতার বোধ উন্মেষ হওয়ার ফলেই রসাস্বাদন ঘটে।[১৯] করুণ, বীভৎস, ভয়ানক ইত্যাদি রসের দ্বারা যে পরমসুখ উৎপন্ন হয়, তার প্রমাণ হল সহৃদয় ব্যক্তির অনুভব।[২০] আসলে করুণাদি রস শুধু দুঃখেরই উদ্রেক করে না, তা সুখেরও কারণ হয়। যদি করুণাদি রস দুঃখের কারণ হত, তা হলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই রসাস্বাদনের জন্য উন্মুখ হতেন না।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানতঃ নিজের দুঃখকে আহ্বান করবেন না। করুণরসপ্রধান রামায়ণের কথাই ধরা যাক। যদি করুণরসে দুঃখের হেতুত্ব থাকে, তাহলে করুণরসপ্রধান রামায়ণও দুঃখের হেতুস্বরূপ হবে। কিন্তু রামের বনবাস, সীতাপহরণ, গর্ভবতী অবস্থায় সীতাকে পরিত্যাগ, সীতার

[১৯] 'লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ স্বাকারৰদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।।'

- বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, শ্লোক - ২।

[২০] 'করুণাদাৰপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভৰঃ প্রমাণং তত্র কেৰলম্।।' - তদেব, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, শ্লোক - ৩।

অগ্নিপরীক্ষা, সর্বোপরি পৃথিবীবক্ষে অর্থাৎ মাতৃক্রোড়ে সীতার গমন ইত্যাদি ঘটনা লৌকিক জগতে দুঃখের হেতু বলে গণ্য হলেও কাব্য বা নাটকের জগতে সুখের হেতু হয়ে থাকে। তবে, রামায়ণাদি করুণরসপ্রধান কাব্য পাঠের শেষে বা দৃশ্য নাটকের শেষে অশ্রুপাত হয়; কারণ, সামাজিক ব্যক্তি যেমন সুখেও অশ্রুপাত করে, তেমনি রসানন্দের ফলে প্রমাতা ও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মধ্যে তৎকালিক একত্বের অনুভূতি হলেও অশ্রুপাত ঘটে। তবে, সব পাঠক বা শ্রোতৃগণের মধ্যে অশ্রুপাতের বিষয়টি একইভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তার কারণ হল বাসনার ভেদ। বাসনা ব্যতীত রসাস্বাদ সম্ভব নয়; অর্থাৎ রসাস্বাদের হেতু হল বাসনা।[২১]

যাই হোক, স্থায়ীভাবের পাশাপাশি নাট্যশাস্ত্রে তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারিভাবের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এগুলি স্থায়ীভাবে আস্বাদব্যঞ্জক।[২২] এগুলি হল - নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ঔগ্র (উগ্রতা), মোহ, বিবোধ, স্বপণ, অপস্মার, গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাণ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুভাব। চিত্তবৃত্তি হল সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার; কিন্তু সেই চিত্তবৃত্তির বহিঃপ্রকাশক কার্যকে নাটকে ও কাব্যে অনুভাব বলা হয়। সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন বিকারসমূহকে বলা হয় সাত্ত্বিকভাব। বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেছেন, সত্ত্ব হল নিজ আত্মার বিশ্রাম প্রকাশকারী কোন আন্তর ধর্ম।[২৩] আটপ্রকারের সাত্ত্বিক অনুভাবের কথা বলা হয়েছে; যথা, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপত্থু, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়।

---

[২১] 'ন জায়তে তদাস্বাদো ৰিনা রত্যাদিৰাসনাম্।।' - তদেব, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, শ্লোক - ৮।

[২২] 'ৰিশেষাদাভিমুখ্যেন চরণাদ্ ৰ্যভিচারিণঃ।।---' - তদেব, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, শ্লোক - ১৪১।

[২৩] সাহিত্যদর্পণঃ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ - ১৯৭।

যাই হোক, নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত রস, স্থায়ীভাব, ব্যভিচারীভাব, সাত্ত্বিক অনুভাব ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পর আমার গবেষণামূলক নিবন্ধটির সঙ্গে এই নাট্যশাস্ত্রের সম্বন্ধ দেখানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আটপ্রকার স্থায়ীভাবের মধ্যে শোক অন্যতম, যা করুণরসের জনক। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন যে, ইষ্টনাশ ও অনিষ্টের প্রাপ্তির হেতু হয় করুণ নামক রস।[২৪] ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখকে প্রতিকূলবেদনীয় বলা হয়েছে। ইষ্টের নাশ এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি যে প্রতিকূলবেদনীয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ যে বিষয়টি কাম্য, তার অপ্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বিষয়টির অকাম্যতা আমাদের দুঃখের উদ্রেক করে। ভরতমুণি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন, যেকোন রকমের দুর্ঘটনা, বা দৈব-দুর্বিপাক, যেমন - অভিশাপ, প্রিয় ব্যক্তি বা বন্ধু-বিচ্ছেদ, ধননাশ, মৃত্যু, বন্ধন বা বন্দিদশা, নিজ বাসস্থান থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি পরিস্থিতি থেকে এই করুণরসের উৎপত্তি। কাব্য বা নাটকের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলি যেমন করুণরসের উদ্রেক করে, লৌকিক জগতেও ঐ ঘটনাগুলি দুঃখ বা শোক নামক চিত্তবৃত্তির উদ্রেক ঘটায়। যদিও নাট্যশাস্ত্রের সাথে ন্যায়াদি দর্শনের সম্বন্ধ স্থাপন করা একেবারেই সম্ভব নয়, কিন্তু শোকের উৎপত্তি কীভাবে হয় - এই দিক থেকে উভয়ের মধ্যে মিল লক্ষণীয়; কারণ আর যাই হোক লৌকিক জগৎ থেকেই নাট্যশাস্ত্র তার উপাদান সংগ্রহ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দর্শনে দুঃখের ব্যাপকতা নাট্যশাস্ত্রের শোক নামক স্থায়ীভাব অপেক্ষা বেশী ব্যাপক; কারণ, দর্শনে যেকোন প্রকার প্রতিকূলবেদনীয় বিষয়কেই দুঃখ বলা হয়েছে; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে প্রেম বা রতি থেকে করুণ পরিস্থিতির উৎপত্তির কথা বলা হয়, যা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের জনক হয়ে থাকে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, নাট্যশাস্ত্র অনুসারে কোন ব্যক্তির ক্রন্দন, বিলাপ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, অবনত দেহ, হাঁপানো, স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া, ভূমিতে পতন ইত্যাদি অভিব্যক্তি

---

[২৪] 'ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ। ...' - সাহিত্যদর্পণঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক - ২০২।

হল করুণ রসের অর্থাৎ শোক নামক স্থায়ীভাবের প্রকাশ। এই অভিব্যক্তিগুলি কেবলমাত্র কাব্য বা নাটকের জগতে শোকের প্রকাশক নয়, বরং আমাদের লৌকিক জগতের ক্ষেত্রেও এগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির মানসিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য এগুলি আমাদের সাহায্য করে থাকে।

বস্তুতঃ জগতে সমস্ত দেহের মধ্যে মনুষ্য দেহধারণ বা মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। শঙ্করাচার্য বলেছেন, মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হলেও পুরুষদেহ লাভ, পুরুষদেহ প্রাপ্ত হলেও ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ, ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেও বৈদিক ধর্মে নিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা থাকলেও শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান হওয়া - এই সবের পরেরটি পূর্বেরটির তুলনায় দুর্লভতর।[২৫] শঙ্করাচার্য আরো বলেছেন যে, মনুষ্যদেহ লাভ, মুক্তিলাভের প্রতি আগ্রহ এবং জ্ঞানী সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ - এই ত্রিবিধ বিষয় জগতে দুর্লভ।[২৬] পূর্বের পুণ্যকর্মের ফলেই জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে। দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করেও যে ব্যক্তি আত্মভাবে ভাবিত হয় না বা মোক্ষের উপায় অনুসন্ধান করে না, তার থেকে নির্বোধ ব্যক্তি আর নেই।

উপনিষদ্-এর বেশকিছু উপাখ্যান আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান কত বড়। কঠোপনিষদ্-এর যম-নচিকেতা উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, মৃত্যু শোক বা দুঃখদায়ক হলেও তাকে জয় করার উপায় কী? শ্রেয় ও প্রেয়-র মধ্যে তফাৎ কী? তাছাড়া সুখ যে ক্ষণভঙ্গুর, তা এই উপাখ্যান স্পষ্ট করে বলে। বৃহদারণ্যাক

---

[২৫] 'জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো ৰিপ্রতা তস্মাদ্ বৈদিকধর্মমার্গতা ৰিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মৰিৰেচনং স্বনুভৰো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতির্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুনৈর্ৰিনা লভ্যতে।।'
- বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ২

[২৬] 'দুর্লভং ত্রয়মেৰৈতদ্ দেৰানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।।' - বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ৩

উপনিষদ্-এর যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ আমাদের ত্যাগের মন্ত্রে উদ্দীপিত করে। ত্যাগ সাময়িকভাবে দুঃখদায়ক হলেও তা আসলে মোক্ষদায়ক। তা ছাড়া, জীবাত্মা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে নানা দুঃখে ক্লিষ্ট হলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে আসলে একই তার নানা উপমা উপনিষদ্-এর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও সূচনা হয়েছে সেই দুঃখের প্রেক্ষাপটেই। মহাভারত ও রামায়ণ - এই দুই মহাকাব্যে দুঃখের আলোচনার শেষ নেই। এই দুই মহাকাব্যের সবিচার পঠনে আমরা জানতে পারি যে, ধনী থেকে কাঙ্গাল - কেউই সাংসারিক অশান্তি দূর করে শান্তিলাভ করতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সখা হলেও তাদের সাংসারিক দুর্গতির নাশ হয়নি। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করলে বোঝা যায় যে, রাজ-সিংহাসন, বিত্ত ইত্যাদি সবকিছুই ক্ষণিকের মধ্যে ধূলিস্যাৎ হয়ে রাজা কাঙ্গালে পরিণত হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার উপাখ্যান চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রারব্ধের ক্ষয় এককথায় অসম্ভব, তা ভোগ করতেই হবে। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র রাজার ছেলে হয়েও সুখ-শান্তি থেকে সারাজীবন বঞ্চিত হয়েছেন। সীতার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

পরমপুরুষার্থরূপে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা পুরুষার্থ ঃ

ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। সকল আস্তিক দর্শনের প্রারম্ভেই এই প্রস্তাব থাকে যে, মোক্ষলাভই তাঁদের দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায়দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র-এর প্রথম সূত্রেই তাঁর রচিত গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন যে নিঃশ্রেয়স, তা উল্লেখ করেন।[২৭] ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। কাজেই, নিঃশ্রেয়স হল প্রয়োজন এবং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হল ঐ প্রয়োজনের সাধন।

মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ ইত্যাদি নিঃশ্রেয়সবোধক পর্যায় শব্দ। 'মোক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মুক্তি। ভারতীয় আধিবিদ্যক তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও মোক্ষের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একটি মৌল সাদৃশ্য আছে। মোক্ষ হল মুক্তি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোক্ষ কোন্ অর্থে মুক্তি? অর্থাৎ মোক্ষ কোন্ বন্ধন থেকে

---

[২৭] 'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তারৰয়ব-তর্ক-নির্ণয়-ৰাদ-জল্প-ৰিতণ্ডা-হেত্বাভাসছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১।।

মুক্তি? উত্তরে বলা যায় যে, মাত্র মৃত্যুই মুক্তি নয়, মোক্ষ হল জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, কর্ম থেকে মুক্তি ইত্যাদি। মোক্ষকে যে দর্শন সম্প্রদায় যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এই প্রাথমিক শর্তগুলি প্রায় সব সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। তবে, এদের মধ্যে মূল ধারণাটি হল - দুঃখ থেকে মুক্তি। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ থেকে নিস্তার চায়। মোক্ষই হল জীবাত্মার এমন অবস্থা যখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। একবার মোক্ষপ্রাপ্তি হলে জীবের আর পুনর্বার সংসার দশা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই, মোক্ষে নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য দুঃখের বিনাশ ঘটায় মোক্ষই জীবের কাছে চরম ও পরম পুরুষার্থরূপে বিবেচিত। সর্বপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হলে কোনভাবেই প্রকৃত মুক্তি হয়না। ন্যায়সূত্রকার গৌতম অপবর্গের লক্ষণসূত্রে এই কারণে বলেন, ‘তদত্যন্তৰিমোক্ষোঽপৰৰ্গঃ।।’[২৮] উক্ত সূত্রের মধ্যে যে ‘তদ্’ শব্দ রয়েছে, তার দ্বারা পূর্বসূত্রের দুঃখকে গ্রহণ করেই মহর্ষি বলেছেন যে, সেই সকল দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ন্যায়শাস্ত্রের কার্যব্যাপার ত্রিবিধ; যথা - উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। প্রথমে নামের দ্বারা পদার্থ মাত্রের উল্লেখ বা নাম কথনই হল উদ্দেশ। উদ্দিষ্ট পদার্থ যে তদ্ভিন্ন পদার্থ থেকে ভিন্ন, সেই ভিন্নতার বোধক ইতরব্যাবর্তক অসাধারণ ধর্মই হল ঐ পদার্থের লক্ষণ। লক্ষিত পদার্থ ঐ লক্ষণ অনুসারে উপপন্ন হয় কিনা, সেই সংশয় নিরাসের জন্য প্রমাণসমূহের দ্বারা বিচারপূর্বক সেই পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ই হল পরীক্ষা।[২৯] প্রমেয়বিভাগসূত্রে[৩০] মহর্ষি অপবর্গরূপ

[২৮] ন্যায়সূত্র ১।১।২২।।

[২৯] ‘ত্রিৰিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রৰৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি। তত্র নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ তত্রোদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যৰচ্ছেদকো ধর্মো লক্ষণং, লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন ৰেতি প্রমাণৈরৰধারণং পরীক্ষা।’ -

চরম প্রমেয়ের উল্লেখের অব্যবহিত পূর্বে দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থের নামোল্লেখ করেছেন। প্রমেয় পদার্থসমূহের লক্ষণ কথনের ক্ষেত্রেও মহর্ষি সেই ক্রমই অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই অপবর্গের লক্ষণসূত্রের অব্যবহিত পূর্বসূত্রটি হল দুঃখের লক্ষণসূত্র (প্রমেয় পদার্থের উদ্দেশের ক্রমানুসারে)।

যাই হোক, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরা নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ বা মুক্তির অন্যতম কারণ হল দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান অর্থাৎ মূলীভূত কারণ এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব দুঃখের মূল। কারণ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃই অনুকূল বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষারূপ রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি দ্বেষ জন্মায়। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ রাগ ও দ্বেষরূপ দোষ উৎপন্ন হয়। সেই সকল দোষবশতঃই মানুষ নানাবিধ পাপকর্ম ও পূণ্যকর্ম সম্পাদন করে ধর্ম ও অধর্ম লাভ করে। তার ফলে নানাবিধ দেহধারণ করে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে। সুতরাং, ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান এবং সকল প্রকার দুঃখের মূল। আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞানই ঐ সকল মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারেনা; মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি না হলে রাগ-দ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হতে পারেনা; দোষের নিবৃত্তি না হলে ধর্মাধর্মাদিরূপ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না, এবং ফলতঃ জন্মেরও নিবৃত্তি হয়না; জন্মের নিবৃত্তি ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অপবর্গও অসম্ভব।[৩১]

বাৎস্যায়ন, গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্য - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলসফিকাল্ রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ৮, পং - ৭-৯।

[৩০] 'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।।' - ন্যায়সূত্র ১।১।৯।।

[৩১] 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ'।। - ন্যায়সূত্র ১।১।২।।

দুঃখের তত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষের সহায়ক ও তৎপ্রসঙ্গে দুঃখের স্বরূপ ঃ

দুঃখ দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত একাদশ পদার্থ। যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ ন্যায়দর্শনের প্রয়োজন, সেই দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান লাভও ঐ প্রয়োজনের সহায়ক। বস্তুতঃ যদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যদ্দুঃখের কারণ, তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তদ্দুঃখ নিবৃত্তির কারণ। দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হবে। দুঃখ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান এই যে, জীব দুঃখকেও সুখরূপে বোধ করে। আর, দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হল এই যে, প্রকৃত সুখ দুঃখানুসক্ত হওয়ায় সুখও দুঃখ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নেই। তাই দুঃখের উক্ত স্বরূপ মুমুক্ষু বুঝলে তবেই তাঁর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। আর দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাথে ন্যায়দর্শনসম্মত অপবর্গ অভিন্ন। মহর্ষি দুঃখের লক্ষণে বলেন, 'ৰাধনালক্ষণং দুঃখম্।।'[৩২] শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সকল প্রকার প্রমেয়ই নবাধনালক্ষণ, অর্থাৎ দুঃখানুসক্ত হওয়ায় দুঃখ। লক্ষণস্থ 'ৰাধনা' শব্দের অর্থ দুঃখ। দুঃখ সকল জীবেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় সুপরিচিত। তা সকল জীবের প্রতিকূলবেদনীয়। বাধনা, পীড়া, তাপ ইত্যাদি হল পর্যায় শব্দ। এই বাধনা বা দুঃখের সঙ্গে যা অনুষঙ্গবিশিষ্ট বা অবিনির্ভাগবিশিষ্ট বা নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই সকলই দুঃখ। দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে শরীরাদি ফল পর্যন্ত অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব ও ফল - এই নয়টি প্রমেয় দুঃখের সাথে নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় সেগুলিও দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে, তাই দুঃখ। দুঃখের লক্ষণসূত্রে 'লক্ষণ' শব্দের দ্বারা এই অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধই বিবক্ষিত। শরীরে দুঃখের নিমিত্তত্বসম্বন্ধ; ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ; সুখে দুঃখের অবিনাভাব সম্বন্ধ। যা মুখ্য দুঃখ, তার সম্বন্ধপ্রযুক্ত সবই দুঃখ এবং সেগুলি হল

[৩২] ন্যায়সূত্র ১।১।২১

গৌণদুঃখ। মহর্ষির দুঃখ লক্ষণের দ্বারা মুখ্যদুঃখের লক্ষণের পাশাপাশি গৌণদুঃখের লক্ষণও কথিত হয়েছে বলে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, লক্ষণস্থিত 'ৰাধনালক্ষণ' শব্দের দ্বারা মুখ্যদুঃখেরে লক্ষণ কথিত হয়েছে। অপরদিকে, যা বাধনালক্ষণ অর্থাৎ যা বাধনা বা দুঃখের সাথে অনুষঙ্গবিশিষ্ট, তা হল গৌণ দুঃখ। দুঃখের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় জন্মমাত্রই দুঃখ। মুমুক্ষু জন্মে দুঃখদর্শী হয়ে নির্বেদপ্রাপ্ত হন। সুখ ও তার সাধনে কোন প্রয়োজন নেই - এরূপ বুদ্ধিই নির্বেদ। নির্বেদ প্রাপ্ত ব্যক্তি বা নির্বিন্ন ব্যক্তির বৈরাগ্য জন্মায়। ভোগ্যবিষয় উপস্থিত হলেও তাতে বিতৃষ্ণারূপ উপেক্ষাবুদ্ধিই বৈরাগ্য। জন্মে বৈরাগ্য না জন্মালে তা উচ্ছেদের জন্য প্রবৃত্তি হতে পারেনা এবং বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি কখনই সম্ভব নয়। যাঁর বৈরাগ্য জন্মেছে, বা যাঁতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছে, তাঁকে বলে বিরক্ত। বিরক্ত ব্যক্তিই সাধনার ফলে কালে মুক্তিলাভ করে।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন হতে পারে যে, সুখ ও দুঃখ কী? তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট মনে করেন, যা সকল প্রাণীর অনুকূলবেদনীয়, তা হল সুখ।[৩৩] প্রত্যেক জীবের কাছেই সুখ স্বাভাবিক অভিলষিত বিষয়। সুখকে যখন অনুকূল বেদনীয় বলা হয়েছে, তখন 'বেদনীয়' শব্দের দ্বারা জ্ঞায়মান বা জ্ঞানের বিষয় বোদ্ধব্য।[৩৪] আর, 'অনুকূল' শব্দের অর্থ অভিলষিত।[৩৫] কাজেই, যা অভিলষিতত্বরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাই সুখ। কারো কারো মতে, 'অনুকূলবেদনীয়' পদের যথাশ্রুতার্থ হল - অনুকূলত্বপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্য। কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করলে সুখের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। 'ঘটোঽনুকূলঃ' - এরূপ বললে অনুকূলত্ব-প্রকারক-প্রতীতির বিশেষ্যত্ব

---

৩৩ 'সর্বেষামনুকূল (তয়া) ৰেদনীয়ং সুখম্।' - অন্নংভট্ট, সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ - শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় সংস্করণের পুনঃ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৫৯২।

৩৪ তদেব, পৃ - ৫৯৩।

৩৫ অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত - শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ - ২১০।

ঘটে থাকায় ঘটে সুখের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই কারণে 'অনুকূলৱেদনীয়' পদের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণযোগ্য নয়; এর অর্থ হবে - অন্য ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয়ত্ব যাতে আছে,তাই সুখ। অর্থাৎ সুখ অন্য ইচ্ছার অধীন নয়। অন্য কোন পদার্থের ইচ্ছা হলে সুখে ইচ্ছা হয় - এমন নয়। সুখের ইচ্ছায় ভোজনাদিতে ইচ্ছা হলে ভোজনাদিতে অন্যেচ্ছার অর্থাৎ সুখেচ্ছার অধীন বিষয়ত্ব থাকলেও সুখেচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয়ত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।[৩৬] তবে, অন্যেচ্ছা-অনধীন ইচ্ছার বিষয়ত্ব সুখের লক্ষণ হলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ পরকীয় ভোগজন্য সুখে সাধুব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয়না। তা ছাড়া, জীবন্মুক্ত পুরুষের কোন সুখেই ইচ্ছা হয়না। সুতরাং, এই সকল ক্ষেত্রে সুখে ইচ্ছা-বিষয়ত্ব না থাকায় অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্ব-ও থাকে না। এই কারণে এই সকল সুখে ঐ সুখের লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তি বারণের জন্য সুখত্ব জাতিকেই সুখের লক্ষণ বলা হয়।[৩৭] এখানে উল্লেখ্য যে, নব্য ন্যায়ের বিশেষ শৈলী হল জাতিঘটিত লক্ষণ প্রদান করা। এইকারণে নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অনুকূলবেদনীয়কেই সুখের লক্ষণ বললেও দীপিকাটীকায় তিনি পৃথকভাবে নব্য ন্যায়ের ভঙ্গিতে সুখের জাতিঘটিত লক্ষণ প্রদান করে বলেন, 'সুখী অহম্' ইত্যাদি অনুব্যবসায়গম্য সুখত্বাদি জাতিবিশিষ্ট যা, তাই সুখ।[৩৮] 'সুখী অহম্' - এই মানসপ্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় আমাদের হয়ে থাকে। অনুব্যবসায়ের বিষয়ীভূত জ্ঞান অর্থাৎ ব্যবসায় জ্ঞানের অনুগত প্রতীতি হয়ে থাকে। 'সুখী অহম্', 'সুখী অহম্' - এরূপ

---

৩৬ তদেব; পৃ - ২১১।

৩৭ তদেব ।

৩৮ " "সুখী অহম্" ইত্যাদ্যনুব্যৱসায়-গম্যং সুখত্বাদিকমেৱ লক্ষণম্।" - তদেব, পৃ - ২১০।

অনুগত প্রতীতির কারণতাবচ্ছেদকরূপে সুখত্ব অনুগত ধর্ম স্বীকার করতে হয়। অথবা সুখ পদশক্যতাবচ্ছেদকরূপেও সুখত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। এই সুখত্বজাতিবিশিষ্টকেই সুখ বলে।[৩৯]

অপরদিকে, সুখের বিপরীতস্বভাব হল দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখ হল প্রাণীমাত্রের প্রতিকূলবেদনীয়। এখানে 'প্রতিকূল' শব্দের অর্থ দ্বেষের বিষয়। 'প্রতিকূলবেদনীয়' বলতে বোঝায় - অন্য দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়ত্ব। তবে, দ্বেষবিষয়ত্বমাত্র বা দ্বেষ্যমাত্র দুঃখের লক্ষণ হলে সর্পাদিতে ঐ দ্বেষ-বিষয়ত্ব থাকায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু 'অন্য দ্বেষের অনধীন' - এই বিশেষণ প্রযুক্ত হলে ঐ অতিব্যাপ্তি হয়না; কারণ, সর্পজন্য দুঃখে দ্বেষ আছে বলেই সর্পে দ্বেষ হয়েছে, অন্যথায় সর্পে দ্বেষ হত না। কাজেই, সর্পে দ্বেষ অন্য দ্বেষের (সর্পজন্য দুঃখরূপ দ্বেষের) অধীন। ফলতঃ সর্পে অন্য দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়ত্ব না থাকায় সর্পে দুঃখের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়না। তবে, দ্বেষের অনধীন দ্বেষের বিষয়ত্ব দুঃখের প্রকৃত লক্ষণ নয়, তা দুঃখের স্বরূপবোধক বা পরিচায়কমাত্র।[৪০] বরং 'দুঃখী অহম্' ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ দুঃখত্বজাতিই দুঃখের জাতিঘটিত লক্ষণ। অর্থাৎ সুখের মতো দুঃখের ক্ষেত্রেও জাতিঘটিত লক্ষণ প্রদান করা শ্রেয়।

---

[৩৯] অন্নংভট্ট, সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ - শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় সংস্করণের পুনঃ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৫৯২।

[৪০] অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত - শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ - ২১০।

প্রমেয়বিভাগসূত্রে সুখের উল্লেখ না থাকার যৌক্তিকতা ঃ

প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়বিভাগসূত্রে সুখের উল্লেখ না করে দুঃখের উদ্দেশের ফলে মনে হতে পারে যে, সুখ নামক পদার্থের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মহর্ষির অভিপ্রেত নয়। তবে, সুখের অস্তিত্ব নেই - এটি মহর্ষির অভিমত নয়। বরং সুখের অস্তিত্ব আছে - তা মহর্ষি কর্তৃক স্বীকৃত। কারণ, সুখ সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুখের উৎপত্তি হলে সকল জীবই মনের দ্বারা তা প্রত্যক্ষ করে এবং তাকে গ্রহণ করতে তৎপর হয়। ফলতঃ সুখের প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। মহর্ষির অভিমত এই যে, দুঃখের উদ্দেশ সুখের প্রত্যাখ্যান নয়, কারণ দুঃখের অন্তরালে সুখেরও উৎপত্তি হয়। কাজেই, সর্ব জীবেরই দুঃখের মধ্যে সুখেরও উৎপত্তি হয়। সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ এই সুখ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কাজেই দুঃখের মধ্যে যে সুখ জন্মায় - এই সত্যের অপলাপ করা যায় না। কিন্তু এই সুখের পূর্বে ও পরে যে দুঃখ আছে - এটিও অবশ্যম্ভাবী সত্য। এজন্য মুমুক্ষু সুখকেও দুঃখ বলে ভাবনা করবেন - এটি মহর্ষি কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুখও দুঃখানুষঙ্গবিশিষ্ট হওয়ায় সুখও দুঃখ। বস্তুতঃ সুখ দুঃখের প্রকারের অন্তর্গত। অর্থাৎ সুখও এক প্রকার দুঃখ। ন্যায়বার্তিকের প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকর গৌণ ও মুখ্য ভেদে একবিংশতি প্রকার দুঃখের উল্লেখ করেছেন এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলেছেন। মুখ্যদুঃখ, শরীর, ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়, ষড়্‌বিধ অর্থ বা বিষয়, ষড়্‌বিধ বুদ্ধি ও সুখ - এই হল উদ্দ্যোতকর কথিত একবিংশতি প্রকার দুঃখ। 'আমি দুঃখী' - এইরূপে যা সকল জীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, যা প্রতিকূলবেদনীয় বলে কথিত হয়েছে, তাই স্বরূপতঃ দুঃখ অর্থাৎ মুখ্য দুঃখ। শরীরাদি বিংশতিপ্রকার হল গৌণ দুঃখ। এদের মধ্যে শরীর হল ভোগের আয়তন। শরীরাবচ্ছেদেই জীবের দুঃখ জন্মায়; শরীর ব্যতীত তা উৎপন্ন হতে পারে না। আবার, শরীরাবচ্ছেদেই দুঃখের ভোগও হয়। এইরূপে দুঃখানুসক্ত হওয়ায় শরীরকে দুঃখ বলা হয়েছে। ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয় ও তজ্জন্য

ষড়্‌বিধ বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির ষড়্‌বিধ বিষয় - এই অষ্টাদশ পদার্থ দুঃখের সাধন হওয়ায় দুঃখরূপে কথিত হয়েছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরোক্ত ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছেন। আবার, ষড়্‌বিধ বিষয়ের ব্যাখ্যায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন - এই ত্রিবিধ আত্মগুণকে মনের বিষয় বলেছেন। অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে, বার্ত্তিককার ষড়্‌বিধ বিষয় বলতে পঞ্চবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন - এই গুণত্রয়কে মনোগ্রাহ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধি মনোগ্রাহ্য বিষয় হলেও তা মনোগ্রাহ্য ষড়্‌বিধ বিষয়ের অন্তর্গত না করে উদ্দ্যোতকর তার পৃথক উল্লেখ করেছেন; কারণ, বুদ্ধির উল্লেখ ব্যতীত বুদ্ধির বিষয়ের উল্লেখ অর্থহীন।

একবিংশতি প্রকার দুঃখের মধ্যে সর্বশেষ হল সুখ। সুখ দুঃখানুসক্ত। অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধশূন্য সুখ হতে পারে না। জীবের সুখ মাত্রই দুঃখানুবিদ্ধ। এজন্য সুখকেও দুঃখের প্রকারের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই সুখও মনোগ্রাহ্য বিষয় এবং পূর্বকথিত ষড়্‌বিধ বিষয়ের ন্যায় দুঃখের সাধন। তবে, সুখ মাত্রই দুঃখানুসক্ত হওয়ায় তা দুঃখ এবং এই কারণেই সুখকে দুঃখরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, সুখ আছে; কিন্তু তা দুঃখানুবিদ্ধ বলেই বিবেকীর পক্ষে দুঃখ। বিবেকী মুমুক্ষু সুখকে দুঃখ বলে ভাবনা করবেন - এইরূপ উপদেশ করতেই মহর্ষি সুখকেও দুঃখ বলেছেন।

এখানে আপত্তি হতে পারে, সুখের অভাবই দুঃখ এবং দুঃখের অভাবই সুখ; সুখ ও দুঃখ বলে কোন ভাব পদার্থ নেই। কিন্তু এরূপ আপত্তি যথার্থ নয়। কারণ, সুখ ও দুঃখের ভাবরূপতা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। তাই সুখ ও দুঃখ অভাব পদার্থরূপে অনুভূত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, প্রচণ্ড গরমে নাভি পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে নাভির নিম্নভাগে সুখের এবং নাভির

উর্ধ্বভাগে দুঃখের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। সুতরাং, সুখাভাবই দুঃখ এবং দুঃখাভাবই সুখ নয়।[৪১]

এ প্রসঙ্গে শ্রীবাচস্পতিমিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর দ্বাদশ কারিকার টীকায় উক্ত মতের উল্লেখপূর্বক ঐ মতের খণ্ডন করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ গুনত্রয়ের লক্ষণে দ্বাদশ কারিকায় বলেছেন, 'প্রীত্যপ্রীতিৰিষাদাত্মকাঃ।'[৪২] 'প্রীতি' শব্দের দ্বারা সুখ, 'অপ্রীতি' শব্দের দ্বারা দুঃখ এবং 'ৰিষাদ' শব্দের দ্বারা মোহ বোদ্ধব্য। এখানে পূর্বপক্ষ হতে পারে যে, 'প্রীত্যপ্রীতিৰিষাদাঃ' - এরূপ বললেই যথাক্রমে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তম - এর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যেত; লক্ষণস্থ 'আত্ম' শব্দের প্রয়োজন কী? শ্রী বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, যাঁদের মতে সুখ দুঃখাভাবস্বরূপ, দুঃখাভাব অতিরিক্তভাবে সুখ নামক কোন পদার্থ নেই; আবার, দুঃখও সুখাভাব; সুখাভাব ভিন্ন দুঃখ নামক কোন পদার্থ নেই - এরূপ পূর্বপক্ষীর মত নিরাকরণের জন্যই 'আত্ম' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।[৪৩] সুখাদি পরস্পরের অভাব নয়। সুখ দুঃখাভাব নয়, এবং দুঃখ সুখাভাবকে বোঝায় না, যেহেতু সুখাদি হল ভাবপদার্থ। সুখাদির ভাবপদার্থত্ব বোঝাবার জন্য 'আত্ম' শব্দ গৃহীত হয়েছে। 'আত্ম' শব্দ ভাববাচী। 'আত্ম' শব্দের ভাববোধকতা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং অনুভবসিদ্ধ। ফলতঃ সুখ ও দুঃখকে অভাব পদার্থ বলে অনুভব করা যায় না। অহং সুখী, অহং দুঃখী - এরূপ স্বীয় অনুভবের দ্বারা সুখ ও দুঃখকে ভাববস্তুরূপে বোঝা যায়। সুখের অভাব দুঃখ এবং দুঃখের অভাব সুখ - এরূপ বললে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য। কারণ, সুখ যদি দুঃখাভাব হয়, তা হলে সুখ বুঝতে গেলে দুঃখ

---

[৪১] অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত - শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ - ২১১।

[৪২] বাচস্পতিমিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী - শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পঞ্চম প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ - ১২৯।

[৪৩] ''যে তু মন্যন্তে ''ন প্রীতির্দুঃখাভাৰাদতিরিচ্যতে, এৰং দুঃখমপি ন প্রীত্যভাৰাদন্যদিতি, তান্ প্রতি ''আত্ম'' গ্রহণম্।'' - তদেব, পৃ- ১৩০।

বোঝা আবশ্যক এবং দুঃখ যদি সুখাভাব হয়, তা হলে দুঃখ বুঝতে গেলে সুখকে বোঝা আবশ্যক, যে হেতু অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং, সুখাদিকে পরস্পরের অভাবস্বরূপ বলা যায় না। সুখাদিকে পরস্পরের অভাবস্বরূপ বললে কোন একটির সিদ্ধি করতে হবে এবং ফলতঃ অপরটির উপর নির্ভর করতে হবে। তার ফলে কোনটির সিদ্ধি না হওয়ায় উভয়েরই সিদ্ধি পরাহত হবে। কিন্তু যেভাবেই হোক সুখ ও দুঃখ পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তী উভয়েরই সিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় সুখকে দুঃখাভাবরূপে অথবা দুঃখকে সুখাভাবরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনুরূপ আপত্তির উল্লেখপূর্বক ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্টও তা খণ্ডন করেছেন। কোন কোন সম্প্রদায় দুঃখ এবং দুঃখাভাব - এরূপে দু'টি পদার্থ স্বীকার করেন। দুঃখাভাব আতিরিক্ত সুখ নামক পদার্থ স্বীকার করেন না। এই মতের খণ্ডনে ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরভট্ট বলেছেন, সুখকে যদি ভাবপদার্থরূপে স্বীকার না করে দুঃখাভাবরূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে জীব যে সুখকে আনন্দরূপে অনুভব করে, সেই অনুভবের সঙ্গে বিরোধ হয়, যেহেতু দুঃখাভাবকে কেউ আনন্দরূপে অনুভব করে না।[৪৪] উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন অসুস্থ্য ব্যক্তির কোন এক বিশেষ দিনে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ আছে। সেই ভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে ঐ ব্যক্তির সুখানুভূতি হবে ঠিকই, কিন্তু ভোজবাড়িতে যোগ দিয়ে সুখ প্রাপ্তির তুলনায় ঐ ব্যক্তির কাছে বেশি কাম্য হল তার অসুস্থতা দূরীকরণ তথা দুঃখাভাব প্রাপ্তি। আরো বলা যায় যে, যে ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত, সেই মুমূর্ষুর শরীরে পীড়াজনিত দুঃখানুভূতি হয়। সেই

---

[৪৪] প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্য (দ্বিতীয়ভাগ), দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ (১৪০৭ বঙ্গাব্দ), পৃ - ৪৩৫-৪৩৬।

দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সে ঐ মুহূর্তে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না, বরং দুঃখাভাবই কামনা করে। কাজেই দুঃখাভাবের অনুভূতি সুখের অনুভূতির থেকে পৃথক। সুতরাং, দুঃখাভাবকে কেউ সুখরূপে অনুভব করেনা।

তা ছাড়া আরো বলা যায় যে, জীব মাত্রেরই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি হয়ে থাকে; প্রথমতঃ হিত প্রাপ্তির জন্য জীব প্রবৃত্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ অহিত পরিহারের জন্য অহিতকর বস্তু থেকে নিবৃত্ত হয়। কাজেই, দু'টি বিষয় - হিত প্রাপ্তি এবং অহিত পরিহার। এখন হিত প্রাপ্তি হলে জীবের সুখানুভূতি হয়; আবার অহিত পরিহারের ফলেও সুখানুভূতি হয়। কাজেই, হিত প্রাপ্তি এবং অহিত পরিত্যাগের প্রতি সুখই প্রবর্ত্তক হয়ে থাকে, কখনই দুঃখাভাব প্রবর্তক হয় না। কাজেই, দুঃখাভাবকে সুখের সাথে অভিন্ন বললে এই প্রবৃত্তিরও অনুপপত্তি হবে।

বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ - এই দু'টি অভিন্ন নয়, বরং ভিন্ন। যদি কেউ আপত্তি করে বলেন যে, দুঃখাভাব অতিরিক্ত সুখের প্রত্যক্ষ হয়না, তাহলে এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, সামগ্রীভেদে কার্যভেদ সিদ্ধ হয়। আসলে সুখ ও দুঃখের যুগপৎ অনুপলব্ধিবশতঃ উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়।[৪৫]

আবার সুখ ও দুঃখ - এই উভয় পদার্থই যে বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত, তার প্রমাণ বৈশেষিক সূত্রেও পাওয়া যায়। বৈশেষিক সূত্রকার কণাদ বলেছেন, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ এবং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগই সুখদুঃখের হেতু।[৪৬] দুঃখাভাবই সুখ হলে কোন ব্যক্তির একইকালে পায়ে বেদনা অর্থাৎ দুঃখ এবং মাথায় সুখ হওয়া সম্ভব নয়। একই

---

[৪৫] বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাসহ) - শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৫৫৪।

[৪৬] 'আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখ দুঃখে' - বৈশেষিকসূত্র ৫।২।১৫।।

শরীরাবচ্ছেদে আমাদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে। যেমন, একই কালে পায়ে প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হচ্ছে, আবার সেই কালেই যদি কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তাহলে মাথায় সুখানুভূতি হয়। কাজেই, সুখ ও দুঃখ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ হওয়াতেই এরূপ সম্ভবপর হয়, অন্যথায় তা হত না।

আবার অনেকের মতে, সুখ ও দুঃখ জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ জ্ঞান থেকে অভিন্ন। কারণ, সুখাদিতে জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্ব আছে। ফলতঃ সুখাদি জ্ঞানবিশেষ অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। কিন্তু নৈয়ায়িক এরূপ বক্তব্য স্বীকার করেন না। কারণ, সুখ-দুঃখ নির্বিষয়ক; অপরদিকে, জ্ঞান সবিষয়ক। শুধু তাই নয়, সুখ-দুঃখের তীব্র সংবেদন আমরা অনুভব করে থাকি; কিন্তু জ্ঞান তীব্র সংবেদ্যত্ববিশিষ্ট নয়। সুতরাং, সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ হলেও আত্মার অপর গুণ বুদ্ধি বা জ্ঞানস্বরূপ হতে পারেনা।[৪৭]

দার্শনিক দৃষ্টিতে শরীর প্রভৃতিও একপ্রকার দুঃখ ঃ

পূর্বে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমি দুঃখী' - এরূপে সর্বজীবের যা মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, যা সর্বজীবের প্রতিকূলবেদনীয়, তাই মুখ্য দুঃখ। আর শরীরাদি বিংশতি প্রকার গৌণ দুঃখ। শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলে ভাবনার নামই দুঃখ-সংজ্ঞা-ভাবনা। এখানে, সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, শরীরাদি পদার্থ যদি মুখ্য দুঃখের অন্তর্গত না হয়, তবে মহর্ষি কেন

[৪৭] বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাসহ) - শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৫৫৪।

ঐ সমস্ত পদার্থকে দুঃখ বলেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি নিজেই দিয়েছেন। শরীরাদিকে দুঃখরূপে উপদেশের হেতুস্বরূপ মহর্ষি যা বলেছেন, তা আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমতঃ শরীরাদি সমস্ত পদার্থ বস্তুতঃ মুখ্য দুঃখ না হলেও দুঃখানুসক্ত এবং এই কারণেই ঋষিগণ শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলেছেন। শরীরাদি পদার্থকে যে হেতুবশতঃ মহর্ষি দুঃখভাবনার উপদেশ করেন, তা ব্যাখ্যা করতে মহর্ষি বলেছেন, 'ৰিৰিধৰাধনাযোগাদ্দুঃখমেৰ জন্মোৎপত্তি।।'[৪৮] অর্থাৎ নানা প্রকার দুঃখের সম্বন্ধপ্রযুক্ত জন্মের উৎপত্তি দুঃখই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সূত্রোক্ত 'জন্মন্' শব্দের দ্বারা 'জায়তে' অর্থাৎ যা জন্মায় - এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকেই গ্রহণ করেছেন।[৪৯] অর্থাৎ সূত্রে 'জন্মোৎপত্তি' শব্দের দ্বারা এখানে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি বোদ্ধব্য। আকৃতিবিশিষ্টরূপে শরীরাদির প্রাদুর্ভাবই তার উৎপত্তি। জন্মোৎপত্তি হলেই জীবের নানাবিধ দুঃখযোগ হয়। সুতরাং, জীবের জন্মোৎপত্তি বিবিধ দুঃখানুসক্ত হওয়ায় দুঃখই। এখানে উল্লখ্য যে, সূত্রস্থ 'এব' শব্দ সুখের নিষেধার্থ নয়, কিন্তু জন্মের নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্যই তা প্রযুক্ত হয়েছে। ভাষ্যকার বলেছেন যে, মহর্ষি সূত্রে 'দুঃখমেব' শব্দে 'এব' শব্দাংশের দ্বারা জন্ম দুঃখই - এইরূপ ভাবনার কর্তব্যতা সূচনা করেছেন। অর্থাৎ জন্মে সুখবুদ্ধি করা উচিৎ নয়, দুঃখবুদ্ধিই উচিত - এটি মহর্ষির উপদেশ।[৫০] কাজেই, জন্ম এবং সুখ - এরা কেউই স্বরূপতঃ দুঃখ পদার্থ নয়, বরং দুঃখের উপচারবশতঃই দুঃখ।

দ্বিতীয়তঃ শরীরাদিতে দুঃখভাবনার উপদেশের হেতুস্বরূপ মহর্ষি আরো বলেছেন যে, জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সুখের জন্য সতত প্রার্থনা ও চেষ্টা করলেও প্রার্থনার দোষবশতঃ তার দুঃখনিবৃত্তি

---

[৪৮] ন্যায়সূত্র ৪।১।৫৪।

[৪৯] 'জন্ম জায়ত ইতি শরীরেন্দ্রিয়ৰুদ্ধয়ঃ।'- ৪।১।৫৪ ন্যায়সূত্রভাষ্য।

[৫০] 'জন্মৰিনিগ্রহাথীয়ো ৰৈ খল্বয়মেৰশব্দঃ' - ন্যায়সূত্রভাষ্য ৪।১।৫৭।

হয় না। উপরন্তু সুখের প্রার্থনার ফলে জীবের আরো নানাবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। 'বাধনাঽনিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাদপ্রতিষেধঃ।।'[৫১] - এই ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন, পর্য্যেষণ হল প্রার্থনা, আর্থাৎ বিষয়ার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। জীব কোন বিষয়কে সুখসাধনরূপে বা ইষ্টসাধনরূপে বুঝলে তার প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু এই প্রার্থনার দোষ হল এই যে, জীব প্রার্থনা করলেও প্রায়ই তার প্রার্থিত বিষয় উপলব্ধ হয় না; কোন স্থলে ঐ প্রার্থনা সফল হলেও স্থায়ী হয় না, বিনষ্ট হয়ে যায়; অথবা ন্যূন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হয়ে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ঐ প্রার্থনা সম্পন্ন হলেও তার প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রার্থনার এরূপ নানা দোষবশতঃ প্রার্থী জীবের নানাবিধ মানস দুঃখ জন্মায়। বস্তুতঃ এইসব কারণে জীব কিছুতেই শান্তি পায় না। কারণ, প্রার্থিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যেমন অশান্তি, আবার তা সম্পন্ন হয়ে বিনষ্ট হলে আরো অশান্তি; তা সম্পূর্ণভাবে না পেলেও অশান্তি, আবার পেলেও সেই প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হলে তখন আবার অশান্তি এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং, প্রার্থীর সর্বদা অশান্তি লেগেই থাকে। কাজেই, যে সুখের জন্য জীব সতত চেষ্টা করে, সেই সুখের পূর্বে, মধ্যে ও পরে সর্বদাই দুঃখের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ সুখপ্রার্থী কখনই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। প্রার্থীর প্রার্থনার উক্তরূপ নানাপ্রকার দোষবশতঃ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, এবং এই জন্যই জন্ম আর্থাৎ শরীরাদিতে দুঃখভাবনার উপদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুখের অভাববশতঃ বা সুখের অস্বীকার করে শরীরাদিকে দুঃখ বলা হয়নি।

তৃতীয়তঃ শরীরাদিতে দুঃখভাবনার উপদেশ করার আন্যতম কারণ হল এই যে, অবিবেকীদের বিবিধ দুঃখজনক পদার্থে সুখ-ভ্রম হয়; কাজেই, বিবেকী ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখভাবনার উপদেশের প্রয়োজন না থাকলেও অবিবেকীগণের জন্য ঐরূপ উপদেশের প্রয়োজন

[৫১] ন্যায়সূত্র ৪।১৫৬।।

আছে। বিবেকী ব্যক্তি সাংসারিক সুখ ও তার বিবিধ সাধনকে দুঃখানুসক্তরূপে বোধ করবেন এবং দুঃখভাবনার উপদেশ ব্যতীত কালে স্বয়ংই তাঁরা ঐ সুখের প্রাপ্তির চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হবেন। কিন্তু অবিবেকীব্যক্তিগণের জন্য ঐ উপদেশের প্রয়োজন আছে, কারণ, অবিবেকী তথা বিবেকশূন্য সাধারণ জীব সুখকেই পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে সুখ ব্যতীত কোন নিঃশ্রেয়স নেই। এই সুখপ্রাপ্তির জন্য জীব নানাবিধ চেষ্টা করে এবং তার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ লাভ করে সংসারকে অতিক্রম করতে পারে না। কাজেই, সুখকে পরম পুরুষার্থরূপে জ্ঞান করে বিবেকশূন্য ব্যক্তি যে সকল কার্য করে, তা প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ দুঃখের কারণ হয়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির (যা ন্যায়শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য) প্রতিবন্ধক হয়। যে সুখ-বুদ্ধি বা সুখ-সংজ্ঞার দ্বারা হতবুদ্ধি হয়ে জীব আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তা বিনষ্ট করা আবশ্যক এবং প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারাই তা বিনষ্ট হতে পারে। এই কারণেই সুখসংজ্ঞার প্রতিবন্ধক দুঃখসংজ্ঞার ভাবনার উপদেশ করা হয়েছে।

দুঃখের কারণসমূহ ঃ

মহর্ষি কথিত দ্বাদশ প্রমেয়ের মধ্যে একাদশ প্রমেয় দুঃখের কারণ কী - তা ব্যাখ্যা করতে প্রথমেই মহর্ষি কথিত দ্বিতীয় সূত্রটির উল্লেখ আবশ্যক। দ্বিতীয় সূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে, 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ'[৫২] অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের পর পরটির নিবৃত্তি হলে 'তদনন্তর' অপবর্গ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, কারণের

---

[৫২] ন্যায়সূত্র ১।১।২।।

অপায়ে যেমন কার্যের অপায় হয়ে থাকে, তেমনি দুঃখাদি পদার্থগুলির কার্যকারণের মতো নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব থাকায় তাদের এক-একটির উত্তরের অপায়ে তার কার্য পূর্বটির অপায় বা নিবৃত্তি হয়ে থাকে। যেমন - কফের নিমিত্ত জ্বর হলে কফের নিবৃত্তি হওয়ার পর জ্বরেরও নিবৃত্তি হয়; ঠিক তেমনই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে তার কার্য দোষেরও নিবৃত্তি হয়; দোষের নিবৃত্তি হলে তার কার্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়; প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হলে জন্মের নিবৃত্তি হয় এবং জন্মের নিবৃত্তি হলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং, দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ - এগুলি মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক; আবার মিথ্যাজ্ঞান দুঃখাদিপূর্বক। তবে, দুঃখাদি অনাদি হওয়ায় পূর্বে দুঃখাদি পরে মিথ্যাজ্ঞান, অথবা পূর্বে মিথ্যাজ্ঞান পরে দুঃখাদি - একথা বলা যায় না। অনাদিকাল থেকে দুঃখাদি পদার্থগুলির কার্যকারণভাবই সংসার। সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে দুঃখাদি অনাদি হলেও তাদের মধ্যে পূর্বাপরভাব না থাকলেও কার্যকারণভাব বর্তমান। সুতরাং, দুঃখরূপ কার্যের প্রতি মিথ্যাজ্ঞান মূল কারণ হলেও জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ - এই তিনটিও পরম্পরায় কারণ।

জন্ম, প্রবৃত্তি ও দোষ দুঃখের প্রতি কারণ হয়ে থাকে। তা নিরূপণ করতে আমরা এখন তদ্বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। জন্ম বলতে বোঝায় আত্মার শরীর ধারণ। শরীর হল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মনবিশিষ্ট। সুতরাং, জন্মকে ব্যাখ্যার জন্য শরীরাদির ব্যাখ্যা আবশ্যক। শরীর হল চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়। অর্থাৎ শরীর হল তাই যাতে চেষ্টাশ্রয়ত্ব, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব ও অর্থাশ্রয়ত্ব আছে। এই তিনটিই শরীরের লক্ষণ।[৫৩] শরীরকে যখন চেষ্টার আশ্রয় বলা হয়েছে, তখন ক্রিয়ামাত্রকেই চেষ্টা বলা হয়নি। এটি বোঝাবার জন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত পরিহারের অর্থাৎ ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্তির ও জিহাসিত পদার্থ

[৫৩] 'চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১১।

পরিত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ প্রযত্নবান পুরুষের বা জীবের যে উপায়ানুষ্ঠানরূপ সমীহা, তাকেই বলে চেষ্টা।[৫৪] এই চেষ্টা যেখানে অর্থাৎ যে আশ্রয়ে থাকে, তাকেই শরীর বলে। এই প্রকার চেষ্টা শরীরেরই ধর্ম।

শরীরের দ্বিতীয় লক্ষণ হল ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব। তবে, ঘটাদি দ্রব্যে চক্ষুসংযোগ হলে সেই কালে সেইসব দ্রব্যও ইন্দ্রয়াশ্রয় হয়ে থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্ব কেবল শরীরের লক্ষণ, একথা বলা সঙ্গত নয়। এরূপ আপত্তি বারণের জন্য ভাষ্যকার বলেন, যখন শরীরকে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলা হয়, তখন যেকোন সম্বন্ধে শরীর ইন্দ্রিয়ের অধিকরণ হয় না। বরং যার সত্তাবশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ সত্তাবিশিষ্ট হয় এবং যার বিনাশে ইন্দ্রিয়ও অবশ্য বিনষ্ট হয়, সেই পদার্থই হল শরীর। শরীরের সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট এই ইন্দ্রিয়বর্গ সাধু ও অসাধু নিজ বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিষয় গন্ধাদির গ্রাহক হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেছেন যে, 'চক্ষুষ্মান্ দেৰদত্তোহয়ং' ইত্যাদি প্রতীতি হওয়ায় দেবদত্তাদি-শরীর যে চক্ষুরিন্দ্রিয়বিশিষ্ট তা বোঝা যায়। সুতরাং, সেই শরীর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ সেই শরীরে চক্ষুরিন্দ্রয়ের অবচ্ছেদকতা নামক স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার্য। তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ত্বই শরীরের দ্বিতীয় লক্ষণ।

অর্থাশ্রয়ত্ব হল শরীরের তৃতীয় লক্ষণ। ঘটাদি দ্রব্য গন্ধাদি অর্থের আশ্রয় হওয়ায় ঘটাদিতে শরীরের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বাৎস্যায়ন বলেন যে, 'অর্থ' শব্দের দ্বারা এখানে মহর্ষি কথিত চতুর্থ প্রমেয় গন্ধাদিকে বোঝানো হয়নি। এখানে 'অর্থ' শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়েছে। এখানে সুখ ও দুঃখ 'অর্থ' শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। শরীর হল

---

[৫৪] 'ঈপ্সিতং জিহাসিতং ৰাঽর্থমধিকৃত্য ঈপ্সা-জিহাসা-প্রযুক্তস্য তদুপায়ানুষ্ঠানমক্ষণা সমীহা চেষ্টা।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১১ -এর বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

সেই অধিষ্ঠান যেখানে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষহেতুক সুখ ও দুঃখের অনুভব জন্মায়। সুতরাং, সুখ-দুঃখানুভব অর্থের আশ্রয় এই শরীর। শরীর না থাকলে আত্মায় সুখ-দুঃখানুভব জন্মায় না। শরীরাবচ্ছেদেই আত্মায় সুখ ও দুঃখের মানসপ্রত্যক্ষরূপ অনুভব জন্মায়। সুতরাং, যেহেতু জীবের শরীরই তার সুখ, দুঃখ ও তার অনুভবের অবচ্ছেদক, সেহেতু অবচ্ছেদকাতা সম্বন্ধে সুখ-দুঃখরূপ অর্থের আশ্রয়ত্ব শরীরের লক্ষণ।

সর্বোপরি শরীর হল আত্মার ভোগের অধিষ্ঠান। এই কারণেই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, 'তস্য ভোগাধিষ্ঠানং।' শরীরাবচ্ছেদেই জীবাত্মার সুখ-দুঃখের ভোগ হয়ে থাকে। শরীর ব্যতীত আত্মার ভোগ অসম্ভব।

জীবাত্মার এই শরীর পরিগ্রহ করাকেই জন্ম বলে। এই শরীর ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় - একথা পূর্বেই শরীরের লক্ষণ আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয় হল মহর্ষি কথিত তৃতীয় প্রমেয় পদার্থ। যদিও ন্যায়দর্শনে ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয় স্বীকৃত হয়ে থাকে, তথাপি মহর্ষি তৃতীয় প্রমেয়রূপে যখন ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেন, যখন তিনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতজন্য ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র - এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়কে বুঝিয়েছেন।[৫৫] এখানে উল্লেখ্য যে, অন্তরিন্দ্রিয় মন এই তৃতীয় প্রমেয়ের মধ্যে উল্লিখিত হয়নি। কারণ, মন ইন্দ্রিয় হলেও মহর্ষি কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে ষষ্ঠ প্রমেয়রূপে উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চভূত থেকে জাত পঞ্চবহিরিন্দ্রিয়ই মহর্ষি কথিত তৃতীয় প্রমেয়পদার্থ।

যাই হোক, ভাষ্যকার বলেছেন, 'ভোগসাধনানি।' অর্থাৎ শরীর জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের অধিষ্ঠান হলেও সেই ভোগের সাধন হল ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়। ভোগের সাধন বলার মাধ্যমে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সামান্যলক্ষণ সূচিত হয়েছে। যদিও ১।১।১২ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বহিরিন্দ্রিয়গুলির নাম

---

[৫৫] 'ঘ্রাণ-রসন-চক্ষুস্তক্-শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১২

সংকীর্তন করেছেন, তথাপি ঘ্রাণাদি শব্দের দ্বারা তাদের বিশেষ লক্ষণও সূচিত হয়েছে। যেমন - গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব, রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব, রূপদর্শনের সাধন ইন্দ্রিয়ত্ব, স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব, শব্দের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ত্ব - এইভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ লক্ষণ এবং এগুলির মাধ্যমেই সামান্যলক্ষণও সূচিত হয়েছে।

এই পঞ্চবহিরিন্দ্রিয়ের কারণ হল পঞ্চভূতসমূহ। পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম - এই পঞ্চভূত থেকেই যথাক্রমে ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র - এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। এই ইন্দ্রিয়গুলির কারণ পঞ্চভূতের গুণসমূহই হল অর্থ বা ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রাহ্যবিষয়। পূর্বোক্ত পঞ্চভূতের গুণগুলি হল যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ,স্পর্শ ও শব্দ। তবে গন্ধাদি পঞ্চগুণই পঞ্চভূতের গুণ নয়। মহর্ষির মতে, গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ হল পৃথিবীর গুণ; রস, রূপ ও স্পর্শ জলের গুণ; রূপ ও স্পর্শ তেজের গুণ; স্পর্শ বায়ুর গুণ; এবং শব্দ আকাশের গুণ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহিরিন্দ্রিয়গুলি জীবাত্মার সুখ ও দুঃখ ভোগের সাধন। কিন্তু কীভাবে? উত্তর হল, জ্ঞান বা বুদ্ধির মাধ্যমে। ন্যায়দর্শনে বুদ্ধি, জ্ঞান, উপলব্ধি - এগুলি পর্য্যায় শব্দ। আত্মায় জ্ঞানশক্তি থাকায় তা চৈতন্য নামে কথিত হয়ে থাকে। জ্ঞান সর্বজীবেরই অনুভবসিদ্ধ। যা জ্ঞানত্বজাতিবিশিষ্ট, তাই জ্ঞান বা বুদ্ধি। আত্মার বিশেষগুণ হল জ্ঞান। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীর হল চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয়। কোন বিষয়ের প্রতি চেষ্টা বা প্রবৃত্তি বা প্রযত্নের জন্য সেই বিষয়ের জ্ঞান বা উপলব্ধি আবশ্যক। আবার, শরীর যে ইন্দ্রিয়বর্গবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্রিয়বর্গেরও নিজ নিজ অর্থের প্রতি প্রবৃত্তির অন্যতম কারণ হল জ্ঞান। এই প্রবৃত্তির ফলেই আত্মায় সুখ বা দুঃখ অনুভূত হয়, যাদের ভোগ সম্ভব হয় শরীরের মাধ্যমে।

তবে, এই জ্ঞানোৎপত্তিই সম্ভব হয় না, যদি না আত্মার সাথে মনের সংযোগ সাধিত হয়। অর্থাৎ আত্ম-মনঃ সংযোগ জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। প্রতিটি জীবদেহে একটি করে মন থাকে। মন অণুপরিমান নিত্য দ্রব্য। স্ব স্ব বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ এবং মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে তবেই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, একই কালে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয় ও তার গ্রাহ্য গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলেও সেই একইক্ষণে সেই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। কারণ, সেইক্ষণে মন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। মন অণু-পরিমাণ হওয়ায় একইক্ষণে একটিই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তা সংযুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু এই মন বিভু বা পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হলে তা শরীরব্যাপী বিস্তৃত থাকত এবং তাহলে সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তার সংযোগ হত এবং যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হত।

যাই হোক, দুঃখের কারণতারূপে জন্মের উল্লখ করা হয়েছিল এবং সেই প্রসঙ্গেই শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি ও মন - এই সব প্রমেয় পদার্থের আলোচনা করা হল। প্রবৃত্তিও দুঃখ এর অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। তবে, প্রবৃত্তি কীভাবে দুঃখের কারণ হয়ে থাকে, তা আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পদার্থ ত্রিবিধ; যথা - গ্রাহ্য, ত্যাজ্য ও উপেক্ষনীয়। প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তির মাধ্যমেই কোন বিষয় গ্রাহ্য অথবা ত্যাজ্য - সেই বোধ জন্মায়। প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ জ্ঞাত হলে তারপরে জ্ঞাতার সেই পদার্থ বিষয়ে ত্রিবিধ বোধ বা জ্ঞান হতে পারে; যথা - জ্ঞাতা ঐ বিষয়টিকে গ্রাহ্যরূপে, অথবা হেয় বা তাজ্যরূপে আথবা উপেক্ষণীয়রূপে বোধ করে।[৩৩] জ্ঞাতা জ্ঞেয় পদার্থকে হেয়রূপে বুঝলে তাকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ

তবে, এই জ্ঞানোৎপত্তিই সম্ভব হয় না, যদি না আত্মার সাথে মনের সংযোগ সাধিত হয়। অর্থাৎ আত্ম-মনঃ সংযোগ জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। প্রতিটি জীবদেহে একটি করে মন থাকে। মন অণুপরিমান নিত্য দ্রব্য। স্ব স্ব বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ এবং মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে তবেই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হয়ে থাকে। তবে, একই কালে ঘ্রাণাদি অনেক ইন্দ্রিয় ও তার গ্রাহ্য গন্ধাদি অনেক বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলেও সেই একইক্ষণে সেই সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। কারণ, সেইক্ষণে মন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। মন অণু-পরিমাণ হওয়ায় একইক্ষণে একটিই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তা সংযুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু এই মন বিভু বা পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হলে তা শরীরব্যাপী বিস্তৃত থাকত এবং তাহলে সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তার সংযোগ হত এবং যুগপৎ নানা প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হত।

যাই হোক, দুঃখের কারণতারূপে জন্মের উল্লখ করা হয়েছিল এবং সেই প্রসঙ্গেই শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি ও মন - এই সব প্রমেয় পদার্থের আলোচনা করা হল। প্রবৃত্তিও দুঃখ এর অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। তবে, প্রবৃত্তি কীভাবে দুঃখের কারণ হয়ে থাকে, তা আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পদার্থ ত্রিবিধ; যথা - গ্রাহ্য, ত্যাজ্য ও উপেক্ষনীয়। প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তির মাধ্যমেই কোন বিষয় গ্রাহ্য অথবা ত্যাজ্য - সেই বোধ জন্মায়। প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ জ্ঞাত হলে তারপরে জ্ঞাতার সেই পদার্থ বিষয়ে ত্রিবিধ বোধ বা জ্ঞান হতে পারে; যথা - জ্ঞাতা ঐ বিষয়টিকে গ্রাহ্যরূপে, অথবা হেয় বা তাজ্যরূপে আথবা উপেক্ষণীয়রূপে বোধ করে।[৫৬] জ্ঞাতা জ্ঞেয় পদার্থকে হেয়রূপে বুঝলে তাকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ

সেই বিষয়ের প্রতি জ্ঞাতা নিবৃত্ত হয়। নিবৃত্তিকে আমরা নঞর্থক প্রবৃত্তি বলতে পারি। জ্ঞেয় পদার্থকে গ্রাহ্যরূপে বুঝলে জ্ঞাতা পদার্থটিকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ সেই পদার্থের প্রতি জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। আর জ্ঞাত পদার্থটিকে উপেক্ষণীয়রূপে বুঝলে পদার্থটির প্রতি জ্ঞাতার উপেক্ষা হয়, অর্থাৎ সেই পদার্থের প্রতি জ্ঞাতা প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়। গ্রহণ, হান বা উপেক্ষা প্রতিটির প্রতি বিষয়ের জ্ঞান কারণ হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের দ্বারা হেয়ত্ববোধে কোন পদার্থকে জ্ঞাতা ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধি বা জ্ঞানকে বলে হানবুদ্ধি। অনুরূপভাবে, যে বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞাতা উপাদেয়ত্ব বা গ্রাহ্যত্বের বোধ করে কোন পদার্থ গ্রহণ করে, তাকে উপাদানবুদ্ধি বলে। আর, যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষত্বের বোধ করে জ্ঞাতা কোন পদার্থকে উপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানকে বলে উপেক্ষাবুদ্ধি।[৫৭]

কাজেই দেখা গেল যে, উপাদানবুদ্ধি থেকে প্রবৃত্তি এবং হানবুদ্ধি থেকে নিবৃত্তি জন্মায়। কিন্তু উপেক্ষণীয় বিষয়ে গ্রহণের ইচ্ছা বা ত্যাগের ইচ্ছা না হওয়ায় সেই বিষয়ে কোন বিষয়ে কোন প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মায় না, বরং উপেক্ষা জন্মায়। বস্তুতঃ যে পদার্থকে জ্ঞাতা নিজের উপকারী বা অপকারী - এই উভয়ের কোনরূপেই বোঝে না, সেই পদার্থই উপেক্ষণীয় এবং এই পদার্থের প্রতি যে বোধ তা হল উপেক্ষাবুদ্ধি। সুতরাং, প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়ের প্রমা বা যথার্থ অনুভব হলে সেই প্রমার বিষয়ের প্রাপ্তি বা পরিহারের ইচ্ছা জন্মায় এবং সেই ইচ্ছা থেকেই প্রমার বিষয় প্রাপ্তির বা পরিহারের প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। বিষয় প্রাপ্তি বা পরিহাররূপে প্রবৃত্তিসাফল্য হয়ে থাকে।

---

৫৬ 'জ্ঞাতে খল্বর্থে ত্রিবিধা বুদ্ধির্ভবতি হেয়ো ৰোপদেয়ো ৰোপেক্ষণীয়ো বেতি' - উদ্দ্যোতকর, গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ ফিলসফিক্যাল্ রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ-২৭, পং - ৫-৬।

৫৭ 'যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলম্।' - বাৎস্যায়ন, গৌতমীয় ন্যায়দর্শনভাষ্য - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ৮, পং - ১৮ ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘প্রবৃত্তি’ শব্দটি অনেকার্থক। কর্ম, ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট, চেষ্টা, সমীহা, প্রযত্ন - এগুলি প্রবৃত্তির পর্যায় শব্দ। মহর্ষি গৌতম ‘প্রবৃত্তি’ নামক সপ্তম প্রমেয় পদার্থের লক্ষণসূত্রে বলেছেন, ‘প্রবৃত্তির্বাগবুদ্ধিশরীরারম্ভঃ’[৫৮] অর্থাৎ প্রবৃত্তি হল বাগারম্ভ, বুদ্ধ্যারম্ভ এবং শরীরারম্ভ। ‘আরম্ভ’ অর্থাৎ কর্ম। কাজেই, বাচিক, মানসিক ও শারীরিক কর্মই হল প্রবৃত্তি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সূত্রে কথিত বুদ্ধ্যারম্ভ বলতে মানসিক কর্মই বোঝা যায়; কারণ, ‘বুদ্ধি’ শব্দের দ্বারা এখানে মনকেই গ্রহণ করতে হবে। এই শব্দের মাধ্যমে ‘জ্ঞান’ বোঝা গেলেও ‘বুদ্ধতেঽনেন’ - এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘বুদ্ধি’ শব্দের মন অর্থ হয়ে থাকে।[৫৯] এটিই মহর্ষির বিবক্ষিত।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে যে, ‘প্রবৃত্তি’ বলতে যে বাচিক আদি কর্মকে বোঝানো হয়েছে, সেগুলি কী কী? উত্তরে বলা যায় যে, বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যে দশবিধ শারীরিক, বাচিক ও মানসিক পূণ্যকর্ম ও পাপমূলক কর্মের কথা বলেন, তাই ‘কর্ম’ শব্দের দ্বারা বোদ্ধব্য।[৬০] অর্থাৎ কর্ম বলতে দশপ্রকার পূণ্য বা শুভ কর্ম এবং দশ প্রকার পাপ বা অশুভ কর্ম বোঝা যায়। এই সকল পূণ্য ও পাপ কর্মের সম্বন্ধে দ্বিতীয় ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে আলোচিত হয়েছে।[৬১] এগুলি আলোচনা করা যাক।

শরীরের দ্বারা যে সকল পূণ্যকর্ম হয়, সেগুলি হল - ১) দান, ২) পরিত্রাণ, ৩) পরিচর্যা; বাক্যের দ্বারা কৃত পূণ্যকর্ম হল ৪) সত্যভাষণ, ৫) হিতোপদেশ, ৬) প্রিয়ভাষণ, ৭) স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ; আবার, মনের দ্বারা সম্পাদিত পূণ্যকর্ম হল ৮) দয়া,

[৫৮] ন্যায়সূত্র ১।১।১৭।।

[৫৯] ‘মনোঽত্র বুদ্ধিরিত্যভিপ্রেতম্ বুধ্যতেঽনেনেতি বুদ্ধিঃ।’ - বাৎস্যায়ন, গৌতমীয় ন্যায়দর্শনভাষ্য - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ১৯, পং -১৩ -১৮।

[৬০] ‘সোঽয়মারম্ভঃ শরীরেণ বাচা মনসা চ পূণ্যঃ পাপশ্চ প্রত্যেকং দশবিধঃ।’ - তদেব, পৃ -১৯, পং -১৩ -১৪।

[৬১] ‘দোষৈঃ প্রযুক্ত শরীরেণ প্রবর্তমানো ....সেয়ং ধর্মায়।’ - তদেব, পৃ -৭, পং -২-৬।

৯) নিস্পৃহতা ও ১০) শ্রদ্ধা। এগুলিই হল পূণ্যপ্রবৃত্তি। অপরদিকে, পূণ্যকর্মগুলির বিরুদ্ধ কর্মগুলি হল পাপকর্ম। এই পাপকর্মও দশবিধ, যেহেতু এগুলি দশবিধ পূণ্যকর্মের বিরুদ্ধ। এই পাপকর্মগুলি হল - শরীরের দ্বারা ১) হিংসা, ২) চৌর্য, ৩) নিষিদ্ধ মৈথুন; বাক্যের দ্বারা ৪) মিথ্যাভাষণ, ৫) কটুক্তি, ৬) পরদোষ প্রকাশ, ৭) অসম্বদ্ধ বা প্রলাপ; মনের দ্বারা ৮) পরদ্রোহ, ৯) পরদ্রব্য প্রাপ্তির কামনা ও ১০) নাস্তিকতা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জন্ম, যা দুঃখের অন্যতম কারণ, সেই জন্মের প্রতি উক্ত দশবিধ পূণ্যকর্ম ও দশবিধ পাপকর্ম কারণ হয়ে থাকে। জীবের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার জন্মের প্রতি এই বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি কারণ হয়ে থাকে।[৬২] যখন প্রবৃত্তিকে জন্মের কারণ বলা হয়, তখন 'প্রবৃত্তি' বলতে প্রবৃত্তির ফলই বুঝতে হবে।[৬৩] ধর্ম ও অধর্মই হল প্রবৃত্তির সাক্ষাৎফল। কারণ 'প্রবৃত্তি' বলতে যখন শুভ ও অশুভ কর্মকে অর্থাৎ পূণ্যাত্মক ও পাপাত্মক কর্মকে বোঝানো হয়, তখন সেই কর্ম ক্ষণিক হওয়ায় তা জন্মের কারণ হতে পারে না। তবে, 'ক্ষণিক' বলতে এখানে বৌদ্ধসম্মত একক্ষণমাত্র স্থায়িত্বকে বোঝানো হয়নি। বৌদ্ধ মতে, বস্তু মাত্রই স্থায়ী এবং পরক্ষণেই বিনাশী। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তা স্বীকার করান না। ন্যায় মতে, কর্মকে ক্ষণিক বলার অর্থ হল কর্মের শীঘ্র বিনাশিত্ব। কর্ম থেকে যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগই কর্মের বিনাশ ঘটায়। প্রথমক্ষণে কর্ম উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে কর্মের আশ্রয়ীভূত দ্রব্যের দ্রব্যান্তর থেকে বিভাগ হয়, তৃতীয়ক্ষণে পূর্বসংযোগ নাশ হয়, চতুর্থক্ষণে উত্তর সংযোগ হয় এবং পঞ্চমক্ষণে কর্মের নাশ হয়। অর্থাৎ কর্ম থেকে যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগের দ্বারাই কর্মটি বিনষ্ট হয় - এটি নিয়ম হওয়ায় কর্ম থেকে যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তা চতুর্থক্ষণে উৎপন্ন হয় বলে চতুর্থক্ষণ পর্যন্তই কর্ম থাকে, পঞ্চমক্ষণে তা বিনষ্ট হয়। এজন্যই কর্মের বিশেষ গুণ হল

[৬২] 'সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্যাভিপূজিতস্য চ জন্মনঃ কারণং।' - তদেব, পৃ - ৭, পং - ৮।

[৬৩] 'প্রবৃত্তিফলে প্রবৃত্ত্যুপচারাৎ।' - তদেব, পৃ - ৭৮, পং - ১০।

ক্ষণিকত্ব।[৬৪] তাই ‘প্রবৃত্তি’কে কর্ম অর্থে গ্রহণ ক’রে তাকে জন্মের কারণ বলা সম্ভব নয়। ধর্মাধর্মরূপ লাক্ষণিক অর্থে (অর্থাৎ মুখ্য অর্থে নয়, গৌণ অর্থে) ‘প্রবৃত্তি’ শব্দের ব্যবহার হলেই প্রবৃত্তিকে জন্মের কারণ বলা সম্ভব হয়। ধর্মাধর্ম ক্ষণিক নয়, তা হল গুণ পদার্থ, যা আত্মা নামক দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। বস্তু ধর্মাধর্ম আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আত্মাই ধর্মাধর্মের সমবায়ী কারণ। শরীর সৃষ্টি বা জন্মের কারণ যে ভূতবর্গ, ধর্মাধর্ম ঐ ভূতবর্গের প্রযোজক হয়ে থাকে। এই কারণে ১।১।২ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন প্রবৃত্তিকে ধর্মাধর্মরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ধর্মাধর্মরূপে প্রবৃত্তি কীভাবে ভূতবর্গের প্রযোজক হয়? যদিও নাস্তিক দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে, শরীর সৃষ্টি ক্ষিত্যাদি ভূতজন্য, কিন্তু আস্তিক দার্শনিকগণের মতে, ভোগের সাধন শরীরের উৎপত্তি মাত্র ভূতজন্য নয়। তাঁরা কর্মফলবাদী; তাঁরা অদৃষ্ট স্বীকার করেন। সুখ ও দুঃখের জনক ধর্ম ও অধর্ম নামক গুণবিশেষই অদৃষ্ট। আস্তিকগণ মনে করেন, শরীরের উৎপত্ততে ভূতবর্গের প্রযোজকরূপে অদৃষ্টকে স্বীকার করতেই হয়। মহর্ষি গৌতমও এই তাৎপর্যেই বলেছেন, পূর্বজন্মে পরিগৃহীত শরীরে যে সকল শুভ ও অশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই শুভ কর্ম ও অশুভ কর্মজন্য যে ধর্মাধর্ম (কর্মফল), তাই শরীর সৃষ্টির কারণ।[৬৫] এই ধর্মাধর্মরূপ কর্মফল, যাকে অদৃষ্ট বলা হয়েছে, তা আত্মার গুণ; অর্থাৎ অদৃষ্ট আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই অদৃষ্টই শরীর সৃষ্টিতে ভূতবর্গের প্রযোজক হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব শরীরের নাশ হলেও আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান ঐ অদৃষ্ট পরবর্তী জীবনের শরীর সৃষ্টিতে সাহায্য

---

[৬৪] প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথমভাগ), শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ ও দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ - ২৪৩।

[৬৫] ‘পূর্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ।।’ - ন্যায়সূত্র ৩।২।৬০।।

করে এবং ভোগের অধিষ্ঠানরূপে সেই শরীরের মাধ্যমেই ঐ অভিন্ন আত্মারই পূর্বজন্মকৃত কর্মজন্য অর্থাৎ প্রবৃত্তিজন্য যে ধর্মাধর্ম বা অদৃষ্ট, তার ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদির ভোগ হয়ে থাকে।

আবার, অদৃষ্ট শুধুমাত্র ভুতবর্গের প্রযোজক হয়ে শরীর উৎপত্তির কারণ হয় না, কোন্ আত্মা কোন্ বিশেষ শরীর পরিগ্রহ করবে, তারও নির্ধারক হয়ে থাকে। 'শরীরোৎপত্তিনিমিত্তৰৎ সংযোগোৎপত্তিনিমিত্তং কর্ম।।'[৬৬] অন্যভাষায় বলা যায় যে, আত্মাবিশেষের সাথে শরীরবিশেষের সংযোগবিশেষ উৎপত্তির কারণ হল অদৃষ্ট। এরূপ স্বীকার করলেই বলা যায় যে, পূর্বজন্মের কর্মফল বা অদৃষ্ট পরবর্তী জন্মে বিশেষ শরীর সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মা-বিশেষের সুখ-দুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থাপক হয়ে থাকে। এরূপ স্বীকার না করলে সমস্ত শরীরেই সমস্ত আত্মার সমানভাবে সুখ-দুঃখাদির ভোগ হতে পারত। অর্থাৎ সব শরীরেই সব আত্মার সমান সংযোগ থাকত এবং ফলতঃ 'এটি আমার শরীর , অন্যের নয়' - এরূপ ব্যবস্থা বা নিয়ম উপপন্ন হত না। তা ছাড়া, শরীর যে অদৃষ্টজন্য, তার সমর্থনে যুক্তি হল - শরীরের ভেদ। অর্থাৎ কারোর উচ্চ কুলে জন্ম, কারোর নীচ কুলে জন্ম, কারোর শরীর স্ফীত, করোর বা নিন্দিত, কারোর আবার শরীর জন্ম থেকেই রোগবহুল, কেউ আবার রোগশূন্য, কেউ সম্পূর্ণাঙ্গ, কেউ অঙ্গহীন, কেউ দুঃখবহুল, কেউ আবার সুখবহুল। অর্থাৎ জীবের এই শরীরভেদের প্রতি কারণ হল আত্মার অদৃষ্টভেদ।[৬৭] সুতরাং, বিশেষ আত্মার শরীরবিশেষ ধারণ অদৃষ্টজন্য।

তা ছাড়া, শরীরকে অদৃষ্টজন্য বললেই অদৃষ্টের বিনাশবশতঃ শরীরের সাথে আত্মার আত্যন্তিক বিয়োগ অর্থাৎ আত্মার মোক্ষ হতে পারে। অর্থাৎ অদৃষ্টই হল পুনর্জন্মের বা সংসারের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানজন্য আত্মার মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে ঐ মিথ্যাজ্ঞানমূলক রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়

---

[৬৬] ন্যায়সূত্র ৩।২।৬৬।।

[৬৭] 'সোঽয়ং জন্মভেদঃ প্রত্যাত্মনিয়তাৎ কর্মভেদাদুপপদ্যতে।' - বাৎস্যায়ন, গৌতমীয় ন্যায়দর্শনভাষ্য - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ২১৩, পং-১৭ -১৮।

না। সুতরাং, প্রবৃত্তি রাগ ও দ্বেষমূলক। ফলতঃ রাগ ও দ্বেষের অভাবে আত্মার পুনর্জন্মের জনক প্রবৃত্তি হয় না; প্রবৃত্তির অভাবে প্রবৃত্তির ফলস্বরূপ অদৃষ্টের সঞ্চয় হয় না। এইরূপে সঞ্চিত অদৃষ্টের অভাবে পুনর্জন্মের কারণেরই অভাব ঘটে; ফলতঃ পুনর্জন্মের অভাবে ঐ আত্মার অন্য শরীর পরিগ্রহ সম্ভব হয় না। এর ফলস্বরূপ ঐ আত্মার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা অপবর্গের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কিন্তু শরীর অদৃষ্ট নিরপেক্ষ মাত্রভূতবর্গজন্য হলে ঐ ভূতবর্গের আত্যন্তিক বিনাশ কখনই সম্ভব হয় না। কাজেই, অদৃষ্ট, যা কর্মরূপ প্রবৃত্তিজন্য, তার নিবৃত্তিই আত্মার মোক্ষের কারণ।[৬৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রবৃত্তি রাগ ও দ্বেষমূলক। রাগ ও দ্বেষ হল দোষের অন্যতম দু'টি প্রকার। দোষ হল মহর্ষি কথিত অষ্টম প্রমেয় পদার্থ। মহর্ষি দোষকেই প্রবৃত্তির জনকরূপে গণ্য করেছেন।[৬৯] রাগ, দ্বেষ ও মোহ - এই ত্রিবিধ হল দোষ। এই ত্রিবিধ দোষ আত্মাকে পূণ্য বা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে।[৭০] মোহই ত্রিবিধ দোষের মধ্যে প্রধান। মোহ হল মিথ্যাজ্ঞান। যে আত্মাতে মিথ্যাজ্ঞান জন্মায়, সেই আত্মাতেই বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ জন্মায়।[৭১] মোহশূন্য ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ জন্মায় না। কোন ব্যক্তি সুখজনক বা দুঃখজনক কর্মে প্রবৃত্ত হলে, সেই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম থেকেই অনুমিত হয় যে, সেই ব্যক্তি আরক্ত, দ্বিষ্ট ও মূঢ়।

কাজেই, দোষ থেকে সকল কর্মরূপ প্রবৃত্তি জন্মায়; সেই সকল প্রবৃত্তি আবার ধর্মাধর্মরূপ প্রবৃত্তির জনক হয়ে থাকে। এই ধর্মাধর্মবশতঃ জীবাত্মা নানাবিধ জন্মলাভ করে এবং জন্মবশতঃ নানাবিধ দুঃখভোগ করে। সুতরাং, মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান এবং সব দুঃখের মূল। কাজেই,

---

[৬৮] 'উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্মক্ষয়োপপত্তেঃ। কর্মনিমিত্তে শরীরসর্গে তেন শরীতেণাত্মনো ৰিয়োগ উপপন্নঃ।...... এবং পুনর্থহেতোরভাৰাৎ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে পুনঃ শরীরান্তরানুপপত্তেরপ্রতিসন্ধিঃ।' - তদেব; পৃ - ২১৪, পং- ১-৫।

[৬৯] 'প্রৰর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ।।' - ন্যায়সূত্র ১।১।১৮।

[৭০] 'জ্ঞাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রৰর্ত্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে ৰা।' - ১।১।১৮ ন্যায়সূত্র ভাষ্য

[৭১] 'যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাৰিতি।' - ১।১।১৮ ন্যায়সূত্রভাষ্য

দুঃখবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দূরীভুত হয় দুঃখবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা। দুঃখবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান হল এই যে, জীবাত্মা দুঃখকেও সুখ বলে বোঝে। আর, দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হল এই যে, প্রকৃত সুখও দুঃখানুসক্ত হওয়ায় তা দুঃখই। কিন্তু দুঃখ সম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নেই। তবে দুঃখের উক্ত প্রকৃতস্বরূপ মুমুক্ষু বুঝলেও তার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান - এদের পরম্পরায় নিবৃত্তি হলেই অপবর্গ লাভ হয়। দুঃখাদি পাঁচটি তত্ত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবর্তমান হয়ে জীবের সংসার গঠন করে। দুঃখাদির পরস্পরের মধ্যে কার্যকারণভাবই হল সংসার। এই কার্যকারণভাব অনাদি। এদের মধ্যে কোন পূর্বাপর ভেদ নেই। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ - এগুলি যেমন একদিকে মিথ্যাজ্ঞানপূর্বক, তেমনই অন্যদিকে মিথ্যাজ্ঞান আবার দুঃখাদিপূর্বক।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি পুরুষার্থ পদবাচ্য কি না - এ বিষয়ে পূর্বপক্ষ ও ন্যায়মত ঃ

মানুষ সুখের জন্য লালয়িত এবং দুঃখকে পরিহার করার জন্য সর্বতোভাবে যত্নশীল। শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ব্যক্তিভেদে সুখের চরিত্রের যেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি দুঃখও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সে যাই হোক, সুখ বলতে যে যা বোঝে, তার জন্য অন্বেষণ ও তা লাভের চেষ্টা এবং দুঃখ বলতে যে যাকে বোঝে, তার পরিহারের চেষ্টাই হল জীবন। এক ব্যক্তির লক্ষ্য পদার্থ অন্যের প্রার্থনীয় হোক বা না হোক, নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলই হল জগৎ। কাজেই, জগতের প্রতিটি জীবেরই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ হল সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার। এখন, সুখ প্রাপ্তি হোক বা না হোক, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা যায় কিনা - এই বিষয়টি বিতর্কিত। পূর্বপক্ষী মনে করেন যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির

ফলে যদিও অনভিপ্রেত দুঃখের সম্যক্ পরিহার সম্ভব হয়, তাহলেও তার ফলে সকল প্রকার সুখের পরিহারও আবশ্যক হয়। কাজেই, এরূপ হলে আয়-ব্যয় তুল্য হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হতে পারেনা। অনভিপ্রেত দুঃখের পরিহার হল আয়; অপরদিকে, সর্ববিধ সুখের পরিহার হল ব্যয়। বস্তুতঃ দুঃখ বা সুখ উভয়েরই উৎপত্তিতে জন্মের অপেক্ষা থাকে। শরীরাবচ্ছেদেই দুঃখ ও সুখের ভোগ সম্ভব হয়। এখন যেহেতু আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, সেহেতু যিনি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কামনা করেন, তাঁকে অবশ্যই সুখকামনাও পরিত্যাগ করতে। কাজেই, পূর্বপক্ষীর মতে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিতে জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় সুখের পরিহারও যেহেতু অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সেহেতু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলে গণ্য করা সমীচীন নয়।

এরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে অন্ন অত্যন্ত কাম্য বিষয়। তবে, অন্ন কাম্য হলেও তা যদি বিষ মিশ্রিত হয় তখন সেই কাম্য বিষয়টি অকাম্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ ভোজ্যদ্রব্য বা অন্ন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে গ্রাহ্য হলেও বিষমিশ্রণে সেই ভোজ্যদ্রব্য বা অন্ন পরিত্যাজ্য হয়। কারণ, অন্ন গ্রহণে সুখ প্রাপ্তি হয়; শুধু তাই নয়, হিত প্রাপ্তির প্রতি প্রবৃত্ত হওয়াই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। তবে, বিষমিশ্রিত অন্নের প্রতি জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, অহিত পরিহারও জীবের ধর্ম। অর্থাৎ বিষমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করলে তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও ঐ বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির দ্বেষ জন্মায়; কারণ তা গ্রহণ করলে হিতের তুলনায় বেশী মাত্রায় অহিত উৎপন্ন হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনও পদার্থকে ভালরূপে জানলে অর্থাৎ কোন পদার্থ ইষ্ট - এইরূপ জ্ঞান হলে (ইষ্টজ্ঞান উপাদানবুদ্ধির সমার্থক), সেই পদার্থের প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা হয়; সেই ইচ্ছা থেকে ঐ পদার্থে প্রবৃত্তি জন্মায়; ঐ প্রবৃত্তি থেকে ঐ পদার্থের প্রাপ্তি হয়। অপরদিকে, কোন পদার্থকে অনিষ্টকররূপে জানলে সেই পদার্থে দ্বেষজ্ঞান

হয়। অর্থাৎ, যা অনিষ্টসাধন বা বলবদ্-দ্বিষ্টসাধন, সেই পদার্থের প্রতি মানুষের দ্বেষ হয়। কিন্তু মাত্র অনিষ্টের সাধন হলেই কোন বস্তুর প্রতি দ্বেষ হয় না; বরং 'এটি অনিষ্টের সাধন' - এই প্রকার দ্বিষ্টসাধনতা বা অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান (দ্বিষ্টজ্ঞান হানবুদ্ধির সমার্থক) হলেই সেই বস্তুর প্রতি দ্বেষ হয়। কাজেই, জ্ঞানের বিষয় ও দ্বেষের বিষয় অভিন্ন পদার্থই হয়ে থাকে। এই দ্বেষ হল দ্বেষজ্ঞানের বিষয় এবং দ্বেষজ্ঞান হলেই তা থেকে কোন পদার্থে নিবৃত্তি জন্মায়। সুখ ও দুঃখাভাব, এবং সুখসাধন ও দুঃখাভাবসাধন - এই দ্বিবিধ বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা উৎপন্ন হলেও উক্ত দ্বিবিধ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয়ে থাকে - একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ, সুখ বা দুঃখাভাবরূপ ফলের ইচ্ছা হলে সেই সুখ বা দুঃখাভাব প্রাপ্তির জন্য যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির লক্ষ্য সুখ বা দুঃখাভাব; কিন্তু ঐ প্রবৃত্তির বিষয় সুখ বা দুঃখাভাব কখনই হয় না। প্রবৃত্তি মাত্রই সাধন বা উপায় বিষয়ক হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনে কর্মভেদে ইচ্ছার নানা নাম হয়। যখন ইচ্ছাকে প্রবৃত্তির হেতু বলা হয়, তখন সেই ইচ্ছাকে চিকীর্ষা বলে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির মূলে যে ইচ্ছা, তার নাম চিকীর্ষা। চিকীর্ষা হল উপায়বিষয়িণী ইচ্ছা। অর্থাৎ উপায়বিষয়িণী ইচ্ছাই প্রবৃত্তির মূল। কৃতিসাধ্যত্ব প্রকারিকা এবং কৃতিসাধ্যবিষয়িণী ইচ্ছাই চিকীর্ষা।[৭২] 'এটি আমার চেষ্টাসাধ্য' - এরূপ জ্ঞানই কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান; ' আমি চেষ্টার দ্বারা পাক সম্পাদন করব' - এইরূপ ইচ্ছাই চিকীর্ষা; কারণ, এক্ষেত্রে পাক, যা আমার কৃতিসাধ্য, তা বিষয়রূপে, এবং কৃতিসাধ্যতা প্রকাররূপে প্রতীয়মান হয়েছে। অএতব, কৃতিসাধ্যতা চিকীর্ষার প্রতি হেতু। যে বস্তু কৃতিসাধ্য নয়, তাতে চিকীর্ষা হয় না। যেমন - চন্দ্রমণ্ডল আনার কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান না থাকায়

---

৭২ 'কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারিকা কৃতিসাধ্যবিষয়িণী চিকীর্ষা।' - বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাসহ) - শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ১৪৭ সংখ্যক কারিকার মুক্তাবলী, পৃ - ৫৫৫।

এই বিষয়েও চিকীর্ষা হয় না। অথবা বৃষ্টিতে আমাদের কৃতিসাধ্যতা না থাকায়, অর্থাৎ 'বৃষ্টি আমার চেষ্টাসাধ্য' - এইরূপ জ্ঞান না থাকায় 'আমি বৃষ্টি করব' - এই প্রকার চিকীর্ষা হয় না। সুতরাং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান চিকীর্ষার কারণ। তবে মাত্র কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান চিকীর্ষার কারণ নয়; ন্যায় মতানুসারে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও চিকীর্ষার কারণ। 'এটি আমার ইষ্টের সাধন' অথবা 'এটি আমার অভিপ্রেত ফলের সাধন' - এইরূপ জ্ঞানই ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। এই ইষ্টসাধনতাজ্ঞানবশতঃ ভোজনের চিকীর্ষা হয়। যে কালে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকে না, সেই কালে কর্ম করার ইচ্ছাও জন্মায় না। অর্থাৎ যে কালে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাব থাকে, সেই কালে চিকীর্ষাও উৎপন্ন হয় না। যেমন - ভোজন ইষ্ট হলেও ভোজনের পর পাক করার চিকীর্ষা জন্মায় না; কারণ, ভোজনের পূর্বে ভোজন ইষ্ট হলেও ভোজনের পরে ভোজন ইষ্ট হয় না; ফলতঃ সেই কালে পাকে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও থাকে না। তবে, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে চিকীর্ষার প্রতি হেতু হয় না। বরং তারা যুগপৎ চিকীর্ষার প্রতি হেতু হয়ে থাকে।[৭৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বৃষ্টিতে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকলেও কৃতিসাধ্যনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ 'আমি বৃষ্টি করব' - এইরূপ চিকীর্ষা হয় না। অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতার অভাববিশিষ্ট ইষ্টসাধনতাজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি হেতু হয় না। আবার মাত্র কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি হেতু নয়। এই কারণেই ভোজনের পর পাক করার চিকীর্ষা হয় না। ভোজনের পর পাক কৃতিসাধ্য হলেও তা ইষ্টসাধন নয়।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যদি যুগপৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি হেতু হয়, তাহলে মধু-বিষ-মিশ্রিত অন্নভোজনে আমাদের চিকীর্ষা জন্মায় না কেন? যে অন্নে মধু ও বিষ - উভয়ই মিশ্রিত, সেই অন্নগ্রহণ কৃতিসাধ্য এবং ঐ অন্নগ্রহণের ফলে তৃপ্তিরূপ ইষ্টও সাধিত হবে। তবুও এই প্রকার অন্নভোজনে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির চিকীর্ষা জন্মায় না। এর কারণস্বরূপ

---

৭৩ 'চিকীর্ষাং প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানমিষ্টসাধনতাজ্ঞানঞ্চ কারণম্।' - তদেব।

বলা যায় যে, বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাববিশিষ্ট যুগপৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতি হেতু হয়ে থাকে। মধুযুক্ত অন্নে বিষ মিশ্রণের ফলে এই অন্নগ্রহণে মৃত্যুরূপ বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকায় ঐ অন্নগ্রহণে চিকীর্ষা হয় না। সুতরাং, বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে।[৭৪] বস্তুতঃ যেকোন বিষয় প্রাপ্তির জন্যই কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হয়। কিন্তু সেই কষ্ট যদি সেই বিষয়ের দ্বারা প্রাপ্তসুখের তুলনায় অধিক হয়, অথবা বিষয়টি যদি প্রাপ্ত ইষ্ট ফলের থেকে অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে, তা হলে বিষয় বা বস্তুটিকে বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধন বা বলবদ্-অনিষ্টসাধন বলা হয়ে থাকে। ইষ্ট কর্মসাধন করতে হলে যে কষ্ট বা দুঃখ হয়, তাকে নান্তরীয়ক দুঃখ বা আন্তরালিক দুঃখ বলে। যে বস্তু এই নান্তরীয়ক দুঃখের অধিক দুঃখের জনক হয়, সেই বস্তুতে বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতা আছে বলতে হয়। আর, কোন বস্তু নান্তরীয়ক দুঃখাধিক দুঃখের জনক - এইপ্রকার জ্ঞানই হল ঐ বস্তুতে বলবদ্‌দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান বা বলবদ্-অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান। কাজেই উক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইষ্ট বা কাম্য বিষয় ব্যক্তিতে সুখের উৎপত্তি ঘটালেও সেই সুখ নিরবচ্ছিন্ন সুখ নয়। সুখদায়ক বস্তুর প্রাপ্তিতেও কিছু না কিছু দুঃখ প্রাপ্তি অনিবার্য। এই কারণে বিবেকীপুরুষের কাছে সুখ পরিহার্য বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে; কারণ সকল ক্ষেত্রেই সুখের সাথে নানা প্রকার দুঃখ জড়িত থাকে। কাজেই, যে ব্যক্তি দুঃখ পরিহারে ইচ্ছুক, সেই দুঃখপরিহারার্থী সুখকেও হেয় পক্ষেই নিক্ষেপ করবেন।

এখানে পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করে বলতে পারেন, সুখ স্বতঃপুরুষার্থ হওয়ায় সুখ কখনো হেয় হতে পারে না। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে স্বতঃপুরুষার্থ সুখের বর্জন

---

[৭৪] 'ৰলৰদ্-দ্বিষ্টসাধনতা-জ্ঞানং তত্র প্রতিৰন্ধকম্। অতো মধুৰিষ-সম্পৃক্তান্ন-ভোজনে ন চিকীর্ষা।' - তদেব, ১৪৮ সংখ্যক কারিকার মুক্তাবলী, পৃ - ৫৫৬।

অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি পুরুষার্থ হতে পারে না। যা অন্যনিরপেক্ষভাবে বা প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষা ছাড়াই কামনার বিষয় হয়, তাই স্বতঃপুরুষার্থ। সুখ স্বতঃই অন্যনিরপেক্ষভাবে কাম্য হওয়ায় সুখে স্বতঃপুরুষার্থত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায় সুখ কখনই পরিত্যাজ্য হতে পারে না। দুঃখবিযুক্ত বলে সুখ গ্রহণীয় - এইরূপ শর্তসাপেক্ষে সুখকে গ্রহণীয় বলে মনে করলে সুখের স্বাভাবিক পুরুষার্থত্ব ব্যাহত হয়। কাজেই, দুঃখ হেয় হলেও সুখ হেয় হতে পারে না।

তবে সিদ্ধান্তী নৈয়ায়িক মনে করেন যে, সুখ অন্যনিরপেক্ষভাবে কাম্য হওয়ায় যে শুধুমাত্র সুখেই স্বতঃপুরুষার্থত্ব প্রসিদ্ধ আছে তা নয়; বরং দুঃখ পরিহারও প্রয়োজনান্তরের দ্বারা কাম্য বা ইচ্ছার বিষয় হওয়ায় সেটিও স্বতঃপুরুষার্থ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ দুঃখভীরু ব্যক্তিগণ অন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকেই দুঃখ পরিহার করতে যত্নবান হয়ে থাকেন। তবে, দুঃখের বিগমে সুখপ্রাপ্তি হবে - এইরূপ শর্তসাপেক্ষে দুঃখ পরিহার্য - এইরূপ বলা যাবে না; অথবা সুখের নিমিত্তই দুঃখের উচ্ছেদ প্রাপ্তব্য, স্বতঃ নয় - এইরূপ উপাধিযুক্তভাবে দুঃখের উচ্ছেদ আবশ্যক - এমনও বলা সঙ্গত নয়। বরং এমন কথাই বলা যায় যে, বিবেকীপুরুষগণ সুখের জন্য দুঃখের পরিহারে প্রবৃত্ত হন না; দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বতঃপুরুষার্থ বলেই সুখের পরিহার অবশ্যম্ভাবী জেনেও বিবেকী ব্যক্তি দুঃখ পরিহারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন।

এখন আমরা জানি যে, পুরুষার্থ মাত্রই প্রযত্নসাধ্য হয়ে থাকে। তাই পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, দুঃখের উচ্ছেদ প্রযত্নসাধ্য না হওয়ায় তা পুরুষার্থ পদবাচ্য হতে পারে না। দুঃখের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞান ত্রিবিধ; যথা, অতীত মিথ্যাজ্ঞান, যা অতীত দুঃখের জনক; বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান, যা বর্তমান দুঃখের জনক এবং আগামী মিথ্যাজ্ঞান, যা আগামী দুঃখের জনক। এই ত্রিবিধ মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অতীত ও বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ পুরুষের প্রযত্নসাধ্য নয়।

কারণ অতীত মিথ্যাজ্ঞান অতীত দুঃখকে উৎপন্ন করে অতীত দুঃখের সাথেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ ত্রিবিধ মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অতীত মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করার জন্য কোন পুরুষব্যাপার আবশ্যক নয়। কারণ তা অতীত দুঃখকে উৎপন্ন করে স্বকার্যের সাথে পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই, অতীত মিথ্যাজ্ঞান অতীত হওয়ায় নিবৃত্তিযোগ্য নয়। আবার, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান বর্তমান দুঃখের জনক। বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানও বর্তমান দুঃখের সাথেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ মিথ্যাজ্ঞান ও দুঃখ উভয়েই ক্ষণিক। তবে, অতীত ও বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করার জন্য পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা না থাকলেও আগামী দুঃখের জনক আগামী মিথ্যাজ্ঞান, তার বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে পুরুষ প্রযত্নের অপেক্ষা থাকে। কিন্তু যে আগামী মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তত্ত্বজ্ঞান বর্তমানে উৎপন্ন হচ্ছে, তার ফলে আগামী মিথ্যাজ্ঞানটি আর কখনো উৎপন্ন হবে না। এইপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান কোন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় নিষ্প্রমাণ। বস্তুতঃ অনাগত কোনকিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারি না। যা অতীতে ঘটেছে বা বর্তমানে ঘটছে তা প্রমাণসাপেক্ষ হলেও ভবিষ্যতে কোন কিছু ঘটবেই - এইরূপ কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। অতীতে একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী কবি ছিলেন - এটি প্রমাণিত; অথবা বর্তমানে একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী কবি আছেন - এটিও প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতে একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি বাংলায় জন্মগ্রহণ করবেন - এই কথার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং, ত্রিবিধ মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অতীত মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করার জন্য কোন পুরুষপ্রযত্ন আবশ্যক নয়। আবার, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান বর্তমান দুঃখের জনক। বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানের জন্য যে ফলভোগের সূচনা হয়ে গেছে, তার নিবৃত্তি কোন পুরুষপ্রযত্নসাধ্য নয়।

এখানে মনে হতে পারে যে, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ পুরুষব্যাপার সাপেক্ষ; কারণ, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান বর্তমানে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হলে তজ্জন্য যে ভোগ, তারও

অবসান হবে। কিন্তু একথা যথার্থ নয়। ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদের রহস্য যে ব্যক্তির কাছে অজানা, সেই ব্যক্তিই উক্তরূপ কথা বলতে পারেন। কিন্তু কর্মবাদের রহস্যের জ্ঞান যাঁর আছে, তাঁর কাছে এইরূপ বক্তব্যের কোন অর্থই হয় না। কর্মবাদ অনুসারে, কর্মমাত্রই ফলপ্রদায়িনী। ভাল কর্মের ফল ভাল, আর মন্দ কর্মের ফল মন্দ। কর্মের বীজ থেকে কর্মফল অঙ্কুরিত হবেই। শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি যে ধরনের বীজ বপন করবেন, তিনি সেই প্রকার অঙ্কুরের জন্ম দেবেন। কর্মবাদের মূলকথাই হল - 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলবাদ হল নৈতিকতার জগতে কার্যকারণ নিয়ম। যদিও কর্ম-কর্মফলবাদ সকল ভারতীয় দার্শনিকের স্বীকৃত নয়, তবুও এই মতবাদকে ভিত্তি করে অপর যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, তা হল জন্মান্তরবাদ, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূণ্যকর্মের দ্বারা শুভফল লাভ হয়, এবং পাপ কর্মের দ্বারা অশুভ ফললাভ হয় - এই কথার সপক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ থাকলেও পূণ্যকর্মের অব্যবহিত পরেই শুভ ফলপ্রাপ্তি ঘটবে, অথবা পাপ কর্মের পরক্ষণেই অশুভ ফলপ্রাপ্তি হবে - এটি অনুভববিরুদ্ধ। এটিই কর্মবাদের রহস্য। তা ছাড়া, জীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সম্পাদিত কর্মের ফলভোগের জন্য পরবর্তী জন্মকে স্বীকার করতেই হয়। যাই হোক, কর্মবাদের আলোচনায় দ্বিবিধ কর্মের উল্লেখ করা হয়; যথা - আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম এবং অনারব্ধ কর্ম। যে কর্ম ফলপ্রদান করা শুরু করেছে, তা হল প্রারব্ধ কর্ম। অপরদিকে, যে কর্ম এখনও ফলপ্রদান করা শুরু করেনি, তাহল অনারব্ধ কর্ম। এই অনারব্ধ কর্ম আবার সঞ্চিত কর্ম ও সঞ্চীয়মান বা ক্রিয়মান কর্ম ভেদে দ্বিবিধ। পূর্বজীবনের যে কর্ম ফল প্রদান শুরু করেনি, তা হল সঞ্চিত কর্ম। আর, বর্তমান জীবনের যে কর্ম এখনও ফল দেওয়া শুরু করেনি, তা হল সঞ্চীয়মান কর্ম। কোন কোন দার্শনিকগণ, যেমন মীমাংসকগণ মনে করেন, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সম্পাদনের মাধ্যমে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান - উভয়প্রকার অনারব্ধ কর্মের ক্ষয় সম্ভব হয়। যে কর্ম প্রত্যহ বা নিত্য করণীয়, তা নিত্যকর্ম।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নির্মল সলিলে স্নান, প্রাতঃকালীন বন্দনা, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি হল নিত্যকর্ম। আর, যে কর্ম বিশেষ উপলক্ষ্যে করণীয়, তা নৈমিত্তিক কর্ম। অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলা যায় যে, কোন ঘটনা ঘটার নিমিত্ত যে কর্ম করণীয়, তা হল নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন, পুত্রাদি জন্মের ফলে জাতকর্ম, আত্মীয়বিয়োগের জন্য শ্রাদ্ধকর্ম, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান ইত্যাদি নৈমিত্তিক কর্ম। যদিও এখানে উল্লখ্য যে, নিত্যকর্ম বিষয়ে ভাট্ট ও প্রাভাকর মীমাংসকগণ একমত হতে পারেননি।[৭৫] ভাট্টমীমাংসকগণ নিত্যকর্মকে ফলমুখী বলে স্বীকার করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, নিত্যকর্ম সম্পাদনের ফলে অতীতের পাপ ক্ষয় হয়; যাকে দুরিত ক্ষয় বলে। আবার, নিত্যকর্মের অসম্পাদনের জন্য যে প্রত্যবায় হওয়ার কথা, নিত্যকর্মের সম্পাদনে সেই প্রত্যবায় থেকে মুক্ত থাকা যায়। কিন্তু প্রাভাকর মতে, নিত্যকর্ম উদ্দেশ্য বা ফলমুখী নয়। অর্থাৎ নিত্যকর্ম কর্তব্যজ্ঞানেই সম্পাদন করা উচিৎ। তা কোনপ্রকার ফলপ্রাপ্তির উপায় নয়; বরং তা লক্ষ্যরূপেই প্রাভাকর মতে বিবেচিত। কাজেই 'কর্তব্য বলে কর্তব্য' - এই আদর্শই প্রাভাকর কথিত নিত্যকর্মের ধারণার মধ্যে ফুটে উঠেছে, যা ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শের থেকেও কঠোর[৭৬]; কারণ গীতা অনুসারে, চিত্তশুদ্ধি, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসাধন প্রভৃতি কিছু উদ্দেশ্য নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। কিন্তু প্রাভাকর মতে, নিত্যকর্মের সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তব্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। আবার, পাশ্চাত্য জার্মান দার্শনিক কান্ট কথিত নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (categorical imperative)-র সাথে প্রাভাকর সম্মত নিত্যকর্মের ধারণার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৭৭] যে অনুজ্ঞায় কোন কর্মকে ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে আবশ্যিকভাবে

---

[৭৫] এম.হিরিয়ন্না, আউটলাইনস্ অফ্ ইন্ডিয়ান্ ফিলসফি, মোতিলাল বানারসীদাস, দিল্লী, ২০০৯, পৃ- ৩৩০।

[৭৬] তদেব।

[৭৭] তদেব, পৃ - ৩৩১।

করণীয় বলা হয়, সেই অনুজ্ঞাকে কান্ট শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞা (hypothetical imperative) বলেন। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই আমরা শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞা পালন করি। এই শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞার সাথে ভাট্টসম্মত নিত্যকর্মের ধারণাটি তুলনীয়। এক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যটিই অনুজ্ঞার শর্ত। উদাহরণস্বরূপ, 'যদি তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে চাও, তাহলে তোমার ভালোভাবে লেখাপড়া করা উচিৎ' - এক্ষেত্রে অনুজ্ঞাটি হল 'ভালোভাবে লেখাপড়া করা উচিৎ' এবং এই অনুজ্ঞার শর্তটি হল 'পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে চাওয়া'। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে চায় না, তার কাছে এই অনুজ্ঞা মূল্যহীন। কিন্তু, নৈতিক দায়বদ্ধতা কান্টের মতে নিঃশর্ত; কারণ, এই দায়বদ্ধতা ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাথে যুক্ত নয়। এই অনুজ্ঞার সঙ্গে কোন শর্ত যুক্ত থাকে না বলে এই অনুজ্ঞা বা আদেশ হল শর্তনিরপেক্ষ বা নিঃশর্ত অনুজ্ঞা। কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রসঙ্গ এখানে নেই।

যাই হোক, নিত্যকর্ম ফলমুখী কি না - এই বিষয়টি বিতর্কিত হলেও অনারব্ধ কর্মের ক্ষয় যে সম্ভব - এই বিষয়ে সবাই একমত। তবে, প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় সম্ভব নয়; তার ফলভোগ আনিবার্য। সুতরাং, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান, যা বর্তমান দুঃখের জনক, তার ফলপ্রদান শুরু হয়ে গেছে এবং তার ভোগ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান বর্তমান দুঃখের সাথেই বিনষ্ট হয়ে যাবে; তা বিনাশের জন্য কোন পুরুষপ্রযত্ন আবশ্যক নয়। তবে, পূর্বপক্ষীর মতে, ভাবী মিথ্যাজ্ঞান নিষ্প্রমাণ হওয়ায় সেই ভাবী মিথ্যাজ্ঞানকে উচ্ছেদের জন্য সেই মিথ্যাজ্ঞান বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য পুরুষব্যাপার স্বীকৃত হতে পারে না। অতএব, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি প্রযত্নসাধ্য না হওয়ায় তা পুরুষার্থরূপে বিবেচিত হতে পারে না।

তবে, পূর্বপক্ষীর এরূপ আপত্তি টেকে না। প্রকাশকার[৭৮] প্রকাশটীকায় বলেছেন যে, চরম দুঃখের উচ্ছেদ করে যে তত্ত্বজ্ঞান, তার উৎপত্তি পুরুষপ্রযত্নসাধ্য হওয়ায় চরম দুঃখের উচ্ছেদরূপ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি পুরুষার্থ বলেই পরিগণিত হবে। সিদ্ধান্তী প্রকাশকার মনে করেছেন, ভাবী মিথ্যাজ্ঞান যে ভাবী দুঃখের জনক, বর্তমানে সেই ভাবী চরম দুঃখটি ভবিষ্যতের গর্ভে লীন হয়ে আছে; তবে তার বর্তমান অভাব একথা প্রমাণ করেনা যে, তা অলীক। দুঃখ মাত্রই ক্ষণিক। চরম দুঃখটিও তার ব্যতিক্রম নয়। দুঃখমাত্রই পরবর্তী অনুভবের দ্বারা বিনষ্ট হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, অনুভব একপ্রকার জ্ঞান। বস্তুতঃ ন্যায় মতে, জ্ঞান দ্বিবিধ - স্মৃতি ও অনুভব। তত্ত্বজ্ঞান অনুভবাত্মক। দুঃখ ধ্বংসের প্রতি দুঃখের উপস্থিতি কারণ হয়ে থাকে। কারণ, দুঃখই যদি না থাকে, তাহলে কার ধ্বংস বা উচ্ছেদ হবে? তবে, দুঃখধ্বংসের প্রতি দুঃখ নিজে হেতু হলেও তত্ত্বজ্ঞানও সেক্ষেত্রে কারণ বলেই বিবেচিত হয়। মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব তৃতীয়ক্ষণে দুঃখ উৎপন্ন হয়; মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব দ্বিতীয়ক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ঐ দুঃখের নাশ হলে তার পরক্ষণেই আত্মার মুক্তিরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অবস্থার সূচনা হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী। তত্ত্বজ্ঞনের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংস সম্ভব হয়। আর মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হলে পরেই দুঃখনাশ সম্ভব। সুতরাং দুঃখনাশের জন্য হেতুরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান, তার উৎপত্তিতে পুরুষব্যাপার আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের আয়াসসাধ্য হওয়ায় চরমদুঃখ নিবৃত্তিটিও পুরুষপ্রযত্নসাধ্য এবং ফলতঃ তা পুরুষার্থ বলাই বাহুল্য।

---

[৭৮] নবন্যায়ের প্রবর্তক তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমানোপাধ্যায় ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের একজন খুবই প্রসিদ্ধ টীকাকার বলে পরিচিত। তাঁর রচিত সব টীকাগ্রন্থগুলিই 'প্রকাশ' নামে পরিচিত। তিনি কিরণাবলী ও লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করেন, যা যথাক্রমে দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ, লীলাবতীপ্রকাশ নামে পরিচিত।

এখানে পুনরায় কেউ বলতে পারেন যে, জ্ঞান মাত্রই তো পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিনাশক হয়ে থাকে। ফলতঃ পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞান তার পরবর্তী মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হবে। আর এটি সম্ভব হওয়ায় পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশের জন্য তত্ত্বজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়। সুতরাং পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের জন্য তত্ত্বজ্ঞনের কোন উপযোগিতা নেই। কিন্তু এইরূপ আপত্তি টেকে না। কারণ সিদ্ধান্তী এইক্ষেত্রে বলবেন যে, পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞান পরবর্তী মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু সেই বিনাশ আত্যন্তিক বিনাশ নয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হলেও তারপরেও পুনরায় মিথ্যাজ্ঞান উৎপত্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। এই বিনাশ চিরতরে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করতে পারে না। ফলতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। বরং দুঃখের চরমত্ব সম্পাদনে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকার করতেই হয়। পূর্ববর্তী মিথ্যাজ্ঞান পরবর্তী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হলে সেক্ষেত্রে নতুন করে আর মিথ্যাজ্ঞান উৎপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। ফলতঃ চিরতরে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। অতএব, একথা স্বীকার করতেই হয় যে, চরম দুঃখের নিবৃত্তিতে অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা আছে, যে তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের প্রযত্নসাধ্য। ফলতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যে পুরুষার্থ পদবাচ্য, তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য আস্তিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনে আমরা মূল ন'টি দর্শন সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত। এগুলি হল - চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য,যোগ, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আবার আস্তিক ও নাস্তিক ভেদ রয়েছে। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ - এই তিনটি দর্শন সম্প্রদায় হল নাস্তিক এবং এদের মধ্যে চার্বাক হল নাস্তিক শিরোমণি। এই তিনটি দর্শন সম্প্রদায় ব্যতিরেকে আপর ষড়্‌বিধ দর্শন হল আস্তিক। তবে যাইহোক, চার্বাক ব্যতিরেকে সকল আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য হল মোক্ষ তথা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য মোক্ষ নামক সাগরে পৌছানো। তবে, তাদের গতিপথের মধ্যে ভিন্নতা বর্তমান। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় ভিন্ন ভিন্ন। উপায়ের ভিন্নতার জন্যই তাদের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্যদর্শনে দুঃখ ঃ

দুঃখের প্রকার ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষড়্‌বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্য অন্যতম। যোগদর্শনকে এই দর্শনের সমান্তরাল দর্শন বলা হয়। ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকারের প্রশ্ন ব্যতিরেকে উভয় দর্শনের মধ্যে মিল দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেছেন,

তা যোগদর্শনেও স্বীকৃত। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এখানেই সাংখ্যদর্শনের থেকে যোগদর্শনের ভেদ। এই কারণে যোগদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে এবং সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরসাংখ্য নামে পরিচিত। বস্তুতঃ জগৎ উৎপত্তির আদি বা মূল কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাংখ্য দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি। বস্তুতঃ সাংখ্য হল দ্বৈতবাদী দর্শন। সাংখ্যদার্শনিকগণ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্বীকার করলেও এদের মধ্যে মৌলিক হল দু'টি তত্ত্ব - প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (আত্মা)। সাংখ্য মতে, প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতি হল অমূল মূল; অর্থাৎ প্রকৃতির আর কোন মূল বা কারণ নেই। আর এই প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই গুণত্রয়ের লক্ষণে ঈশ্বরকৃষ্ণ দ্বাদশ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন, 'প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ'। প্রীতি অর্থাৎ সুখ, অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখ, বিষাদ অর্থাৎ মোহ। ত্রয়োদশ সাংখ্যকারিকায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই প্রকার ক্রম উল্লিখিত হওয়ায় তদনুসারে 'প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ'- এই লক্ষণটিকে বুঝে নিতে হবে। কাজেই, সত্ত্বগুণের লক্ষণ প্রীত্যাত্মকত্ব; রজঃ গুণের লক্ষণ অপ্রীত্যাত্মকত্ব এবং তমঃ গুণের লক্ষণ বিষাদাত্মকত্ব। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রীতি উৎপন্ন করে, রজঃগুণ অপ্রীতি, আর তমঃগুণ বিষাদ উৎপন্ন করে।

যাই হোক, উপরের আলোচনা থেকে যা বোঝা গেল যে, রজঃগুণ হল অপ্রীত্যাত্মক অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ। সুতরাং, সাংখ্য মতে দুঃখ হল, রজঃগুণ; অর্থাৎ দুঃখ মাত্রই রজঃগুণ হওয়ায় দুঃখকে একটিই বলা সমীচীন বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার সূচনায় বলেছেন,

'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেৎ নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।।'[৭৯]

---

[৭৯] অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা যে যন্ত্রণা বা পীড়ন বা অভিঘাতই ব্যক্তিকে এই জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করে যে, কি উপায়ে চিরতরে দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব? তবে আপত্তি হয় যে, দুঃখনিবৃত্তির যেহেতু লৌকিক উপায় বিদ্যমান, সেহেতু উক্ত প্রকার শাস্ত্রজিজ্ঞাসা অনাবশ্যক। কিন্তু না; অর্থাৎ এইরূপ পূর্বপক্ষ যথার্থ নয়; কারণ দৃষ্ট বা লৌকিক

উক্ত কারিকাতে 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ' পদটির দ্বারা ঈশ্বরকৃষ্ণ দুঃখের ত্রৈবিধ্য স্পষ্ট করেছেন। তবে এই পদটি থেকে যদি মনে করা হয় যে, দুঃখ ত্রিবিধ, তাহলে তা ভুল হবে। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন যে, 'দুঃখানাং ত্রয়ম্' বলতে দুঃখের প্রকার বোঝায়। জগতের যাবৎ বস্তুর অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করা গেলেও দুঃখ নামক পদার্থ, যা প্রাণী মাত্রের প্রতিকূলবেদনীয়, তার অস্তিত্বে কোন প্রকার সংশয় বা বিতর্ক হয় না। কারণ, প্রাণী মাত্রই দুঃখে জর্জরিত। জীবের এক এক ক্ষণে এক এক ধরণের দুঃখ। অর্থাৎ একই জীব নানবিধ দুঃখে আচ্ছন্ন। বস্তুতঃ জীবের যে কোটি কোটি সংখ্যক দুঃখ, সেই সব দুঃখই ঈশ্বরকৃষ্ণ কথিত ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। অর্থাৎ এখানে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিকত্ব, আধিদৈবিকত্ব ও আধিভৌতিকত্ব এই তিনটি হল দুঃখত্বব্যাপ্য ধর্ম। জীবের অনন্ত দুঃখ উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে যায়।

যে দুঃখ আন্তর উপায়ের দ্বারা সাধ্য তাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। শারীর ও মানস দুঃখই আন্তর উপায়ের দ্বারা সাধ্য। এই কারণে আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার শারীর ও মানস ভেদে দ্বিবিধ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুঃখ তো একটি মানসিক অবস্থা; অর্থাৎ দুঃখ মাত্রই মানস। তাহলে উক্ত প্রকার বিভাগের প্রয়োজন কী? উত্তর হল এই যে, মনোমাত্রজন্য দুঃখই হল মানস দুঃখ। আর, শারীর দুঃখ মনোমাত্রজন্য না হওয়ায় উক্ত প্রকার বিভাগ অসঙ্গত হয়নি। ব্যাধিজন্য যে দুঃখ, তাই হল শারীর দুঃখ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্যই হল ব্যাধি। অর্থাৎ বায়ু আদি ধাতুর বৈষম্যের ফলে স্থূল শরীরের পরিণামকেই ব্যাধি বলে। বায়ু আদি ধাতুর সাম্য থাকলে শারীর সুস্থ থাকে। ব্যাধি শরীরেরই হয়; এই কারণে ব্যাধিজন্য দুঃখকে শারীর দুঃখ বলে। অপরদিকে, মানসিক পীড়াকে আধি বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা,

---

উপায়ের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হলেও তা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হলেও সেক্ষেত্রে দুঃখের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

ভয়, বিষাদ, বিষয় বিশেষের অদর্শন, বাঞ্ছিত বিষয়ের অভাব ইত্যাদি কারণবশতঃ সূক্ষ্ম শরীরের যে পরিণাম হয়, তাই হল আধি। আধি উদ্ভূত দুঃখেরই নাম মানস দুঃখ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ধাতুবৈষম্য ও কামাদিই হল আন্তর উপায় এবং এই আন্তর উপায়ের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখই আধ্যাত্মিক। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিক দুঃখ আন্তর উপায়মাত্রসাধ্য; আর এখানেই আধ্যাত্মিক দুঃখের সাথে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের বৈলক্ষণ্য।

প্রসঙ্গতঃ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের প্রকৃতি আলোচনা করা যাক। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ অদৃষ্ট নামক আন্তর উপায়সাধ্য; কিন্তু তাহলেও তারা আধ্যাত্মিক দুঃখের মতো আন্তরোপায়মাত্রজন্য নয়। এই উভয়প্রকার দুঃখের প্রতিই অধর্মরূপ অদৃষ্ট সাধারণকারণরূপে উপস্থিত থাকলেও এদের উৎপত্তির প্রতি বিশেষ কারণও আছে। বাচস্পতি মিশ্র আধিদৈবিক দুঃখের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ''আধিদৈৰিকং তু যক্ষরাক্ষসৰিনায়কগ্রহাদ্যাৰেশনিৰন্ধনম্।'' অর্থাৎ আধিদৈবিক দুঃখ হল যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, গ্রহ ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ। আধিদৈবিক শব্দান্তর্গত 'দৈবিক' শব্দাংশের দ্বারা দেবযোনিকে বোঝানো হয়েছে। দেবযোনি হল বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত আদি। বাচস্পতি মিশ্র উল্লিখিত 'বিনায়ক' শব্দ দুঃখদায়ক কোন বিঘ্নের বোধক। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন, যদিও 'বিনায়ক' শব্দের দ্বারা অমরকোষে বুদ্ধ ও গণেশকে বোঝানো হয়েছে, তথাপি এঁরা কেউই দুঃখদাতা হতে পারে না। অর্থাৎ 'বিনায়ক' শব্দটি মুখ্যার্থে গ্রহণ না করে লাক্ষণিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। গণেশ যে বিঘ্ননাশক - এই বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও বুদ্ধ বিঘ্ন নাশ করে কিনা - সেই ব্যাপারে মতভেদ বর্তমান। অধ্যাপক গোস্বামী মনে করেন, উক্ত ক্ষেত্রে 'বিনায়ক' শব্দের দ্বারা কোন অপদেবতার দ্বারা উৎপন্ন কোন বিঘ্নকে বোঝাচ্ছে।[৮০] উক্ত সকল

---

৮০ শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশের পুনঃর্মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ - ১২।

দেবযোনি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখই হল আধিদৈবিক দুঃখ। শুধু তাই নয়, গ্রহাবেশের ফলেও দুঃখ উৎপন্ন হয়, যা এই আধিদৈবিক দুঃখেরই অন্তর্গত।

অপরদিকে, আধিভৌতিক দুঃখের ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'আধিভৌতিকং মানুষপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম্।' অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম নিমিত্তক যে দুঃখ, তাই হল আধিভৌতিক দুঃখ। এই প্রকার দুঃখের প্রতিও সাধারণ কারণ হল অধর্ম নামক অদৃষ্ট। তবে, এর বিশেষ কারণগুলি একে আধিদৈবিক দুঃখ থেকে পৃথক করে থাকে। মানুষ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জঙ্গমের দ্বারা এবং প্রস্তরাদি স্থাবর দ্রব্যের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ হল আধিভৌতিক দুঃখ। 'আধিভৌতিক' শব্দান্তর্গত 'ভোতিক' বা 'ভূত' শব্দাংশের দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমকে বোঝাতে হবে। যক্ষ, রাক্ষসাদিও জঙ্গম শব্দের দ্বারা বোধিত হলেও এক্ষেত্রে মানুষাদিই এই শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়ঝঞ্ঝা, শীলাবৃষ্টি, উল্কাপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখের অন্তর্গত নাকি আধিভৌতিক দুঃখান্তর্ভুক্ত - এই বিষয়ে মত পার্থক্য বর্তমান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ ত্রিবিধ দুঃখের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

'দুঃখানি ত্রিবিধানি শোকমোহজ্বরশিরোরোগাদিনিমিত্তান্যাধ্যাত্মিকানি, ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্তান্যাধিভৌতিকানি, অতিবাতাঽতিবৃষ্ট্যাদিহেতুকান্যাধিদৈবিকানি।'

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। শোক, মোহ, জ্বর, শিররোগ ইত্যাদি নিমিত্তক দুঃখ হল আধ্যাত্মিক। যে দুঃখ ব্যাঘ্র, সর্প আদি ভূতবর্গ নিবন্ধন হয়ে থাকে, তাকে বলে আধিভোতিক দুঃখ। আর, অতিবায়ু, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণবশতঃ যে দুঃখ উৎপন্ন

হয়, তা হল আধিদৈবিক দুঃখ। কাজেই, অতিবৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ জীবের যে দুঃখ, তাকে টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী আধিদৈবিক দুঃখের অন্তর্গত করেছেন।[৮১]

দুঃখের অস্তিত্বে প্রমাণ কী? ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাংখ্যদর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে বিশ্বাসী। সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হল - প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র। কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে দুঃখ তো পরিগণিত হয়নি। তাহলে দুঃখ সর্বসম্মত একথা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়? এইপ্রকার পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হলে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং দুঃখং রজঃপরিণামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্' অর্থাৎ দুঃখ হল যাবৎ আত্মার বেদনীয়। জীবনে কখনো দুঃখের সাথে সাক্ষাৎকার হয়নি, এমন জীব নেই। কাজেই দুঃখ জীবমাত্রের প্রত্যক্ষগোচর। এই দুঃখ সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে না থাকলেও দুঃখকে কেউই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কারণ, সাংখ্য মতে প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে রজঃ গুণের একপ্রকার পরিণাম হল দুঃখ। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদিও রজঃ গুণেরই পরিণাম এবং রজঃ গুণের সব পরিণামের মধ্যে দুঃখ অন্যতম। এই কারণে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'রজঃ পরিণামভেদঃ', অর্থাৎ দুঃখ হল রজঃ গুণের পরিণামভেদ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অভিব্যক্তি আদির সাথে সকল পুরুষের সম্বন্ধ অনিবার্য এবং এই কারণেই রজঃ গুণের পরিণামবিশেষ যে

---

[৮১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্তৃক সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ - ২৫৭।

দুঃখ, তা প্রত্যাত্মবেদনীয়। সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, দুঃখকে কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না।[৮২]

দুঃখের আশ্রয় কী? ঃ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুসারে, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আত্মার বিশেষ গুণ। দুঃখাদি আত্মায় সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সাংখ্য মতে, দুঃখ আত্মবৃত্তি নয়, বরং তা অন্তঃকরণবৃত্তি। বাচস্পতি মিশ্রের ভাষায়, 'তদনেন দুঃখত্রয়েণান্তঃকরণবর্তিনা চেতনাশক্তেঃ প্রতিকূলবেদনীয়তয়াঽভিসম্বন্ধোঽভিঘাত ইতি।' অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি ত্রিবিধ দুঃখের সাথে চেতনা শক্তির বা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের প্রতিকূলবেদনীয়তা যা বিদ্বেষবিষয়তারূপে অভিঘাত বা অভিসম্বন্ধ হয়। অভিসম্বন্ধই হল অভিঘাত। 'অভিসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ হল অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত পুরুষে অন্তঃকরণ ধর্মের আরোপ বা আভাস।[৮৩]

দুঃখ জিহাসার কারণ ঃ বিদ্বেষের বিষয়ত্বরূপে বা প্রতিকূলবেদনীয়ত্বরূপে দুঃখত্রয়ের অভিঘাতই দুঃখের জিহাসার কারণ। দুঃখ বিদ্বেষের বিষয় হওয়ার জন্যই দুঃখ সকলের কাছে পরিত্যাজ্য। জীবমাত্রের কাছেই দুঃখ অকাম্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েই যায়। জীবনে দুঃখের সাথে সাক্ষাৎকার হয়নি, এমন জীব নেই। দুঃখের সাথে সাক্ষাৎকার হলেই তাকে পরিহারের জন্য জীব নানা ধরনের প্রয়াস করতে থাকে। কাজেই, দুঃখ স্বরূপতঃ বিদ্বেষের বিষয় হওয়ার জন্যই সকলে দুঃখ জিহাসায় সতত সমুদ্যত হয়ে থাকে।[৮৪]

---

[৮২] শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, ২০১৬, পৃ - ১২।

[৮৩] তদেব; পৃ - ১৩।

দুঃখের বিনাশ সম্ভব কিনা ঃ সাংখ্য মতে, দুঃখ জিহাসার বিষয় হলেও দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। এই কারণেই বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখম্.....'। সাংখ্যদের এই প্রকার বক্তব্যের মূল কারণ হল, তাঁরা কার্যকারণসংক্রান্ত সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। সৎকার্যবাদ অনুযায়ী, কার্য সর্বদা তার উপাদানকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। কাজেই, কোন নতুন পদার্থ কার্যরূপে উৎপন্ন হয় না; উপাদানকারণে যা সূক্ষ্মরূপে ছিল তারই স্থুলরূপে অভিব্যক্তি হল উৎপত্তি। অপরদিকে, পদার্থের স্থুলরূপে অভিব্যক্তির পর পুনরায় তার নিজ উপাদানকারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থানকেই বিনাশ বলে। অনুরূপ কথা দুঃখের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দুঃখ যখন স্বীয় উপাদানকারণ বুদ্ধিতত্ত্বে সূক্ষ্মরূপে থাকে, তখন তা প্রতিকূল বা বেদনীয় কোনটাই নয়; কিন্তু যখনই সূক্ষ্মরূপ থেকে দুঃখ স্থুলরূপে অভিব্যক্ত হয় তখনই তা প্রতিকূলবেদনীয়ত্বরূপে প্রতীত হয় এবং তখনই তাতে বিচ্ছেদের বিষয়ত্ব ধর্ম আরোপিত হয়। যাই হোক, স্বীয় উপাদানকারণে সূক্ষ্মরূপে থাকে বলেই দুঃখের প্রাগভাব ও বিনাশ বা ধ্বংস স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে, দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত না হলেও দুঃখকে তার স্থুলরূপ থেকে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত করানো যায়। তাকেই দুঃখ নিরোধ বা অভিভব বলা হয়।

সৃষ্ট পদার্থই দুঃখের কারণ হওয়ায় তা অপবর্গেরও কারণ ঃ প্রকৃতির অভিব্যক্তির ফলে যে বৈচিত্র্যময় বিশ্ব জগৎ আবির্ভূত হয়েছে, তা পুরুষের ভোগের হেতু হয়। জীবকুল বিশ্বজাগতিক সকল বস্তুকে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল। আর এই ভোগই ত্যাগের সোপান

[৮৪] তদেব; পৃ - ১৩।

সৃষ্টি করে। প্রকৃতি তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করে না; প্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং প্রকৃতি সৃষ্টি করে পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। পুরুষের প্রয়োজন হল ভোগ ও অপবর্গ। অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গই হল পুরুষার্থ। সুতরাং, পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতি ভোগ ও অপবর্গের সৃষ্টি করে। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'স্যাদেতৎপুরুষার্থপ্রযুক্তা সৃষ্টিঃ।' প্রকৃতির সৃষ্টি ব্যতীত পুরুষের ভোগ উৎপন্ন হয় না। ভোগ না হলে পুরুষের অপবর্গও হতে পারে না; কারণ অপবর্গ ভোগের পরবর্তী হয়ে থাকে। যেমন পূর্বে বন্ধন স্বীকার না করলে মুক্তির প্রশ্নই অর্থহীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনই পূর্বে ভোগ স্বীকার ব্যতীত অপবর্গও অর্থহীন। বস্তুতঃ ভোগের কারণস্বরূপ এই বিশাল সৃষ্টি অপবর্গেরও হেতু। কিন্তু কীভাবে? উত্তর হল, বৈরাগ্য ব্যতীত অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ বৈরাগ্যই অপবর্গের মুখ্য সাধন। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, বৈরাগ্য অপবর্গের সাধন হয় কীভাবে? উত্তরে বলা যায় যে, পুরুষ দুঃখ পায় বলেই অপবর্গ বৈরাগ্য-সাধন। দুঃখ পুরুষের হয়, আর কৈবল্য বা অপবর্গও পুরুষেরই হয়। দুঃখ প্রাপ্তির মাধ্যমেই পুরুষের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণা জন্মায়। যে বস্তু দুঃখদায়ক হয়, সেই বস্তুই জিহাসিত হয় এবং সেই বস্তু থেকে চিত্ত বিমুখ হয়; ফলতঃ সেই বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। কাজেই, সৃষ্ট পদার্থকে দুঃখরূপে মনে করাকেই বৈরাগ্যের উপযোগী বলা হয়েছে। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুঃখ হেতুক - এই বিষয়টিকে প্রতিপাদন করার জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন,

'তত্র জরামরণকৃতং দুঃখম্প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাঽৰিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাৰেন।।'[৮৫]

---

[৮৫] সাংখ্যকারিকা ৫৫।।

যাই হোক, ভোগ্য পদার্থ এবং ভোগায়তনস্বরূপ শরীর না থাকলে পুরুষের ভোগ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ ভোগায়তন উভয়ই পুরুষের ভোগের জন্য প্রয়োজনীয়। এখানে শব্দস্পর্শাদি ভোগাপদার্থ হল ভোগের বিষয় এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগের কারণস্বরূপ। শরীর ভোগায়তন হওয়ায় ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে স্তম্বাদি স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রকার শরীরেই পুরুষ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। অর্থাৎ চেতন পুরুষ মাত্রই দুঃখপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সংসারে পুরুষ কী শুধু দুঃখই ভোগ করে? সুখও তো আমাদের অনুভবসিদ্ধ। অর্থাৎ কোন কোন পুরুষ যে সুখও পায়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই 'দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ' - ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় উল্লিখিত এইরূপ কথা বলা সঙ্গত নয়। এইপ্রকার আপত্তির সমাধানে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'যদ্যপি ৰিৰিধৰিচিত্ৰানন্দভোগভাগিনঃ প্রাণভৃদ্ভেদাঃ, তথাঽপি সর্ৰেষাং জরামরণকৃতং দুঃখমৰিশিষ্টম্।' অর্থাৎ অসংখ্য পুরুষ যে বিবিধ রকমের বিচিত্র আনন্দভোগ করে, তার মানে এই নয় যে, তারা শুধুমাত্র ঐ ধরণের আনন্দ ভোগেরই অধিকারী হয়। কারণ ঐ ধরণের বিবিধ বিচিত্র আনন্দভোগী পুরুষকেও দুঃখ ভোগ করতেই হয়। বস্তুতঃ জরাজনিত এবং মরণজনিত দুঃখ পুরুষ মাত্রকেই ভোগ করতে হয়। অতি নিকৃষ্ট প্রাণী থেকে শুরু করে উৎকৃষ্ট প্রাণী সবাইকেই অনিবার্যরূপে এই দুঃখ ভোগ করতে হয়। কারোরই অব্যাহতি নেই এই দুঃখের কবল থেকে। জরা বা বার্ধক্য শরীর মাত্রেরই অনিবার্য বিষয়। অর্থাৎ শরীর ধারণ করলে জরা আসবেই। এটি ত্রৈকালিকভাবে সত্য। জরার প্রভাবে যে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের দুঃখ হয়, এই বিষয়ে কেউই ভিন্ন মত পোষণ করবেন না। শুধু তাই নয়, জরা নানা ধরনের ব্যাধিকেও সঙ্গী করে নিয়ে আসে। আর এই ব্যাধিও দুঃখকে

বহন করে থাকে। ব্যাধিজনিত দুঃখও কেউ বর্জন করতে পারে না। অতি বলবান ব্যক্তিও জরার কবল থেকে নিষ্কৃতি পায় না এবং জরার স্পর্শে পঙ্গুপ্রায় হয়ে যায়।

শুধু জরাজনিত দুঃখ নয়, মরণজনিত দুঃখও শরীরীর অবশ্যম্ভাবী। শরীরে জরা আসলে মরণ বরণ করতেই হবে। মরণসময়ে শরীরীর ভয়াবহ দশাজনিত যে দুঃখ, তার ভোগই শুধু দুঃখ নয়, তার বিবরণ শুনলেও ব্যক্তি বিষাদে মৃতবৎ হয়ে যায়। প্রাণীমাত্রই মৃত্যু কবলিত হবেই। দেবগণের ক্ষেত্রেও এই মরণজনিত দুঃখ থেকে অব্যাহতি নেই। শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, স্বর্গ ভোগের মেয়াদ শেষ হলে দেবগণকেও মর্তলোকে প্রবেশ করতে হয়। বস্তুতঃ স্বর্গ হল পুণ্যের দ্বারা উপার্জিত ভোগ্য বিষয়। পুণ্যবলেই স্বর্গভোগ সম্ভব হলেও পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্তে প্রবেশ নিশ্চিত। গীতাতেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তে তং ভুক্তৰা স্বৰ্গলোকং ৰিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং ৰিশন্তি।...।।'[৮৬] কাজেই একথা স্বীকার্য সত্য যে, স্বর্গলোকবাসী দেবগণও সদাসর্বদা মরণ ভয়ে বিচলিত হয়ে থাকেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, এমন কি কৃমি, উদ্ভিদাদির মতো নিকৃষ্ট প্রাণীও জরা ও মরণজনিত দুঃখপ্রাপ্তি থেকে অব্যাহতি পায় না।

যাই হোক, এখানে পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ এখানে প্রাণীর জরামরণজনিত দুঃখের কথা উল্লেখ করলেও প্রাণীর জন্মজনিত দুঃখপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ কেন উল্লেখ করলেন না? পূর্বপক্ষী এখানে যা বলতে চেয়েছেন যে, প্রাণীর মৃত্যু যেমন ক্লেশকর, তেমনি জন্মও ক্লেশকর। অর্থাৎ জন্মও দুঃখের হেতু। মাতৃজঠরে শিশুর অবস্থানজনিত ক্লেশ থেকে শুরু করে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও শিশুর ক্লেশের ধারা অব্যাহত থাকে। এই বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই অবগত। তথাপি ঈশ্বরকৃষ্ণ জরা-মরণজনিত দুঃখের পাশাপাশি জন্মজনিত দুঃখের উল্লেখ

[৮৬] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - ৯।২১।।

করেননি। এই প্রকার আপত্তির সমাধানে দু'টি যুক্তির কথা বলা যায়। প্রথমতঃ জন্মজনিত দুঃখ সকল পুরুষের ভোগের কারণ নয়; কারণ, মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী জন্মজনিত দুঃখ অনুভব করলেও দেবগণ এই প্রকার দুঃখের ভোক্তা নন। অর্থাৎ জরামরণজনিত দুঃখে সার্বজনীনত্ব থাকলেও জন্মজনিত দুঃখ ঐ প্রকার সার্বজনীন নয়। প্রাণীগণের মতো দেবগণ মাতৃগর্ভসম্ভূত না হওয়ায় পুরুষ মাত্রই জন্মজনিত দুঃখভোগ করে - একথা যথার্থ নয়। যদিও দেবগণও জরামরণজনিত দুঃখের অধিকারী - একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জরামরণজনিত দুঃখ ও জন্মজনিত দুঃখ - এই উভয়প্রকার দুঃখের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ব্যাপকতার দিক থেকে। অর্থাৎ জরা এবং তার পরবর্তী অবস্থায় জীবকে ব্যাপক দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। সেই তুলনায় জন্মকালীন বা মাতৃজঠরে যে দুঃখ, তা ততটা প্রবল নয়; কারণ, জন্মজনিত দুঃখ জরামরণজনিত দুঃখের তুলনায় কম ব্যাপক ও কম তীব্র। জরামরণজনিত দুঃখ তীব্রতর ও ব্যাপকতর। কারণ প্রাণীর জরামরণজনিত দুঃখ মাত্র প্রাণীকেই দগ্ধ করে না, প্রাণীর স্বজনবর্গও ঐ দুঃখের তাপে দগ্ধ হয়। অপরদিকে, জন্মজনিত দুঃখের ক্ষেত্রে মাত্র শিশুই ঐ দুঃখের তাপে দগ্ধ হয়; কিন্তু তার স্বজনবর্গ নবীনের আগমনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকে।

আমরা জানি যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামভূত দুঃখাদি বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করে থাকে। এখানে পূর্বপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, বুদ্ধিতে আশ্রিত দুঃখাদি কীভাবে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়? কারণ, নিয়ম হল যে, একের আশ্রিত গুণ বা ধর্ম অন্যের সঙ্গে সম্বদ্ধ হতে পারে না। সাংখ্যাচার্যগণ বলেছেন, বুদ্ধির গুণ দুঃখাদি পুরুষের সাথে সম্বদ্ধ হয়। কিন্তু তা সম্ভব হয় কেন? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে বলা হয় যে, 'পুরুষ' শব্দের যৌগিক অর্থ ধরেই বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক উক্তপ্রকার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। 'পুরি শেতে'

এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেহ পুরে বা দেহরূপ আশ্রয়ে যিনি শায়িত তিনিই পুরুষ। অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরবর্তী আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। কাজেই, লিঙ্গ শরীরের সাথে দুঃখ সম্বদ্ধ হওয়ায় চেতন পুরুষও দুঃখ সম্বন্ধী হয়ে থাকে। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের তো দুঃখ হতে পারে না। তাই এখানে স্বাভাবিকভাবেই পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, লিঙ্গশরীরে সম্বদ্ধ দুঃখ কেন পুরুষের দুঃখরূপে প্রতীত হয়? আত্মস্বরূপ পুরুষ নির্লেপ। তাই লিঙ্গশরীরবর্তী হলেও পুরুষ দুঃখসম্বদ্ধ হতে পারে না। একটি উপমার মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝানোযেতে পারে। ঘট রূপাদিগুণবিশিষ্ট। কিন্তু ঘট মধ্যস্থ আকাশ ঘটসম্বন্ধী হলেও তা ঘটের রূপাদি গুণের সাথে সম্বদ্ধ হয় না। সুতরাং, ঘটস্থিত আকাশ যদি ঘটের গুণের সাথে সম্বদ্ধ না হয় তাহলে কেন লিঙ্গশরীরবর্তী পুরুষের সাথে লিঙ্গশরীরবর্তী গুণ দুঃখ সম্বদ্ধ হবে? উত্তর হল, 'লিঙ্গস্যাঽবিনিবৃত্তেঃ'।[৮৭] এখানে 'অবিনিবৃত্তি' শব্দের দ্বারা ভেদাগ্রহরূপ অর্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এটি 'অবিনিবৃত্তি' শব্দের মুখ্য অর্থ নয়, লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা স্বীকৃত অর্থ। ভেদাগ্রহ অর্থাৎ ভেদের অগ্রহণ। লিঙ্গশরীরের সাথে পুরুষের ভেদের অগ্রহণ হওয়ার ফলে লিঙ্গশরীরবর্তী দুঃখকে পুরুষ নিজের দুঃখ বলে মনে করে। সুতরাং, লিঙ্গশরীরের সাথে পুরুষের ভেদাগ্রহবশতঃ লিঙ্গশরীরের গুণ বা ধর্ম দুঃখকে পুরুষ স্বীয় স্বরূপে আরোপিত করে এবং জরামরণজনিত দুঃখ ভোগ করে। তবে, এই দুঃখ ভোগের কোন সমাপ্তি আছে কি? কারণ, লিঙ্গশরীরের সাথে সংযুক্ত হয়ে পুরুষ অনাদিকাল থেকে দুঃখ ভোগ করেছে। তবে, এই দুঃখের দ্বারা পুরুষ অনন্তকাল দগ্ধ হতে পারে না; কারণ, এইরূপ স্বীকার করলে পুরুষের কৈবল্যের ধারণাই বৃথা হয়ে যায়। বস্তুতঃ লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি হলেই পুরুষের দুঃখ

---

[৮৭] সাংখ্যকারিকা ৫৫ ।

ভোগেরও অন্ত হবে।[৮৮] এখানে উল্লেখ্য যে, 'অৱিনিবৃত্তি' শব্দের দ্বারা গৃহীত ভেদাগ্রহরূপ অর্থ স্বীকার করলে অপকর্ষ হয়। এই অপকর্ষ বারণের জন্য বাচস্পতি মিশ্র 'লিঙ্গস্য অৱিনিবৃত্তেঃ' - এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 'অৱিনিবৃত্তেঃ' বা 'অৱিনিবৃত্তি' শব্দটির অর্থ বিনিবৃত্তি পর্যন্ত। এইরূপ অর্থ করলেই বলা সম্ভব হয় যে, পুরুষের দুঃখ ভোগের অবধি আছে। অর্থাৎ উক্তরূপ অর্থ ধরলেই বলা যায় যে, লিঙ্গশরীরের বিনিবৃত্তি পর্যন্তই পুরুষ জরামরণজনিত দুঃখ ভোগ করে থাকে।

যোগদর্শনে দুঃখ ঃ

আমরা আগেই দেখেছি যে, যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শন সমানতন্ত্র। সাংখ্যদর্শনে দুঃখ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা যোগদর্শনেও স্বীকৃত। তবে যোগদর্শনে ক্লেশ সম্পর্কে আরো অতিরিক্ত কিছু কথা বলা হয়েছে। ক্লেশ দুঃখেরই নামান্তর। ক্লেশের উৎপত্তি, প্রকার, তা শিথিল করার উপায় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় যোগদর্শনে কথিত হয়েছে। বস্তুতঃ যোগসূত্রের সাধনপাদে এই বিষয়ের আলোচনা হয়েছে। সাধনপাদে প্রথমেই ক্রিয়াযোগের উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তি ব্যুত্থিতচিত্ত অর্থাৎ বহির্মুখী ও চঞ্চল চিত্ত, অথচ যোগ লাভে ইচ্ছুক, তাদের পক্ষে একাগ্রতা ও যোগলাভ করার প্রকৃষ্ট উপায় হল ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ বলতে বোঝায় তপস্যা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযম, স্বাধ্যায় তথা অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে সব কর্ম ও কর্মফল সমর্পণ

[৮৮] ''লিঙ্গং যাৱন্ন নিৱর্ততে ভাৱদিতি।।''- শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, ২০১৬, পৃ ৩২৭।

- এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার সমাহার। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে তপস্যা শারীরী ক্রিয়াযোগ, স্বাধ্যায় বাচিক এবং ঈশ্বর-প্রণিধান মানসিক ক্রিয়াযোগ।

কিন্তু এইরূপ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন কী? উত্তর হল - 'সমাধিভাৰনার্থঃ ক্লেশতনুকরনার্থশ্চ।'[৮৯] অর্থাৎ সমাধি লাভের জন্য এবং ক্লেশকে ক্ষীণ করার জন্য ক্রিয়াযোগ কর্তব্য। ক্লেশ ক্ষীণ হলে তবেই তার নাশ সম্ভব হবে। অশুদ্ধি ক্ষয়ের ফলেই ক্লেশ ক্ষীণ হয়। অশুদ্ধিই ক্লেশের প্রবল অবস্থা। ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই অশুদ্ধিরই ক্ষয় হয়ে থাকে। আর, এই অশুদ্ধির ক্ষয় হলে চিত্ত সমাধির অভিমুখী হতে পারে। ক্রিয়াযোগের দ্বারাই ক্রমশঃ ক্লেশ শিথিল হয়ে একাগ্রতার উৎপত্তি হয়। ক্লেশের ক্ষীণতা সমাধির সহায়ক হয়ে থাকে। ক্লেশক্ষয় এবং সমাধি - এই উভয়েরই হেতু ক্রিয়াযোগ। তপস্যার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য আসে। বিষয়সুখ ত্যাগই হল তপস্যা। যে সকল কর্ম সাধনের ফলে আপাততঃ সুখ উদ্ভূত হয়, কষ্ট সহনপূর্বক সেই সকল কর্ম নিরোধের চেষ্টা করাই হল বিষয়সুখের ত্যাগ। একেই তপস্যা বলা হয়। এই তপস্যাই যোগের অনুকূল। এর অনুশীলনের ফলে ধাতুবৈষম্য ঘটে না এবং এর ফলেই রাগদ্বেষাদিমূলক বিচিত্র সাহজিক কর্ম সকল ও অশুদ্ধি বা যোগের অন্তরায়স্বরূপ চিত্তমল ছিন্ন হয়। ক্রিয়াযোগের অপর দু'টি অঙ্গ হল স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। স্বাধ্যায় হল শ্রবণ ও মনন জাত জ্ঞানের অভ্যাস, যার দ্বারা সাক্ষাৎকারোন্মুখতা সাধিত হয়। আর, ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য সাধিত হলে সমাধি লাভ হয় এবং নানা ধরনের ক্লেশবৃত্তি ক্ষীণ হয়।

সম্প্রজ্ঞান বা বিবেকের দ্বারাই প্রতনূকৃত ক্লেশ অপ্রসবধর্মা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা ক্লেশ দগ্ধবীজের অনুরূপ হয়। দগ্ধবীজ যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা ক্লেশের আর বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। আসলে, সম্প্রজ্ঞার দ্বারা ক্লেশ দগ্ধবীজ

---

[৮৯] যোগসূত্র ২।২।।

অবস্থা বা সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়; আর ক্লেশের ক্ষীণ অবস্থা নিষ্পন্ন হয় ক্রিয়াযোগের দ্বারা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। 'আমি শরীর' - এটি একটি অবিদ্যামূলক ক্লিষ্টবৃত্তি। অর্থাৎ এর সংস্কার ক্লিষ্ট সংস্কার। অপরদিকে, 'আমি শরীর নয়' - এটি সম্যক্ উপলব্ধি। সমাধির ফলে মহৎ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হলে এই প্রকার উপলব্ধি হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'আমি শরীর নয়'- এটি অক্লিষ্ট বা বিদ্যামূলক সংস্কার। এই প্রকার সংস্কারের অপর নাম প্রজ্ঞা সংস্কার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবস্থায় অর্থাৎ সমাপত্তি অবস্থায় চিত্ত প্রজ্ঞায় সমাপন্ন থাকায় সেই সময় 'আমি শরীর' - এই প্রকার ক্লিষ্ট বৃত্তি সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ দগ্ধবীজের মতো থাকে। ফলতঃ 'আমি শরীর' - এই প্রকার বৃত্তির সংস্কার থেকে অপর কোন ঐ প্রকার ক্লিষ্ট বৃত্তির উদ্ভব হয়না। এর ফলে 'আমি শরীর' - এই অভিমানমূলক ভাব সর্বকালের জন্য নিবৃত্ত হয়।

যাই হোক, এই ক্লেশ হল পাঁচপ্রকার; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ - এই পঞ্চবিপর্যয়ই হল ক্লেশ।[৯০] কষ্টদায়ক বিপর্যস্ত জ্ঞান হল ক্লেশের সাধারণ লক্ষণ।[৯১] এই পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই অপর চারটি ক্লেশের মূল। নিয়ম হল - কারণের গুণ কার্যে প্রতিফলিত হয়। অবিদ্যা অস্মিতাদি শেষ চতুর্বিধের মূল হওয়ায় অস্মিতাদিও অবিদ্যাত্মক ও ভ্রমাত্মক।

অস্মিতাদি শেষ চতুর্বিধ ক্লেশের প্রতিটির আবার চারটি অবস্থাভেদ আছে। সেগুলির প্রসবভূমি অবিদ্যা। এই চারটি অবস্থা হল - প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার।[৯২] প্রসুপ্ত ক্লেশ হল চিত্তের ক্লেশের শক্তিমাত্ররূপে অবস্থান অর্থাৎ ক্লেশের বীজভাবপ্রাপ্তিই প্রসুপ্তি। ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীভূত ক্লেশ হল তনু। অর্থাৎ তনু হল প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা উপহত ক্লেশ। যা অপর

---

৯০ 'অৱিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিৱেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।।'' - যোগসূত্র ২।৩।।

৯১ ''ক্লেশা ইতি পঞ্চ ৱিপর্যয়া ইত্যর্থঃ।'' - ব্যাসভাষ্য ২।৩

৯২ ''অৱিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুৱিচ্ছিন্নোদারাণাম্।।'' - যোগসূত্র ২।৪।।

ক্লেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় বৃত্তিলাভ করে, তাই হল বিচ্ছিন্ন ক্লেশ। আর, উদার হল ব্যাপারযুক্ত অবস্থা, বা বিষয়ে লব্ধবৃত্তি অবস্থা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে। ক্রোধের সংস্কারাবস্থা বা বীজাবস্থাই প্রসুপ্তি। ক্রোধের সময় রাগ বিচ্ছিন্ন; কারণ ক্রোধের বা দ্বেষের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাগ পুনরায় বৃত্তিলাভ করে। তাই ক্রোধকালে রাগ হল বিচ্ছিন্ন ক্লেশ। আবার, ক্রোধের সময়ে দ্বেষ হল উদার; কারণ দ্বেষই ঐ সময়ে লব্ধবৃত্তি; দ্বেষই ক্রোধের সময়ে রাগের অদর্শনের হেতু হয়; রাগ ক্রোধকালে লব্ধবৃত্তি হয়না। অনুরূপভাবে, রাগকালে ক্রোধ লব্ধবৃত্তি হয় না; ফলতঃ অনুরাগের সময় রাগ হল উদার। আর, তনু হল রাগ, দ্বেষাদি ক্লেশের ক্ষীণ অবস্থা। অর্থাৎ বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি দমিত হলে রাগ-দ্বেষাদিকে তখন তনু বলা যায়।

এখানে একটি আপত্তি হতে পারে। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার - এরা প্রত্যেকেই ক্লেশ জাতির অন্তর্গত। অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্লেশজননত্ব ধর্ম উপস্থিত। তাই এই প্রকার বিভাগ কী সঙ্গত? উত্তর হল, যদিও প্রসুপ্তাদি ক্লেশজাতির অনুগত, তথাপি অবস্থা-বৈশিষ্ট্য থেকেই এই প্রকার বিভাগ করা হয়েছে। কাজেই, অস্মিতাদি সকল ক্লেশই অবিদ্যার ভেদ হলেও তাদের মধ্যে অবিদ্যা ব্যাপকভাবে থাকলেও তাদের প্রত্যেকের প্রসুপ্তাদি অবস্থাভেদ বর্তমান।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ্য যে, প্রসুপ্ত অবস্থায় যে ক্লেশ বীজভাবে অবস্থান করে, সেই ক্লেশবীজ দগ্ধ হলে তা কার্য-জনন-সামর্থ্য হারায়। অর্থাৎ দগ্ধবীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি অসম্ভব, তেমনি ক্লেশবীজ দগ্ধ হলে তা আলম্বন পেলেও বা বিষয়-সন্নিকৃষ্ট হলেও আর প্রবুদ্ধ হয় না বা পুনরায় বৃত্তিলাভ করে না। সুতরাং, প্রসুপ্ত ক্লেশ ও দগ্ধবীজ ক্লেশের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, এরা উভয়েই অলক্ষ্য; কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য হল যে, বিষয় সন্নিকৃষ্ট হলে প্রসুপ্ত ক্লেশ বিষয়ে লব্ধচিত্ত হয় বা উদার অবস্থা প্রাপ্ত হয়; অপরদিকে, দগ্ধবীজ ক্লেশ আলম্বন প্রাপ্ত

হলেও বিষয়ে লব্ধবৃত্তি হয় না। এইরূপে দগ্ধবীজ অবস্থা প্রসুপ্তাদি চতুর্বিধ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় ভাষ্যকার এই অবস্থাকে পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা বলেছেন।[৯৩] মহাভারতেও শান্তিপর্বে অনুরূপ কথা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে,

''ৰীজান্যগ্ন্যপদগ্ধানি ন রোহান্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।।''

যাই হোক, অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে যে অবিদ্যা অস্মিতাদি শেষ চতুর্বিধ ক্লেশের ক্ষেত্র বা প্রসবভূমি, সেই অবিদ্যার লক্ষণ প্রসঙ্গে যোগসূত্রে বলা হয়েছে - অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্ম বিষয়ে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মস্বরূপ যে জ্ঞান হয়, তাই হল অবিদ্যা।[৯৪] এগুলি আলোচনা করা যাক।

ক) অবিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞানের অভাব। অনিত্য কার্যবস্তুতে নিত্যতার জ্ঞান, অশুচি বস্তুতে শৌচের জ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান এবং অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞানই হল অবিদ্যা। এই চারটি অবিদ্যার লক্ষণ। পৃথিবী যা প্রকৃতপক্ষে অনিত্য হলেও তাকে নিত্যরূপে বোধ, চন্দ্রতারকাবিশিষ্ট অন্তরীক্ষ লোকেও নিত্যতার জ্ঞান, দেবগণের অমরত্বের জ্ঞান - এইরকম অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান হল অবিদ্যার প্রথম লক্ষণ।

খ) অবিদ্যার দ্বিতীয় লক্ষণে অশুচিতে শুচিজ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন, শরীর যা ঘৃণাজনক ও অপবিত্র, তাতে শুচিজ্ঞান। শরীরকে অশুচি বলার কারণগুলি হল শরীরের স্থান, বীজ, উপষ্টম্ভ, নিস্যন্দ ও নিধন। শরীরের স্থান বলতে সূত্রাদিবিশিষ্ট অশুচি মাতৃ উদরকে বোঝানো হয়েছে; বীজ হল মাতা পিতার লোহিত ও শুক্র; ভুক্ত পদার্থের সংঘাত অর্থাৎ পোষক ভক্ষ্য ও

---

[৯৩] ''তত্রৈৰ সা দগ্ধৰীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাৰস্থা নান্যত্রেতি'' - যোগসূত্র ভাষ্য ২।৪।।

[৯৪] ''অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরৰিদ্যা।।'' - যোগসূত্র ২।৫।।

পেয় বস্তুর পরিণাম রসরক্তাদি হল উপষ্টম্ভ; ঘর্মাদি প্রস্বেদরূপে ক্ষরিত দ্রব্যকে নিস্যন্দ বলা হয়; আর মৃত্যু হলে সকল দেহই অপবিত্র হয়। এই পাঁচটি কারণে শরীরমাত্রকে অশুচি বলা হয়। আবার, পক্ষিগণও শরীরকে অপবিত্র বলে মনে করেন এবং সেই কারণেই মৃদ্‌জলাদির দ্বারা শরীরের শুচিতা সম্পন্ন হয়। শরীর যদি স্বভাবতঃই পবিত্র হত তাহলে মৃদ্‌জলাদির দ্বারা তার শৌচত্ব সম্পন্ন করার প্রয়োজন হত না। সুতরাং, শরীর অশুদ্ধ বা অপবিত্র। কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ এই অপবিত্র শরীরেই শুচিতার জ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন, অশুচি স্ত্রী শরীরকে শুচি বলে ভ্রম হয়ে থাকে। এইভাবে অশুচি স্ত্রী-শরীরে শুচি বিপর্যাস জ্ঞান হয়। এর দ্বারা পাপকার্যে তথা হিংসাদিতে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যা অপুণ্য কার্য, তাতে পুণ্যজ্ঞান হয় এবং ধনাদি অনর্থে অর্থ বা কল্যাণের ভ্রান্ত জ্ঞান হয়ে থাকে।

গ) অনুরূপভাবে, দুঃখে সুখজ্ঞানও অবিদ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যা সুখ বা সুখসাধনরূপে প্রতিভাত হয়, বিবেকীব্যক্তির কাছে সেই সবই দুঃখ। কাজেই, দুঃখময় বস্তুতে সুখজ্ঞান হওয়া অবিদ্যা।[৯৫]

ঘ) আবার, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞানকেও অবিদ্যা বলে। অনাত্ম বস্তু হল চেতন ও অচেতনভেদে দু'প্রকার বাহ্যবস্তু, ভোগাধিষ্ঠান স্থূল শরীর, ভোগজনক চিত্ত ইত্যাদি। এই সকল অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানই অবিদ্যা। ভগবান পঞ্চশিখ আচার্যও এই বিষয়ে বলেছেন যে, মূঢ় ব্যক্তিগণ ব্যক্ত অর্থাৎ চেতন যেমন- স্ত্রী, পুত্র, পশু ইত্যাদি এবং অব্যক্ত অর্থাৎ অচেতনকে যেমন - শয্যা, আসন ইত্যাদিকে আত্ম বলে জ্ঞান করে তাদের সম্পদকে আত্মসম্পদ মনে করে আনন্দিত হয় এবং তাদের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে দুঃখিত হয় বা অনুশোচনা করে।

---

[৯৫] যোগসূত্র ২।১৫।।

যাই হোক, তা হলে এইটুকু বোঝা গেল যে, অনিত্যে নিত্যতার জ্ঞান, অশুচিতে শুচিতার জ্ঞান, দুঃখে সুখের জ্ঞান এবং অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি - এইভাবে অবিদ্যা চতুষ্পাদ। এই চারপ্রকার অবিদ্যাই ক্লেশপ্রবাহ ও সবিপাক ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয়েরও মূল।

এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে, অবিদ্যা মাত্র বিদ্যা বা প্রমাণের অভাব নয়, বরং বিদ্যাবিপরীত জ্ঞানান্তরই অবিদ্যা। অর্থাৎ অবিদ্যা মাত্র অভাব পদার্থ নয়, তাতে ভাবত্বও বর্তমান। 'অবিদ্যা' শব্দটি 'অমিত্র' ও 'অগোষ্পদ' শব্দ দু'টির মতো একই স্বভাবের। অর্থাৎ 'অমিত্র' শব্দটির দ্বারা যেমন মিত্রাভাবকে বা কেবল মিত্রকে বোঝায় না; শব্দটির দ্বারা মিত্রবিরুদ্ধ শত্রুও বোঝায়। আবার, 'অগোষ্পদ' শব্দটির দ্বারা গোষ্পদের অভাব অথবা কেবল গোষ্পদ না বুঝিয়ে এই উভয়ের থেকে পৃথক অন্য বস্তু অর্থাৎ একটি বিপুল দেশরূপ অন্যবস্তু বোঝায়। অনুরূপভাবে, 'অবিদ্যা' কেবল বিদ্যার অভাব নয়, বরং বিদ্যা বা জ্ঞানের বিনাশ্য অপর একটি ভ্রান্ত জ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমরা আগেই বলেছি, অবিদ্যা অস্মিতাদি শেষ চারপ্রকার ক্লেশের মূল। আবার, অবিদ্যার চারটি লক্ষণের মধ্যে এক-একটির প্রধান ভূমিকা রয়েছে অস্মিতাদি চারটি ক্লেশে। যেমন, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান প্রধান অস্মিতা ক্লেশে; অশুচিতে শুচিজ্ঞান রাগে প্রধান; দুঃখে সুখজ্ঞান দ্বেষে প্রধান, কারণ দ্বেষ একপ্রকার দুঃখ হলেও দ্বেষকালে তা সুখকররূপে জ্ঞাত হয়; আর, অনিত্যবস্তুতে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ ক্লেশে প্রধান।

পঞ্চক্লেশের দ্বিতীয় হল অস্মিতা। অস্মিতার লক্ষণে পতঞ্জলি বলেছেন, দৃক্ শক্তি অর্থাৎ পুরুষ বা চেতন ভোক্তা এবং দর্শনশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি বা অচেতন ভোগ্য - এই উভয়ের অভেদ অভিমান বা একাত্মতারূপ জ্ঞানকেই অস্মিতা বলে।[৯৬] পুরুষ ও বুদ্ধির তাদাত্ম্যাভিমানের

[৯৬] ''দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা।।'' - যোগসূত্র ২।৬।।

দ্বারাই ভোগ সম্ভব হয়। এই তাদাত্মের অভিমান যদি না হত, তাহলে পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপের উপলব্ধি হত এবং সেই অবস্থাই হল কৈবল্যাবস্থা। কাজেই, অস্মিতা, যা অবিদ্যার প্রথম কার্য, তার দ্বারাই সংসার অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদির ভোগ সম্ভব হয়। পঞ্চশিখ আচার্যের দ্বারা উক্ত হয়েছে যে, বুদ্ধি থেকে ভিন্ন পুরুষকে নিজ আকার (স্বরূপ), শীল (স্বভাব), বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন না দেখে মোহবশতঃ বুদ্ধিকেই আত্মরূপে জ্ঞান করে। অর্থাৎ আকার, শীল ও বিদ্যা - এই তিন দিক থেকেই পুরুষ ও বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পুরুষের আকার, শীল ও বিদ্যা হল যথাক্রমে সদা বিশুদ্ধি, উদাসীনতা ও চৈতন্য। অপরদিকে, অবিশুদ্ধি, অনুদাসীনতা অর্থাৎ বন্ধন এবং জড়তা বা চৈতন্যের অভাব এই হল যথাক্রমে বুদ্ধির আকার, শীল ও বিদ্যা। কাজেই, বুদ্ধি, যা অনাত্ম বস্তু, তাকে পুরুষরূপে জ্ঞান হয়। এইভাবেই অস্মিতা ক্লেশে অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনাত্মে আত্মজ্ঞান অনেক প্রকার হতে পারে; যেমন, প্রথমতঃ অব্যক্তে আত্মখ্যাতি হয়ে থাকে। এইরূপ কথা বৌদ্ধদের মধ্যে লক্ষণীয়। কোন কোন বৌদ্ধ বলে থাকেন যে, 'আমি শূন্য'। এই প্রকার বক্তব্যের মাধ্যমে অব্যক্তে আত্মখ্যাতি পরিস্ফূট হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ মহতে আত্মখ্যাতি হয় যা কোন কোন বৈদান্তিকের বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়; যেমন, আত্মা সর্বব্যাপী, আনন্দময় ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ জৈনগণ বলেন, শরীরের মধ্যস্থ নির্মল জ্ঞানরূপ আত্মা। এ হল অহংকারে আত্মখ্যাতি বা পরিচ্ছিন্ন আমিত্বের উপলব্ধি। চতুর্থতঃ করণে আত্মখ্যাতি। এইপ্রকার অনাত্মে আত্মখ্যাতিই অস্মিতা। বুদ্ধি, যা প্রধান করণ, তাতে আত্মজ্ঞান অস্মিতা। আবার, বুদ্ধির পরিণাম ইন্দ্রিয় সকলে যে আত্মজ্ঞান, তাও অস্মিতা; যেমন, 'আমি চক্ষুরাদি শক্তিমান' এইভাবে অনাত্মে আত্মখ্যাতি অস্মিতা।[৯৭]

[৯৭] পাতঞ্জল যোগদর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্য, পৃ - ১৪৭।

তৃতীয় ক্লেশ হল রাগ। সুখ বা সুখের উপায়ের কামনাকে রাগ বলা হয়ে থাকে।[৯৮] যে ব্যক্তির সুখের অভিজ্ঞতা হয়েছে সে বার বার সেই সুখানুভূতি লাভ করতে চায়। কাজেই সুখের অভিজ্ঞতা থেকে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং তজ্জনিত যে সুখস্মৃতি, তার মাধ্যমেই তাদৃশ সুখে বা সুখের সাধনে অর্থাৎ সুখজনক পদার্থে যে তৃষ্ণা বা লোভ, তাকেই রাগ বলে।

অপরদিকে, দুঃখের অনুবর্তী ক্লেশবৃত্তিকে দ্বেষ বলে।[৯৯] অর্থাৎ যে ব্যক্তির দুঃখের অনুভব হয়েছে, সেই ব্যক্তির দুঃখ বা দুঃখসাধনের প্রতি যে ক্রোধ, তাই হল দ্বেষ। সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তজ্জনিত সংস্কার থেকে সেই সুখের স্মৃতি যেমন হয়, তেমনি দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তজ্জনিত দুঃখসংস্কার থেকে দুঃখের স্মরণ হয়ে থাকে, এবং দুঃখের স্মরণপূর্বক তাদৃশ দুঃখে বা তাদৃশ দুঃখসাধনে বা দুঃখের কারণে যে প্রতীঘ, মন্যু, জিঘাংসা বা ক্রোধ, তাই দ্বষ। 'প্রতীঘ' অর্থাৎ প্রতিঘাতের ইচ্ছা, 'মন্যু' অর্থাৎ ক্ষোভ, 'জিঘাংসা' অর্থাৎ হননেচ্ছা, ক্রোধ, দ্বেষ এই শব্দগুলি পর্য্যায় শব্দ।

এখানে উল্লখ্য যে, দ্বেষ ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। দুঃখের স্মরণজন্য কোন বিষয়ের প্রতি ক্রোধ বা বিরুদ্ধভাব দ্বেষ। অর্থাৎ দ্বেষ হল একপ্রকার চিত্তবৃত্তি। অপরদিকে, হিংসা হল দ্বেষপূর্বক আচরণ। অর্থাৎ দ্বেষ থেকে যে আচরণ হয়, তাকেই হিংসা বলে। দ্বেষপূর্বক পরাপকাররূপ আচরণই হিংসা।

পঞ্চম ক্লেশ হল মরণত্রাস। যোগসূত্রে অভিনিবেশ ক্লেশকে 'স্বরসবাহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ অভিনিবেশ এমন একটি ক্লেশ, যা পূর্ব জন্মের সংস্কারের দ্বারা পরজন্মে প্রবাহিত হয়। কাজেই, পূর্ব জীবনে মরণত্রাস অনুভব করে অবিদ্বানের মতো বিদ্বানেরও যে সহজাতি,

[৯৮] ''সুখানুশয়ী রাগঃ।'' - যোগসূত্র সাধনপাদ ২।৭।।

[৯৯] ''দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।''- যোগসূত্র সাধনপাদ ২।৮।।

প্রসিদ্ধ ক্লেশ, তাই হল অভিনিবেশ।[১০০] সুতরাং, এই ক্লেশ অজ্ঞ ব্যক্তির যেমন থাকে, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরও থাকে। কেননা, পূর্বজন্মের মৃত্যুভয় ও মৃত্যুদুঃখ অনুভবের সংস্কার অজ্ঞ ও পণ্ডিত নির্বিশেষে সবার মধ্যেই সমানভাবে থাকে। তাই যোগভাষ্যকার বলেছেন যে, ''আমি থাকব না - এমন যেন না হয়, আমি যেন থাকি'' - এটিই সমস্ত প্রাণীর নিত্য আত্মপ্রার্থনা এবং এই প্রকার আত্মপ্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আমাদের পূর্বজীবনের মৃত্যুভয়ের ও মৃত্যুদুঃখের অনুভব করেনি, তার উক্তপ্রকার আত্মপ্রার্থনা হতে পারে না। অভিনিবেশ ক্লেশ সহজ বা স্বাভাবিকের মত যা সঞ্চিত সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয়। এই কারণেই অত্যন্ত নিকৃষ্ট কীট কৃমিরও অভিনিবেশ ক্লেশ হয়ে থাকে, যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ কোন প্রমাণের দ্বারাই সে মরণদুঃখ জানতে পারে না। সুতরাং, পূর্ব পূর্ব জীবনে যে মরণদুঃখ অনুভূত হয়েছে, তারই সংস্কার প্রবাহিত হয়ে প্রাণীর মরণত্রাস রূপে দেখা দেয়।

উক্ত পাঁচপ্রকার ক্লেশের দ্বিবিধ অবস্থা আছে; যথা - স্থূলবৃত্তি অবস্থা ও সূক্ষ্মবৃত্তি অবস্থা। এই ক্লেশপঞ্চকের সূক্ষ্মবৃত্তি অবস্থা হল তাদের বীজভাবে বা সংস্কাররূপে অবস্থান। আর, ক্লেশপঞ্চকের স্থূলবৃত্তি অবস্থা হল সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে সংসার দশায় যে অবস্থার ভোগ হয়। ক্লেশপঞ্চকের এই উভয়প্রকার অবস্থার মধ্যে স্থূলবৃত্তি অবস্থাই প্রসংখ্যানরূপ ধ্যানের দ্বারা ত্যাগের যোগ্য হয়। ক্রিয়াযোগের মাধ্যমেই ক্লেশ সকলের স্থূলবৃত্তি সূক্ষ্মবৃত্তিতে পরিণত হয়। তবে, সূক্ষ্মবৃত্তিই ক্লেশ সমুদায়ের উচ্ছেদ নয়। তবে, ক্লেশ সমুদায়ের স্থূলবৃত্তি সহজ উপায়ের দ্বারা বিনষ্ট হলেও তার সংস্কার বা সূক্ষ্মবৃত্তির উচ্ছেদ করতে হলে বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হয়। তাই যতকাল পর্যন্ত ক্লেশ সকল সূক্ষ্মবৃত্তি অর্থাৎ সংস্কারাবস্থা অতিক্রম করে দগ্ধবীজভাবে পরিণত না হয়, ততকাল পর্যন্ত প্রসংখ্যান ধ্যান করাই কর্তব্য। বিষয়টিকে ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্যকার একটি

[১০০] ''স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।।''- যোগসূত্র ২।৯।।

উপমার সাহায্য নিয়েছে। তিনি বলেছেন, বস্ত্রের ধূলোময়লা সহজ উপায়ে দূর করা সম্ভব অর্থাৎ বস্ত্রটিকর ঝেড়ে ফেললেই তা দূরীভূত হয়; কিন্তু বস্ত্রের সূক্ষ্মমল ঐভাবে দূর করা যায়না, তার জন্য ক্ষারাদি সংযোগের মাধ্যমে বস্ত্রের ধৌতকরণের প্রয়োজন হয়, যা পূর্বের প্রক্রিয়ার তুলনায়কষ্টসাধ্য। এইপ্রকার উপমায় ভাষ্যকার বস্ত্রের ধূলিময়লা অর্থাৎ স্থূলমলের সাথে ক্লেশপঞ্চকের সূক্ষ্মবৃত্তির তুলনা করেছেন। অর্থাৎ বস্ত্রের স্থূলমলের মতো ক্লেশ পঞ্চকের স্থূলবৃত্তিও সহজ উপায়ের দ্বারা দূরীভূত হলেও সূক্ষ্মবৃত্তি দূর করতে কিন্তু বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, যা কষ্টসাধ্য। তবে, প্রসংখ্যান ধ্যানের মাধ্যমে ক্লেশপঞ্চকের সূক্ষ্মবৃত্তি দগ্ধবীজভাবে পরিণত হলেও তা প্রকৃত উচ্ছেদ নয়। দগ্ধবীজভাবে অর্থাৎ ক্লেশসমুদয়কে হীনবল করা পর্যন্ত পুরুষের প্রযত্ন কার্যকরী হলেও তাদের একেবারে উচ্ছেদ করা পুরুষপ্রযত্নসাধ্য নয়। চিত্তবিনাশের মাধ্যমেই তাদের সম্যক্ প্রণাশ বা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয়।[১০১]

একটি নির্বোধ অজ্ঞ শিশুর কাছে জীবন্ত সর্পের শীতলতার স্পর্শানুভূতি সুখকর রূপে প্রতীত হলেও বৃদ্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ প্রবীণগণের কাছে তা প্রতিকূল বেদনীয় হয়ে থাকে - এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপভাবে, বিবেকী ব্যক্তি বা যোগীর কাছে সবকিছুই দুঃখ বলে বোধ হয় অর্থাৎ বিষয় মাত্রই দুঃখ। পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ - এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত থেকে ভোগকালেও নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, গুণবৃত্তি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বৃত্তিসকলের পরস্পরের বিরোধী স্বভাব হওয়ায় বিষয়সুখও দুঃখকর, অর্থাৎ কিছুতেই শান্তি নেই। যাই হোক এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, যে সব কারণে বিবেকীর বিষয় ভোগও দুঃখ বলে প্রতীত হয়, সেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার দুঃখ এবং সর্বোপরি গুণবৃত্তি বিরোধজনিত দুঃখ কী?

[১০১] যোগসূত্র ২।১১।। এবং সূত্রভাষ্য।।

প্রথমেই দেখা যাক যে, পরিণাম দুঃখ কী? রাগ থেকে যে দুঃখ জন্মায়, তা হল পরিণাম দুঃখ। রাগের লক্ষণে বলা হয়েছে - 'সুখানুশয়ী রাগঃ'। অর্থাৎ রাগ হল সুখানুশয়ী; এবং রাগকালে সুখানুভব হয়। একথা বলা হলেও যোগভাষ্যকার সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন যে, রাগ সুখানুশয়ী হলেও পরিণামে তা অশেষ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাগমূলক সুখ বর্তমানকালীন হলেও তজ্জন্য পরিণাম দুঃখটি ভাবী। প্রাণী মাত্রেরই সুখানুভব রাগানুবিদ্ধ অর্থাৎ অনুরাগযুক্ত বা আসক্তি বা তৃষ্ণার দ্বারা যুক্ত। চেতন ও অচেতন এই উভয়ই হল সুখসাধন; অর্থাৎ এই উভয়প্রকার উপায়ের মাধ্যমেই প্রাণীর সুখানুভব হয়ে থাকে। এখন সুখ ভোগের সময় যেমন আসক্তি বা রাগ থাকে, তেমনি সুখভোগের মাধ্যমে অধিকতর আসক্তি বা রাগের উৎপত্তি হয়। কাজেই, সুখানুভবের রাগজন্য কর্মাশয় বা ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয়। আবার একইভাবে, সুখভোগকালে সুখবিরোধী দুঃখসাধন বিষয়সকলে দ্বেষ থাকে। ফলতঃ দ্বেষজ কর্মাশয় উৎপন্ন হয়। আবার, সুখভোগকালে তজ্জনিত মোহ বা বিপরীত জ্ঞানও থাকে এবং ফলস্বরূপ মোহজনিত কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। সুতরাং, সুখভোগীর রাগজ, দ্বেষজ ও মোহজ মানস ও বাচিক কর্মাশয় উৎপন্ন হয়। এইসব কর্মাশয় অর্থাৎ ধর্মাধর্ম পরিণামে দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। আবার, শারীর কর্মাশয়ও ভোগের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। ভোগমাত্রই প্রাণী পীড়ন। অর্থাৎ কোন প্রাণীর উপঘাত না করে কখনো উপভোগ সম্ভব হয় না।[১০২] সুতরাং, বিষয়-সুখ নামক অবিদ্যার ফলে হিংসাকৃত শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। এই শারীর কর্মাশয়ও পরিণামে দুঃখের হেতু হয়ে থাকে। ভোগের দ্বারা তৃপ্তিবশতঃ ভোগ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের উপশান্তি বা প্রবৃত্তির অভাবই সুখ। অপরদিকে, ভোগতৃষ্ণার জন্য চঞ্চলতাবশতঃ ভোগ্যবিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের অশান্তিকে দুঃখ বলে। কিন্তু বিবেকী যোগী বুঝতে পারেন যে, পুনঃ পুনঃ ভোগাভ্যাস বা ভোগের অনুশীলনের দ্বারা

[১০২] 'নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি।' - যোগসূত্র ভাষ্য২।২৫।।

ভোগের বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না; কারণ, ভোগের অনুশীলনের ফলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।[১০৩] অর্থাৎ ভোগাভ্যাসের দ্বারা একদিকে যেমন ভোগের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে ভোগসাধনে ইন্দ্রিয়ের পটুতা বা কৌশল বা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, ভোগাভ্যাস প্রকৃত সুখ বা পারমার্থিক সুখের উপায় নয়। কাজেই, সুখার্থী সুখভোগের পরিণামস্বরূপ দুঃখের মধ্যে নিমগ্ন হয়। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার একটি উপমার প্রয়োগ করেন। বৃশ্চিকের বিষে ভীত হয়ে কোন ব্যক্তি সর্পের মুখে পতিত হয়ে দষ্ট হলে ঐ ব্যক্তিকে যেমন অধিকতর দুঃখ অনুভব করতে হয়, তেমনি সুখকামনা করে বিষয় বাসনা সম্বলিত সুখার্থী পরিশেষে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই হল সুখভোগের পরিণাম দুঃখ, যা বিবেকীগণকে সুখাবস্থাতেও দুঃখ প্রদান করে এবং অবিবেকীগণকে সুখভোগের পরিণামস্বরূপ কালে দুঃখ প্রদান করে।

এখন তাপদুঃখ কী এটা জানা প্রয়োজন। তাপদুঃখও একপ্রকার পরিণাম দুঃখ। তবে এর পৃথক নির্দেশের কারণ কী? কারণ, তাপদুঃখ দ্বেষ প্রধান, আর পরিণাম দুঃখ রাগ প্রধান। মানুষ যখন সুখভোগ করে, তখন সুখসাধক বস্তুতে রাগ থাকলেও এমন অপর বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দ্বেষও থাকে। এই দ্বেষ চেতন সাধনজনিত হতে পারে, আবার অচেতনসাধনজনিতও হতে পারে। সুতরাং, চেতন ও অচেতন এই দ্বিবিধ সাধনে দ্বেষ থাকায় সেই দ্বেষ থেকে দ্বেষজ কর্মাশয় উৎপন্ন হয়। আকাঙ্ক্ষা করে ব্যক্তি সুখসাধন বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা নানাবিধ চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার ফলে আপরকে অনুগ্রহ (উপকৃত) করে এবং পীড়িত (ক্ষতিগ্রস্ত) করে। এই প্রকার পরানুগ্রহ ও পরপীড়ার দ্বারা ব্যক্তি ধর্মাধর্ম অর্থাৎ পাপপুণ্য সঞ্চয়

---

[১০৩] ''ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে।।'' - মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক - ৯৪।

করে। এই কর্মাশয় লোভ বা মোহ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এই কর্মাশয় থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাই তাপদুঃখ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, তাপদুঃখও একপ্রকার পরিণামদুঃখ, যা দ্বেষ থেকে উৎপন্ন।

তাপদুঃখের আলোচনার পর সংস্কার দুঃখের আলোচনার প্রসঙ্গ এসে যায়। তাপদুঃখের মতো সংস্কারদুঃখও একপ্রকার পরিণামদুঃখ। কিন্তু সংস্কার প্রধান হওয়ায় এটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুখানুভব থেকে সুখ এবং সুখসাধন বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন হয়; অনুরূপভাবে দুঃখানুভব থেকেও দুঃখ ও দুঃখসাধনের সংস্কার জন্মায়; সেই সংস্কার থেকে যথাক্রমে সুখানুভূতির ও দুঃখানুভূতির স্মৃতি উৎপন্ন হয়; সেই স্মৃতি থেকে আবার যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষ জন্মায়; এই রাগ ও দ্বেষ থেকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মায়, যা ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয়ের কারণ হয়। এই কর্মাশয় থেকে আবার জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক হয়, যা পুনরায় সংস্কারের কারণ হয়। এইভাবে অনাদিকাল থেকেই দুঃখস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

যাই হোক, উপরের আলোচনা থেকে এইকথা স্পষ্ট হল যে, পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ - এই ত্রিবিধ দুঃখই অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যত দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ অবিবেকী মানুষের সুখভোগকালে উদ্বেগের কারণ না হলেও যোগীগণকে তা প্রতিকূলাত্মক দুঃখরূপে পীড়া দেয়; কারণ, যোগীগণের চিত্ত হল নেত্রগোলকের মতো কোমল, বা স্পর্শকাতর, যা সামান্যকারণেই অশান্তি বোধ করে। উর্ণাতন্তু, আর্থাৎ মাকড়সার জাল চোখের ভিতর পড়লে তা পীড়া দেয়, তবে তা শরীরের অন্য কোন অঙ্গে, যেমন হাত, পা ইত্যাদিতে পড়লে পীড়াদায়ক হয় না। এই উপমার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিবেকীব্যক্তির চিত্ত নেত্রগোলকের মতো স্পর্শকাতর হওয়ায় উক্ত প্রকার অনাগত দুঃখ সমুদায় তাঁদেরই পীড়ার কারণ হয়; কিন্তু সাধারণ লোকের স্থূল চিত্ত ঐ দুঃখে কষ্টবোধ করেনা। বরং এইসব সাধারণ লোক নিজেদের সম্পাদিত

কর্মের ফলস্বরূপ বারবার দুঃখ ভোগ করে সংস্কারকে নিঃশেষ করে এবং ত্যাগ করে পুনরায় সঞ্চয় করে। এইভাবে অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্র চিত্তভূমিতে অবস্থিত যে অবিদ্যা, তার দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে থাকে; ফলতঃ পুত্রকলত্রাদি বিষয় ত্যাজ্য হলেও তাতে অহংকার ও মমকার অর্থাৎ 'আমার' বলে বোধ করে সাধারণ লোকেরা নিজ নিজ কর্মের দ্বারা উপার্জিত দুঃখ বারংবার ভোগ করে ত্যাগ করে এবং ত্যাগ করে গ্রহণ করে এবং ফলতঃ বার বার জন্মগ্রহণ করে। আর, জন্মগ্রহণ করার ফলে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উপায়সাধ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক - এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অনুপ্লাবিত হয়। এই কারণে বিবেকী ব্যক্তিগণ নিজেকে ও অপরাপর জীবকে অনাদি দুঃখস্রোতে প্লাবিত দেখে দুঃখের ক্ষয়ের কারণস্বরূপ সম্যকদর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকেই রক্ষক রূপে তাতে শরণ নেন।

বিবেকী যোগীর কাছে পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখের কারণেই যে সুখভোগ হেয়, তা নয়; বরং গুণবৃত্তিবিরোধজনিত কারণে বিষয় সুখভোগের স্বাভাবিক দুঃখতা থাকায় সুখও বিবেকীগণের কাছে দুঃখরূপে প্রতীত হয়। গুণবৃত্তিবিরোধ হেতুক দুঃখ বলতে কী বোঝায় তা এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতির সকল পরিণামের মধ্যেই বিদ্যমান। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতেও যে এই গুণত্রয় অবস্থান করবে, তা বলাই বাহুল্য। সাংখ্যদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রখ্যা বা প্রকাশ; রজঃ গুণ প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া উৎপন্ন করে; আর তমোগুণ হল আবরক। এরা সর্বদাই একটি অপরটির সাহায্য গ্রহণ করে বুদ্ধিতে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করে। কারণ, গুণগুলি স্থির নয়; সদা পরিণামশীল। ফলতঃ গুণত্রয়ের কার্যবুদ্ধিও নিয়ত পরিণত হয়ে থাকে; অর্থাৎ বিষরাকারে বুদ্ধির সর্বদা বৃত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং, বুদ্ধিতে প্রতিক্ষণেই এই ত্রিগুণের বৃত্তির অর্থাৎ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় - এই প্রত্যয়ের বিরোধ চলতে থাকে। এই প্রকার বিরোধ বা সংঘর্ষের ফলে নিয়ত

সুখভোগকালেও সূক্ষ্মভাবে দুঃখের অনুভব হয়। ভাষ্যকার এখানে চিত্তের অষ্টপ্রকার রূপের কথা বলেছেন।[১০৪] সেগুলি হল, ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য। এই আটটি রূপ বা ভাব বুদ্ধির ধর্ম। আর বুদ্ধির বৃত্তির তিনটি - শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। এই সকল রূপ বা বৃত্তি নিজের বিপরীত রূপ বা বৃত্তির সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে। অর্থাৎ ধর্ম অভিব্যক্ত হয় তখন তা অধর্মকে অভিভূত করে। একটির অপ্রবলরূপ বা সামান্য অপরটির অতিশয় বা প্রবলরূপের সাথে প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ একটির অতিশয়রূপের সাথে অপরটির অতিশয়রূপের বিরোধ থাকলেও একের সামান্যের সাথে অপরের অতিশয়ের বিরোধ থাকে না। ফলতঃ অতিশয় ধর্মের সাথে সামান্য অধর্ম থাকতে পারে; আবার, অতিশয় শান্তবৃত্তির সাথে সামান্য ঘোর বা মূঢ়বৃত্তি অবস্থান করতে পারে। এইভাবে গুণত্রয়ের পরস্পরের সাথে মিশ্রণের দ্বারা সুখ, দুঃখ ও মোহজ্ঞান উৎপাদন করে। সুতরাং, সকল প্রত্যয়ই সকলরূপ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃরূপ হয়। তবে, তাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক - এই প্রকার বিশেষণের জন্য এক-একটি প্রত্যয় কোন একটি বিশেষ গুণের প্রাধান্য থেকে হয়। অর্থাৎ কোন একটি গুণের প্রাধান্য এবং অপরটির ন্যূনতারূপ বিশেষ থাকায় 'এটি সুখ', 'এটি দুঃখ', 'এটি মোহ' - এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যবহার হয়ে থাকে। এই কারণে কোনটিই কেবল সুখাত্মক হতে পারে না (সত্ত্বের প্রাধান্যবশতঃ সুখ বলে মনে হয়) বলে বিবেকীযোগীর কাছে বিষয় মাত্রই দুঃখ।

---

[১০৪] যোগসূত্রভাষ্য ২।১৫।।

পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা দর্শনে দুঃখ ঃ

বেদ প্রমাণ কি না - এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এই বেদ কী? চতুর্বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেছেন, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য অলৌকিক উপায় সকলকে বিজ্ঞপিত করে যে গ্রন্থ তাকেই বেদ বলে।[১০৫] আবার, বিভিন্ন উপনিষদ্ বেদকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন, অক্ষর পরব্রহ্মাশ্রিত (৪।৮)। বেদ অক্ষরের সমাহার। অতএব, বেদ হল পরব্রহ্মাশ্রিত। অনাদি অনন্ত অলৌকিক নিত্য শব্দরাশি ও নিত্য জ্ঞানরাশিই বেদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেছেন, মহাপ্রলয়ের পর নবকল্পের আরম্ভে পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসের মতোই তাঁর থেকে বিনা প্রযত্নে যা অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তাই বেদ। যাইহোক, বেদ কী - এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও বেদের অন্যতম ভাগ উপনিষদ্-কে যে বেদান্ত বলে, তা নিয়ে মতানৈক্য নেই। বেদান্ত অর্থাৎ বেদের অন্তভাগ। অভ্যুদয়কামী ব্যক্তিগণের জন্য কর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের আলোচনা শেষ করে বেদের অন্তভাগ জুড়ে রয়েছে উপনিষদ্ সমূহ; এই কারণেই তা 'বেদান্ত' নামে অভিহিত। এই উপনিষদ্ সকলকে বেদের জ্ঞানকাণ্ডও বলে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক অপর অংশই কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের বিচারের জন্যই পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের আবির্ভাব। নিরুপপদ 'মীমাংসা' শব্দের দ্বারা এই পূর্ব-মীমাংসা দর্শনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে ব্রাহ্মণভাগের উপরই মীমাংসা দর্শন বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। যেহেতু মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু এই মীমাংসা দর্শনে যাগযজ্ঞাদির আলোচনাই মুখ্য। এই কারণে জীব, জগৎ, পরলোক, পরমাত্মা ইত্যাদি দার্শনিক আলোচনা এই দর্শনে খুবই কম। তাই

---

[১০৫] "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ ৰেদয়তি সঃ ৰেদঃ।" - ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সায়ণভাষ্য

স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, এই দর্শনে দুঃখ, মুক্তি ইত্যাদির আলোচনা নেই। কিন্তু তা মনে করা সঙ্গত হবে না; কারণ, মুক্তিই সকল দর্শনের প্রযোজক। সবরকমের দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই হল মুক্তি। কাজেই, মুক্তি প্রসঙ্গে দুঃখের আলোচনাও স্বাভাবিক। জন্ম মানেই দুঃখ। জীবাত্মা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন না হলেও শরীরের সাথে জীবাত্মার বিশেষ সম্বন্ধকেই জন্ম বলে এবং এই বিশেষ সম্বন্ধের ধ্বংসই হল মৃত্যু। জীবাত্মার বারবার শরীর গ্রহণ এবং মৃত্যুবরণই হল সংসার। সংসার তথা সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। মীমাংসকগণের মতে সংসার মিথ্যা নয়, কারণ তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি জীবাত্মার গুণ। জীবাত্মা শরীরাদি থেকে পৃথক এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অস্তিত্ব নেই; সুখ মাত্রই দুঃখমিশ্রিত হওয়ায় সুখ দুঃখের মধ্যেই পরিগণিত হয়। এই দুঃখই হল বন্ধন। বন্ধন আছে বলেই মুক্তির প্রশ্ন ওঠে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে কাম মানুষকে সুখ দিতে পারলেও তা ক্ষণিকের; মোক্ষ হল সকল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ; অর্থ সুখসাধন; বাকি রইল ধর্ম। ধর্ম সুখের দূরস্থ। চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্মের স্থান প্রথম; অর্থাৎ অর্থাদি পুরুষার্থত্রয়ের মূলভূত হল এই ধর্ম। ধর্মের নিরূপণই মীমাংসা শাস্ত্রের বিষয়। বেদবোধিত কর্মকেই মীমাংসাদর্শন ধর্ম বলেছেন। মীমাংসা দর্শনে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি ভেদে নানা ধরনের যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপ কর্ম বর্নিত হয়েছে। এই সকল ক্রিয়াকলাপ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কামীগণের জন্য হলেও যাঁরা মোক্ষার্থী তাঁদের জন্যও এই সকল কর্মকলাপ সহায়ক হয়ে থাকে; কারণ, বেদের কর্মকাণ্ডে বর্ণিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, যার বিচার মীমাংসা দর্শনের বিষয়, তা নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং বিবিদিষা তথা ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা উৎপন্ন করে মোক্ষার্থীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক হয়ে থাকে। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় হল জ্ঞানকাণ্ড। মোক্ষার্থী বা মোক্ষকামীগণ, যাঁরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

সুখভোগে বিতৃষ্ণ হয়েছেন, তাঁদের জন্য জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে চিত্তের একাগ্রতা ও ক্রমমুক্তির উপায়ের অন্তর্গত নানাবিধ উপাসনা; এ ছাড়া বিদেহমুক্তির জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান আলোচিত হওয়ায় উপনিষদ্ সকলকে অর্থাৎ বেদান্তকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়ে থাকে।

ভগবান বেদব্যাস বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অর্থবিচারের জন্য এবং সকল বেদ বিরুদ্ধ মতবাদের নিরাকরণ বা খণ্ডন করার জন্য উত্তরমীমাংসা দর্শন রচনা করেছেন, যা শারীরকমীমাংসা, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, বেদান্তসূত্র, বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মমীমাংসা, চতুঃসূত্রী - এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন ভাষ্যকার ভিন্ন ভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তার ফলেই অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক মতের প্রবক্তাই তাঁদের নিজের মতো করে ব্রহ্মের স্বরূপ, মোক্ষের স্বরূপ, জীব ও জগতের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বেদান্তদর্শনের উক্ত শাখাগুলিতে দুঃখ সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে, তা আলোচনাসাপেক্ষ।

অদ্বৈতবাদ ঃ

অদ্বৈতবাদ হল এমন একটি মতবাদ যেখানে শ্রুতির অর্থবিচার, সমর্থন ও ব্যাখ্যার জন্য শ্রুতি মাত্রকেই অনুসরণ ক'রে কেবল এবং কেবলমাত্র নিরাকার, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। সর্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অপর কোন সত্তার পারমার্থিক সত্তা এই মতবাদে স্বীকৃত না হওয়ায় এই মতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদ'-ও বলা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম বিভাগযুক্ত হলে তা দ্বৈত হয়ে পড়ে; তাই এই সর্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে

সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ বর্জিত বলা হয়েছে। দু'টি একই জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে ভেদ, তা হল সজাতীয় ভেদ; যেমন, একটি মানুষের থেকে অপর মানুষের, অথবা একটি আম্রবৃক্ষের থেকে অপর আম্রবৃক্ষের যে ভেদ, তা হল এই প্রকার সজাতীয় ভেদ। দু'টি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে ভেদকে বলে বিজাতীয় ভেদ; যেমন, একটি বৃক্ষের থেকে মানুষের ভেদই হল বিজাতীয় ভেদ। আর, একই বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ, তা হল স্বগত ভেদ; যেমন, একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদির মধ্যে যে ভেদ আছে, তাকে বলে স্বগত ভেদ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অদ্বৈত হওয়ায় ব্রহ্ম সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীন। ব্রহ্ম নিরংশ বা নিরবয়ব হওয়ায় ব্রহ্মের স্বগতভেদও নেই। শঙ্করাচার্য শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রে ব্রহ্মসূত্রের যে শারীরকভাষ্য রচনা করেন, তাতে তিনি অদ্বৈতবাদেরই প্রচার করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে যে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।'[১০৬] এই বক্তব্যের মাধ্যমে সর্বপ্রকার ভেদের নিন্দা করা হয়েছে এবং ব্রহ্মে পরমার্থতঃ নানাত্বের নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ব্রহ্মে সকল প্রকার ভেদের নিষেধ বোঝাতে বলেছেন, 'তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূৰ্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।'[১০৭] অর্থাৎ এই সেই ব্রহ্ম, যা পূর্ববিহীন তথা যার কোন কারণ নেই, যা পরবিহীন অর্থাৎ কার্যবিহীন বা নিষ্ক্রিয়, যা অনন্তর অর্থাৎ স্বগতভেদবিহীন, এবং অবাহ্য তথা সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন।

এই ব্রহ্ম, যা অদ্বৈতবাদের একমাত্র সত্তা, তার স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন উপনিষদ্ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে, 'অদৃশ্যম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্

---

[১০৬] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।১৯।।

[১০৭] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৫।১৯।।

অলক্ষণম্।'[১০৮] কেনোপনিষদ্ বলেছেন, 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন ৰাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।'[১০৯] মুণ্ডক উপনিষদ্-এ উল্লিখিত হয়েছে যে, 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি ৰাচা।'[১১০] অর্থাৎ সর্বত্রই একথাই বোঝানো হয়েছে যে, ব্রহ্ম বাক্য, মনের অগোচর, অদৃশ্য হওয়ায় তার লক্ষণ নিরূপণ সম্ভব নয়।

তবে, ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ সম্ভব। ব্রহ্ম হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'[১১১] এটিই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। যা বস্তুর স্বরূপবোধক এবং অন্য বস্তু থেকে তার ব্যবর্তক, তাকেই বলে স্বরূপলক্ষণ।[১১২] 'স্বরূপং সৎ ৰ্যাৰর্ত্তকম্' - এটিই স্বরূপলক্ষণের লক্ষণ।[১১৩] অর্থাৎ যা বস্তুর স্বরূপ হয়ে অন্য বস্তু থেকে সেই বস্তুকে পৃথক করে বোঝায়, তাই হল স্বরূপলক্ষণ।

আবার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[১১৪] এই সূত্রার্থ ব্যাখ্যার আগে বলা প্রয়োজন যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-এ উল্লিখিত একটি বাক্য এই সূত্রের বিষয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন, 'যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।'[১১৫] অর্থাৎ যাঁর থেকে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, তাই ব্রহ্ম। এখানে 'জন্মগ্রহণ' বলতে জন্ম, স্থিতি ও লয় বোঝায়। পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, ব্রহ্মের থেকে ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে - উপনিষদ্-এর এই বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও নাশ জগতকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে; তাই ব্রহ্মের সাথে জন্মাদির কোন সম্বন্ধ নেই। এইপ্রকার পূর্বপক্ষকে

[১০৮] মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ৭।।

[১০৯] কেনোপনিষদ্ ১।১।৩

[১১০] মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৮।।

[১১১] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।৩।।

[১১২] সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৬।

[১১৩] বেদান্তদর্শনম্, সম্পাদিত - স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, ১ম অধ্যায়, পৃ - ৯৭।

[১১৪] ব্রহ্মসূত্র ১।১।২।।

[১১৫] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১।।

খণ্ডন করার জন্য সিদ্ধান্তী বেদান্তী অর্থাৎ শঙ্করাচার্য তাঁর শারীরকভাষ্যে বলেছেন যে, জন্ম, স্থিতি ও লয় জগতকে আশ্রয় করে থাকে - এইকথা ঠিক। তবে, যখন পুষ্পমাল্যে আমাদের সর্প ভ্রম হয়, তখন সর্পরূপে যা প্রতিভাত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে পুষ্পমাল্য। এক্ষেত্রে কল্পিত সর্পত্ব পুষ্পমাল্যের ধর্ম না হলেও তার পরিচায়ক হয়ে থাকে, অর্থাৎ সর্পত্ব পুষ্পমাল্যের লক্ষণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, কল্পিত জগত-কারণতা ব্রহ্মের ধর্ম না হলেও তা ব্রহ্মের লক্ষণ হয়। এইভাবে প্রদত্ত লক্ষণকে তটস্থ লক্ষণ বলে। তটস্থ লক্ষণের লক্ষণে বলা হয় যে, 'যাৰল্লক্ষ্যকালমনৰস্থিতত্বে সতি ৰ্যাৰর্ত্তকত্বম্।'[১১৬] অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু যতকাল থাকে, ততকাল তার সাথে না থেকেও যা লক্ষ্যবস্তুকে অন্য বস্তু থেকে পৃথকভাবে বোধ করায় বা ব্যাবৃত্ত করে, তাই হল তটস্থ লক্ষণ।। উক্তক্ষেত্রে কল্পিত জগতের কর্তৃত্ব পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মে না থাকলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণত্বরূপ লক্ষণটি ব্রহ্মকে অন্য বস্তু থেকে ব্যাবৃত্ত করে। এই কারণে জগজ্জন্মাদিকারণত্ব হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্মসূত্রকার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[১১৭]- এই সূত্রের মাধ্যমে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণই প্রদান করেছেন। সুতরাং, নাম ও রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত এই যে জগৎ, যা অনেক কর্তা ও ভোক্তার সাথে সংযুক্ত, যা দেশ-কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয়, যার রচনার স্বরূপ মনের দ্বারা চিন্তাও করা যায় না , তার জন্ম-স্থিতি ও নাশ যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন কারণ থেকে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।[১১৮]

---

[১১৬] বেদান্তদর্শনম্, সম্পাদিত - স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, ১ম অধ্যায়, পৃ - ৯৭।

[১১৭] ব্রহ্মসূত্র ১।১।২।।

[১১৮] 'অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ৰ্যাকৃতস্য অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভৰতি, তৎ ব্রহ্ম ইতি ৰাক্যশেষঃ।' - ১।১।২-এর শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তদর্শনম্, সম্পাদিত - স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, ১ম অধ্যায়, পৃ - ১০১।

এখানে প্রশ্ন যে, ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিকারণত্ব যে স্বীকার করা হয়েছে, এক্ষেত্রে ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতা স্বীকৃত অথবা উপাদানকারণতা? উত্তর হল যে, ব্রহ্মসূত্রকার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' - এই সূত্রের মাধ্যমে ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্তকারণরূপে প্রতিপাদন করলেও ব্রহ্মকে তিনি উপাদানকারণরূপে প্রতিপাদন করতেও বিরত থাকেননি। ব্রহ্মসূত্রকার বলেছেন, 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।।'[১১৯] এই সূত্রের দ্বারা তিনি প্রতিপাদন করেন যে, ব্রহ্ম জগতের মাত্র নিমিত্তকারণ নয়, তা উপাদানকারণও বটে।

পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্মের একইসাথে কীভাবে জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ হওয়া সম্ভব? কারণ, একই বস্তুর কৃতিমত্ত্ব এবং কৃতিবিষয়ত্ব - যুগপৎ থাকতে পারেনা। 'কৃতিমত্ত্ব' বলতে বোঝায় কর্তৃত্ব অর্থাৎ প্রযত্নের আশ্রয় হওয়া, যা নিমিত্তকারণে থাকে। আর, 'কৃতিবিষয়ত্ব' বলতে বোঝায় কর্মত্ব অর্থাৎ প্রযত্নের বিষয় হওয়া, যা উপাদানকারণে বিদ্যমান থাকে। এই উভয়ে বিরুদ্ধ ধর্ম। এইরূপ সংশয় হলে, ব্রহ্মসূত্রকার বলেছেন, 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।'[১২০] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে, 'তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুতে।'[১২১] অর্থাৎ 'তিনি (ব্রহ্ম) নিজেই নিজেকে এইরূপ করেছিলেন।' এই শ্রুতিবাক্যে একইসাথে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা এবং নিমিত্তকারণতা স্বীকার করা হয়েছে। 'আত্মানম্' অর্থাৎ 'নিজেকে' - এইরূপে দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা প্রযত্ন বা কৃতিবিষয়ত্ব অর্থাৎ কর্মত্ব বা উপাদানতা বোঝা যায়; আবার, 'স্বয়ম্ অকুরুত' অর্থাৎ 'নিজেই করেছিলেন' - এর দ্বারা কৃতিমত্ত্ব বা কর্তৃত্ব বা প্রযত্নের আশ্রয় বোঝায়। এইভাবে ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব এবং নিমিত্তকারণত্ব উভয়ই সিদ্ধ হয়, কারণ উভয় প্রকার কারণতা ব্রহ্মে অবিরুদ্ধ। এই শ্রুতিবাক্যকে বিষয় করেই ব্রহ্মসূত্রকার উক্ত সূত্র

---

[১১৯] ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩।।

[১২০] ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৬।।

[১২১] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৭।।

বলেছেন। সূত্রস্থ ‘আত্মকৃতেঃ’ বলতে বোঝায় আত্মসম্বন্ধিনী কৃতি বা প্রযত্ন। এই প্রকার কৃতি বা প্রযত্ন আত্মসম্বন্ধিনী কেন? কারণ, এই প্রকার কৃতির প্রতি আত্মার বিষয়তা ও আশ্রয়তা - উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আত্মা হলেন ঐ কৃতির বিষয়ভূত কর্ম, তথা উপাদানকারণ, এবং একইসাথে আত্মা ঐ প্রযত্নের আশ্রয়ভূত কর্তা, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। কিন্তু আগেই ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’ - এই ব্রহ্মসূত্র যে ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ, অর্থাৎ কর্তৃরূপে সিদ্ধ, তা কীভাবে প্রযত্নের বিষয় বা উপাদান কারণ হবেন? এখানেই সূত্রস্থ ‘পরিমাণাৎ’ শব্দের যথার্থতা প্রতিপাদিত হয়। এখানে পরিণাম বলতে বিবর্ত বোঝায়। অর্থাৎ এখানে ‘পরিণাম’ শব্দের দ্বারা প্রকৃত পরিণাম বিবক্ষিত নয়। দুগ্ধের দধিরূপে যে পরিণাম, তা হল প্রকৃত পরিণাম। সৎকার্যবাদী যোগ ও সাংখ্য দার্শনিকগণ এই প্রকার পরিণাম স্বীকার করেছেন। এই প্রকার পরিণামে ধর্মীর পূর্বধর্ম নিবৃত্ত হয় এবং নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ দুগ্ধ যখন দধিতে পরিণামপ্রাপ্ত হয়, তখন দুগ্ধের যে ধর্ম, তার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে এবং দধিতে নতুন ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে।[১২২]

তবে, ব্রহ্ম যখন জগৎ-রূপে বিবর্তিত হন, তখন তা উক্ত প্রকার পরিণাম নয়। আমাদের যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন সিদ্ধবস্তু শুক্তি রজতরূপে বিবর্ত হয় মাত্র। অর্থাৎ ‘বিবর্ত’ বলতে প্রকৃত পরিণাম বোঝায় না, বোঝায় প্রতিভাত হওয়া মাত্র। অনুরূপভাবে, সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মও জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন অর্থাৎ বিবর্তিত হন। ব্রহ্মের এই জগৎ-রূপে বিবর্তিত হওয়াকেই ‘প্রযত্নের বিষয় হওয়া’ বা ‘উপাদানকারণ হওয়া’ বলা হয়েছে। এইভাবে নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎ-রূপে বিবর্তিত হন বলে তিনি হলেন জগতের বিবর্তোপাদান কারণ।

---

[১২২] ‘অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ’ - যোগসূত্রভাষ্য ৩। ১৩।

যাই হোক, উক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হল যে, ব্রহ্ম জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম কালে শুক্তিই রজতরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং, একথা বলাই যায় যে, অদ্বৈতবাদ অনুসারে, জগতের যে জ্ঞান হয়, তা একপ্রকার ভ্রম। বস্তুতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কূটস্থনিত্য, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, স্বয়ংপ্রকাশ, ধর্মাধর্মাতীত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রহ্ম হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই নিজের মায়া নামক শক্তির প্রভাবে সগুণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সাকার রূপে অঙ্গীকৃত হন। এই সগুণ ব্রহ্মই জীবের কর্মফলদাতা। সুতরাং, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের কারণ হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগতের জ্ঞান মিথ্যা, তা একপ্রকার ভ্রম, ব্রহ্মই একমাত্র এবং অদ্বৈত সত্তা।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে, মায়া কী? মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, অক্ষর, অব্যক্ত, প্রকৃতি, অধ্যাস ইত্যাদি হল পর্য্যায় শব্দ। এই মায়া হল ব্রহ্মের শক্তি। এই শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রতিভাত হন। অর্থাৎ মায়াই হল জগৎ প্রপঞ্চের পরিণামী বীজস্বরূপ। মায়া অনির্বচনীয়। শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলেছেন,

'অৰ্যাক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈৰ মায়া যয়া জগৎ সৰ্বমিদং প্রসূয়তে।।'[১২৩]

অর্থাৎ 'মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। তাকে অব্যক্তও বলা হয়। তা আদিরহিত অর্থাৎ অনাদি; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণসমন্বিত এবং কারণরূপা। সৃষ্টিরূপ কার্য থেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি এই মায়ার অনুমান করতে পারেন। এই মায়া থেকেই এই সকল জগৎ উৎপন্ন হয়। পরবর্তী শ্লোকেই মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করতে তিনি বলেছেন,

---

[১২৩] বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক- ১০৮।

'সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকানো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতাহনির্বচনীয়রূপা।।'[১২৪]

অর্থাৎ সেই মায়া বা অবিদ্য কেমন তা নিরূপণ করা যায় না; কারণ, মায়াকে সত্য বা সৎ অথবা মিথ্যা বা অসৎ কোনটাই বলা যায় না। মায়া সৎ নয়; কারণ যদি মায়া সৎ হত তাহলে কোনভাবেই তার নাশ সম্ভব হত না; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মায়ার নাশ হওয়ায় মায়া সৎ নয়। আবার, মায়া অসৎ-ও নয়; কারণ যা অসৎ তার কার্য থাকতে পারে না। কিন্তু মায়ার কার্য আছে; জগৎ হল মায়ার কার্য। মায়া যদি মিথ্যা হত, তাহলে তা থেকে কোনকিছু উৎপন্ন হতে পারত না; যেমন, বন্ধ্যাপুত্র কখনই বন্ধ্যার সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না। আবার, মায়া একইসাথে সত্য ও মিথ্যা উভয়রূপা হতে পারে না; কারণ, যা সত্য তা মিথ্যা নয়; যা মিথ্যা তা সত্য নয়; অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় তারা উভয়ে একইসাথে থাকতে পারে না। মায়া ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন অতিরিক্ত সত্তা নয়, আবার তা ব্রহ্মের সাথে অভিন্নও নয়। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তা না থাকায় মায়া ব্রহ্ম ভিন্ন হতে পারে না। আর, মায়ার বিকার অর্থাৎ কার্য থাকায় তা নির্বিকার ব্রহ্মের সাথে অভিন্নও নয়।

আবার, মায়া একইকালে ব্রহ্মের সাথে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন - একথাও বলা যায় না; কারণ, ভেদ ও অভেদ পরস্পরের বিরুদ্ধ ধর্ম, যাদের একত্র সমাবেশ সম্ভব নয়। মায়ার কোন অঙ্গ আছে বা নেই - কোনটাই বলা যায় না; কারণ, মায়ার অঙ্গ থাকলে তা দৃষ্টিগোচর হত। আর, মায়া অঙ্গ বা অবয়ব থাকার জন্যই তা অবয়ববিশিষ্ট এই জগতের কারণ (কারণের গুণ কার্যে থাকে - এই নিয়মানুসারে)। আবার, মায়া অবয়ববিশিষ্ট এবং অংশবিহীন - একথাও বলা যায় না, যেহেতু তা স্ববিরোধী উক্তি। কাজেই, মায়া হল অতি অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়।

---

[১২৪] বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক-১০৯।

মায়া শক্তির প্রভাবে জগতের যে ভ্রম, তাকেই অধ্যাস বলে।[১২৫] অর্থাৎ যে বস্তুটি যে রূপ নয়, তাকে সেইরূপে বোঝাই হল অধ্যাস। অধ্যাস, অবিদ্যা, অজ্ঞান ইত্যাদি পর্যায়শব্দ। এই অধ্যাস অনাদি, অনন্ত, নৈসর্গিক, মিথ্যাজ্ঞানরূপা বা অনির্বচনীয়, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রবর্তক, সকল লোকের প্রত্যক্ষ।[১২৬] এই অধ্যাসের কারণেই ব্রহ্ম ও আত্মার বা জীবের মধ্যে অভেদ বা একত্বের উপলব্ধি হয় না।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে যে, মায়া এবং অধ্যাস - এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? শঙ্করাচার্য মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, অধ্যাস প্রভৃতি শব্দকে সমার্থকরূপে প্রয়োগ করলেও মায়া ও অধ্যাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা এবং তদ্ব্যতীত অপর কোন সত্তা স্বীকৃত হয়নি। এই দর্শন অনুসারে, জগৎ মিথ্যা। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করার জন্য শঙ্করাচার্য ব্রহ্মের যে শক্তি স্বীকার করেছেন, তাই হল মায়া। অঘটন-ঘটনপটীয়সী এই মায়া শক্তই ব্রহ্মকে আবৃত করে তাঁর উপর জগৎ প্রপঞ্চকে আরোপ করে। এই মায়া হল ব্রহ্মের উপাধি। অপরদিকে, অধ্যাস হল একপ্রকার ভ্রম। জগৎ মিথ্যা বা মায়া হলেও সেই জগতকে সত্য বলে যে জ্ঞান জীবের হয়, তা আমাদের অনুভবসিদ্ধ। জগতের এই জ্ঞান হল একপ্রকার ভ্রমজ্ঞান, যার পারিভাষিক নাম হল অধ্যাস। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য বলেছেন, অধ্যাসরূপ দোষ থেকেই জীবের তথা অবিবেকী পুরুষের জন্ম-মরণাদি দুঃখপ্রাপ্তি হয়। আর জীবের এই অধ্যাসরূপ বন্ধন মনের দ্বারাই

---

[১২৫] ''অধ্যাসঃ নাম ''অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'' ইতি অৰোচাম্'' - ১।১।১। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমবর্ণকের শাঙ্করভাষ্য, ৩৯ সংখ্যক বাক্য, বেদান্তদর্শনম্, সম্পাদিত - স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, ১ম অধ্যায়, পৃ-৫৯-৬০।

[১২৬] 'এৰম্ অয়ম্ অনাদিঃ অনন্তঃ নৈসর্গিকঃ অধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রৰর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।' - ১।১।১। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমবর্ণকের শাঙ্করভাষ্য, ৩৯ সংখ্যক বাক্য, তদেব, পৃ-৬১-৬২।

কল্পিত হয়। এই মনই রজঃ ও তমঃ গুণের বশীভূত এবং বিচারহীন পুরুষের জন্মাদি দুঃখপ্রাপ্তির কারণ।[১২৭] কাজেই, অধ্যাস অবিবেকী পুরুষের মনের সৃষ্টি। যে বস্তুটি যা নয়, তাকে তা মনে করার নামই হল অধ্যাস। এখানেই মায়া এবং অধ্যাসের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকটি লুকিয়ে আছে। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। যাদুকর তার ঐন্দ্রজালিক শক্তির মাধ্যমে দর্শকদের মনে ভ্রমের সৃষ্টি করলেও তা আদপে সত্য নয়, তা হলো আসলে ঐ যাদুশক্তির প্রভাব। অনুরূপভাবে, ব্রহ্ম হলেন সেই যাদুকর, যাঁর ঐন্দ্রজালিক শক্তি হল মায়া। এই মায়ার প্রভাবে অবিবেকী পুরুষ জগৎ-প্রপঞ্চকে সত্য বলে মনে করে। জগৎ-কে সত্য বলে এই বোধই হল অধ্যাসরূপ ভ্রমজ্ঞান।

প্রসঙ্গতঃ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, জগৎ কী অর্থে মিথ্যা? যে জগৎ আমাদের কাছে অত্যন্ত সৎ বলে প্রতীত হয়, অদ্বৈতবাদীগণ সেই জগতকে মিথ্যা বলে ব্রহ্মেরই অদ্বৈত সত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সত্তা সম্পর্কে অদ্বৈতবাদীগণের মত উল্লেখ করা প্রয়োজন। শঙ্কর ত্রিবিধ সত্তা স্বীকার করেছেন ঃ পারমার্থিক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তা। যা কালত্রয়ে অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত - কোন কালেই বাধিত হয় না, তা হল পারমার্থিক সৎ; যেমন, ব্রহ্ম ত্রিকালে অবাধিত, তাই ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আছে। দ্বিতীয় হল ব্যাবহারিক সত্তা। যা ব্যবহারকালে অবাধিত হলেও ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, তা ব্যাবহারিক সৎ। জগৎ , জীব এবং ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্তা আছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে জগতের বাধ হয় না। বস্তুতঃ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান। কিন্তু ব্যবহারকালে অধিষ্ঠানরূপ সেই সৎ ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না এবং জগতকে অত্যন্ত

[১২৭] 'অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিরধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনঃ জন্মাদিদুঃখস্যনিদানমেতৎ।।' - বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ১৭৯।

সৎ বলেই মনে হয়। তবে, ব্রহ্মজ্ঞান একবার হলে তখন আর জগতের কোন অস্তিত্ব থাকেনা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জগৎ বাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অপর কোন জ্ঞানের দ্বারা জগতের বাধ হয় না; তাই ব্যবহারকালে জগৎ অবাধিত থাকে। এই কারণে জগৎ ব্যবহারিক সৎ। বাকি রইল প্রাতিভাসিক সৎ। যা প্রতীতিকালে অবাধিত হলেও ব্রহ্মভিন্ন যে কোন বিরোধী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অর্থাৎ ব্যবহার দশায় বাধিত হয়, তাই হল প্রাতিভাসিক সৎ। শুক্তিতে রজতভ্রম কালে শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয় এবং সেই রজতের জ্ঞান শুক্তিজ্ঞানের (যা ব্রহ্মভিন্নজ্ঞান) দ্বারা বাধিত হয়। তাই শুক্তি-রজত প্রাতিভাসিক সৎ।

যাই হোক, উক্তভাবে সত্তার ত্রৈবিধ্য আলোচনার পর মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। প্রশ্নটি ছিল যে, জগৎ কোন্ অর্থে মিথ্যা? বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য বলেছেন, জগৎ যদি সত্য হত তাহলে সুষুপ্তি কালেও তার উপলব্ধি হত; কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মতোই জগৎ মিথ্যা।[১২৮] অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নভাবে জগতের কোন অতিরিক্ত বা স্বতন্ত্র সত্তা নেই। জগতের পৃথক সত্তার যে অনুভব আমাদের হয়, তা গুণীতে আরোপিত গুণের মতো মিথ্যা। অর্থাৎ গুণের তো কোন সত্তা নেই; কারণ, অদ্বৈত মতে, ব্রহ্মভিন্ন অপর কোন সত্তাই তো নেই। জীবের ভ্রমবশতঃই অধিষ্ঠান ব্রহ্ম আরোপিত বস্তু অর্থাৎ জগতরূপে প্রকাশ পায়।[১২৯] কাজেই, মিথ্যা বস্তু না থাকলেও তাকে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। যেমন, আকাশের কোন আকার বা বর্ণ কিছুই নেই। তবুও আমরা আকাশকে গামলার মতো আকারযুক্ত এবং নীলবর্ণবিশিষ্ট বলে মনে করি। ঠিক একইভাবে আত্মা তথা ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত হয়।

---

[১২৮] 'যদি সত্যং ভৱেদ্ ৱিশ্বং সুসুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎস্বপ্নৱন্মৃষা।।' - বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ২৩৪।

[১২৯] 'অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ পৃথক্প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাদিৱৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থৱত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ।।' - বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ২৩৫।

অধিষ্ঠানস্বরূপ আকাশে আরোপিত নীলত্ব প্রভৃতি গুণ যেমন মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ-ও সেরকম মিথ্যা। আবার, অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্প কোন কালেই ছিল না বা থাকবেও না। কিন্তু রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রম হয়, তখন সর্পের গতি, দংশন সামর্থ্য প্রভৃতি সকল গুণ রজ্জুতে আরোপিত হয়। যতক্ষণ রজ্জুকে সর্প বলে মনে হয় অর্থাৎ যতক্ষণ 'এটি রজ্জু, সর্প নয়' - এইরূপ যথার্থ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভয় এবং ঐ ভয়জনিত দুঃখ আমাদের পেতে হয়। সুতরাং, যথার্থ জ্ঞানের অভাববশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়; কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে সর্পভয় আর থাকে না। একইভাবে, ব্রহ্মের স্বরূপ জানলে জগৎ, যা মায়া সৃষ্ট, তা আর থাকে না।

যাই হোক, মায়াসৃষ্ট জগতের প্রতিটি বিষয়ই সুখ, দুঃখ ও মোহের উৎপাদক। তার কারণ হল মায়া নিজে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - ত্রিবিধ গুণাত্মিকা। আর এই তিন গুণই যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহের উৎপাদকরূপে পরিচিত। মায়ার দ্বিবিধ শক্তি আছে; যথা, আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। মায়ার তমোগুণ থেকে আবরণ শক্তি এবং রজঃ গুণ থেকে বিক্ষেপ শক্তি উৎপন্ন হয়। আবরণ শক্তি বস্তুর স্বরূপকে ঢেকে রাখে। মায়া তার আবরণ শক্তির প্রভাবে বদ্ধ জীবরূপী দ্রষ্টার দৃষ্টিতে ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করে রাখে, ঠিক যেমন স্বল্পপরিসর মেঘমণ্ডল বহুযোজন বিস্তৃত সূর্যকে দ্রষ্টার দৃষ্টি থাকে আবৃত করে। অর্থাৎ আবরণ শক্তির মাধ্যমে বস্তুটি যা নয়, সেইরূপে প্রকাশ পায়। এর প্রভাবেই বদ্ধ জীব আত্মা ও অনাত্মাকে একাকার করে ফেলে। অপরদিকে, বিক্ষেপশক্তি রজঃ গুণ থেকে উৎপন্ন হয়। রজঃ গুণের প্রভাবে বিক্ষেপ শক্তি ক্রিয়াত্মক হওয়ায় তার প্রভাবেই অনন্তকাল ধরে বিষয়প্রবৃত্ত প্রবাহাকারে চলে আসছে। অর্থাৎ জীবের বিষয়াসক্তি ইত্যাদি এবং সুখ-দুঃখাদি মনের বিকারসমূহ বিক্ষেপ শক্তি থেকেই নির্গত হচ্ছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ইত্যাদি, অসূয়া, অহংকার, ঈর্ষা, মাৎসর্য প্রভৃতি

দুঃখদায়ক এবং জীবের বারবার সংসারদশা প্রাপ্তির কারণভূত বৃত্তিসকল রজঃ গুণ থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং, জীবের কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তিসমূহের উৎপাদক বলে রজঃ গুণ জীবের বন্ধনের কারণ। এই রজঃ গুণ থেকে উদ্ভূত বিক্ষেপ শক্তিকে কার্যোন্মুখ করে আবরণশক্তি।

বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলে যে ভ্রম বদ্ধ জীবের হয়, তার ফলেই তাকে যত দুঃখ ভোগ করতে হয়। কারণ, অনাত্ম বস্তুর স্বরূপ না জানলে বন্ধনের স্বরূপ, বন্ধনের কারন ও আশ্রয় এসব কিছুই জানা যায় না। মূঢ়, অবিবেকী ব্যক্তিগণ তীব্র আসক্তির বশে জাগতিক বিষয়ভোগে মত্ত থাকে, এবং তারা নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা চালিত হয়ে কখনো পশু, তির্যক প্রভৃতি জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনো স্বর্গাদি লোকের সুখভোগও করে। কাজেই, এইভাবে তারা বারবার জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা সংসারদুঃখ ভোগ করকে থাকে। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের দুর্গতির কথা বলতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলেই জীবের প্রাণসংশয় হয়; আর মানুষ তো সেখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাস। তাই মানুসের দুর্গতির শেষ নেই। কীভাবে এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত জীবের প্রাণসংশয় হয়, তা বোঝাতে আচার্য শঙ্করাচার্য বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলেছেন, কুরঙ্গ বা হরিণ, মাতঙ্গ বা হাতি, পতঙ্গ অর্থাৎ পোকা, মীন বা মাছ এবং ভৃঙ্গ তথা ভ্রমর - এই পাঁচটি প্রাণী যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ - এই গুণগুলির এক-একটিতে আসক্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

'শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেৰ পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন ৰদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্।।'[১৩০]

হরিণ ধরার জন্য ব্যাধ বাঁশি বাজাতে থাকে। বাঁশির মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে অর্থাৎ শব্দেন্দ্রিয়ের দ্বারা বশীভূত হয়ে ঐ শব্দ অনুসরণ করতে গিয়ে জালে হরিণ আবদ্ধ হয়। হাতি ধরার জন্য

[১৩০] বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক - ৭৬।

কাঠের মজবুত ঘেরা জায়গা বা খেদা তৈরী করা হয়। ঐ জায়গায় প্রবেশের একটি মাত্র রাস্তা থাকে এবং ঐ স্থানের কাছে শিক্ষিত হস্তিনী বা কুন্‌কি হাতি ছেড়ে রাখা হয়। বন্য হাতি স্পর্শ সুখের লোভে শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে তাকে স্পর্শসুখ দেয়। কাজেই, কাম রিপুর বশীভূত হয়েই ঐ বন্য হাতি হস্তিনীর সাথে ধীরে ধীরে খেদার মধ্যে প্রবেশ করে বদ্ধ হয়। পোকা আগুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তথা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে বশীভূত হয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও প্রাণ হারায়। মাছ রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ে বশীভূত হয়ে বঁড়শী- সংলগ্ন মাংস আস্বাদের লোভে বঁড়শি গিলে ফেলে এবং প্রাণ দেয়। ভ্রমর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে বশীভূত হয়ে পদ্মের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানেই বসে থাকে এবং শেষে সন্ধ্যাবেলা পদ্মফুলের পাপড়ি মুদ্রিত হলে তার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। সুতরাং, এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হলেই জীব মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় না; আর মানুষ তো সেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত এবং রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ- স্পর্শ - এই সকল গুণের প্রতি আসক্ত। সুতরাং, মানুষের দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নেই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ঃ

শ্রীরামানুজাচার্য হলেন বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদের প্রধান প্রবক্তা। শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করে তিনি তাঁর এই মতবাদ প্রচার করেন। 'বিশিষ্টাদ্বৈত'- এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দু'টি শব্দাংশ পাই; যথা- 'বিশিষ্ট' এবং 'অদ্বৈত'। আমরা দেখেছি যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকেই অদ্বৈতসত্তা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে, রামানুজের মতেও ব্রহ্মই হলেন এক এবং অদ্বৈতসত্তা। তবে, উভয়ের মধ্যে তফাৎ এখানে যে, শঙ্করাচার্য এই অদ্বৈতসত্তাকে নির্গুণ, নির্বিশেষ বললেও রামানুজ তাঁকে বিশিষ্ট বলেছেন। রামানুজের মতে, ব্রহ্মই পরম সত্য এবং অদ্বৈতসত্তা, যা সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বর্জিত। ব্রহ্ম অদ্বৈত হওয়ায় ব্রহ্মের

সজাতীয় সত্তা যেমন নেই, তেমনই বিজাতীয় সত্তাও নেই। তবে, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত হলেও ব্রহ্মের স্বগতভেদ আছে বলে রামানুজাচার্য স্বীকার করেন। চিৎ এবং অচিৎ - এই দু'টি হল ব্রহ্মের অবয়ব। কাজেই, অদ্বৈত ব্রহ্ম চিৎ এবং অচিৎ বিশেষণবিশিষ্ট হওয়ায় রামানুজের দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত নামে পরিচিত।

রামানুজের মতে, মূল তিনটি তত্ত্ব স্বীকৃত - চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর, যাদের মধ্যে বিশেষ্য হলেন ঈশ্বর এবং অপর দু'টি তাঁর বিশেষণ। অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন অঙ্গী এবং চিদচিৎ তাঁর অঙ্গস্বরূপ। চিৎ এবং অচিৎ সৃষ্টিকালে ও প্রলয়াবস্থায় যথাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাই হোক, চিৎ হল জীব বা আত্মা, যা জড় দেহ থেকে পৃথক, স্বপ্রকাশ, নিত্য, অণুপরিমাণ, অতীন্দ্রিয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, জ্ঞানস্বরূপ হয়েও জ্ঞাতা বা জ্ঞানের আধার, ঈশ্বরের নিয়ম্য এবং অঙ্গভূত।[১৩১] এই মতে অহমর্থই জীবাত্মা। 'আত্মা' শব্দটির দ্বারা পরমাত্মা এবং জীবাত্মা - উভয়কেই বোঝায়। এই উভয়প্রকার আত্মাই সাধারণভাবে প্রত্যক্ অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশত্ব, চেতনত্ব, আত্মত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। প্রত্যক্ অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ, চেতন অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞানের আশ্রয়, আত্মা অর্থাৎ শরীরাভিমানী জীব এবং কর্তৃত্ব অর্থাৎ কার্য করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য। তবে, 'অহমর্থ' বলতে যে আত্মাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ বোঝান, তা জীবাত্মা।

জীবাত্মা এক নয়, বহু; অর্থাৎ প্রতি শরীরে ভিন্ন। জীবাত্ম যদি এক হত, তাহলে একইকালে একব্যক্তির সুখ বা দুঃখ হলে সকলের যথাক্রমে সুখানুভব এবং দুঃখানুভব হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। এই কারণে জীবাত্ম যে অনেক - এটি অনুভবসিদ্ধ।জীবের কর্মভেদেই সৃষ্টির তারতম্য হয়ে থাকে। জীবাত্মা এক হলে সকলের কর্মই সমান হত অর্থাৎ

---

[১৩১] শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃ - ৮ - ২৫

কর্মের ভিন্নতা থাকত না। সুতরাং, জীবাত্মা বহু। জীবাত্মার বহুত্বের সপক্ষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন -

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো ৰহুনাং যো ৰিদধাতি কামান্।।'[১৩২]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জীবাত্মা এক - এই বক্তব্যের সপক্ষেও শ্রুতি পাওয়া যায়। তাহলে কি শ্রুতি অসঙ্গতিপূর্ণ? উত্তরে বলা যায় যে, জীবের ঐক্য সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যের সাথে জীবাত্মার বহুত্ববিষয়ক শ্রুতির কোন বিরোধ নেই; কারণ, আমরা অনেক সময়েই কোন বস্তুকে সমষ্টিগতভাবে এক ধরে থাকি। ব্রীহিরাশিকে যেমন আমরা এক ব্রীহি বলে থাকি, তেমনই বহু জীবাত্মাকেও আমরা সমষ্টিগতভাবে এক জীবাত্মা বলে থাকি। নৈয়ায়িক এবং সাংখ্যাচার্য্যগণও জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছেন।[১৩৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মা একাধারে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা। জ্ঞানের ব্যাপ্তির দ্বারাই এক আত্মা একইকালে বহু দেহ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ক্রিয়া ও ভোগ জ্ঞানের প্রকার হওয়ায় আত্মায় জ্ঞাতৃত্বের সাথে সাথে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বও সিদ্ধ হয়। কর্মের প্রবৃত্তি আত্মারই হয়ে থাকে; তবে শ্রী সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে সাংসারিক প্রবৃত্তিতে আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নয়; তা গুণসংসর্গকৃত। আত্মা তথা জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরপরতন্ত্র। জীবের জ্ঞান থেকে ক্রিয়ার বিকাশ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের অনুমাতির প্রয়োজন হয়। কাজেই, জীবের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্রশক্তি সবই ঈশ্বর প্রদত্ত তথা ভগবদধীন। ঈশ্বরই জীবের আদ্যপ্রযত্ন অনুসারে তাকে বিশেষ বিশেষ কর্মে প্রযোজিত করেন। সুতরাং, ঈশ্বর কর্মবিশেষের প্রতি প্রেরক, যাঁর

---

[১৩২] শ্বেতাশ্বতর ১/ ১২।

[১৩৩] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ১৭৮-১৭৯

অনুমোদন ছাড়া জীব কোন কর্মে প্রেরিত হতে সক্ষম নয়। তবে, কোন কোন স্থলে ঈশ্বর নিরপেক্ষভবেও জীবকে কর্মে প্রবর্তিত করে থাকেন।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হলেও অচিৎ প্রকৃতির সাথে সংসর্গের ফলেই আত্মায় অবিদ্যা, কর্ম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। কাজেই, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হলেও অচিৎ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েই তা অজ্ঞান বা অবিদ্যার আশ্রয় হয়ে থাকে। সুতরাং, অচিৎ-এর সম্বন্ধ ছিন্ন হলেই অবিদ্যাদিরও নিবৃত্তি হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে, 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ'।[১৩৪] অদ্বৈতবাদীগণ উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ 'অনৃত' কথাটির অনির্বচনীয় - এরূপ অর্থ করলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মতে তা একেবারেই যুক্তিসম্মত নয়। 'অনৃত' বলতে বোঝায় যা ঋত নয়, অর্থাৎ যা ঋতভিন্ন, তাই অনৃত। 'ঋতং পিবন্তৌ' - আদি শ্রুতিবাক্য থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, 'ঋত' কথাটির অর্থ কর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, ভগবদ্ প্রাপ্তিসাধক, ভগবদারাধনারূপ কর্মসকলই 'ঋত' শব্দের অর্থ। কাজেই, ঋতভিন্ন অনৃত হল ঋতব্যতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফলসাপেক্ষ কর্ম। সুতরাং, 'অনৃত' শব্দের দ্বারা অনির্বচনীয় অর্থ বোঝায় না। ফলতঃ অদ্বৈতবাদীগণ যে জগতকে অনির্বচনীয় ও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয়।[১৩৫]

অদ্বৈতবেদান্তীগণ 'মায়া' শব্দকে মিথ্যা পর্যায়ভুক্ত করেছেন; তবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ তা স্বীকার করেন না; কারণ, অসুর বা রাক্ষসগণ 'মায়া' শব্দের দ্বারা অভিহিত যে সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করেছেন, তা মিথ্যা নয়। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ রয়েছে,

---

[১৩৪] ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮/৩/২

[১৩৫] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ২৩৭

'তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
ৰালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সুদিতম্।।'[১৩৬]

অর্থাৎ ত্বড়িৎগতি সেই সুদর্শনচক্র বালক প্রহ্লাদের দেহরক্ষার্থে শম্বরাসুরের মায়া সহস্রকে এক একটি করে বিধ্বস্ত করলেন। সুতরাং, পুরাণে 'মায়া' শব্দের উক্ত প্রকার উল্লেখ থেকে জানতে পারা যায় যে, আশ্চর্যকর সৃষ্টবস্তুই 'মায়া' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়; কারণ, প্রকৃতিও নানারূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকারিণী।[১৩৭]

গীতার 'দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যাদি বাক্যে মায়াকে গুণময়ী বলা হয়েছে, যার থেকে বোঝা যায় যে, মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; অর্থাৎ প্রকৃতিই মায়া। শ্রুতিতেও উক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' - এই শ্রুতিবাক্যে 'মায়া' শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের শক্তিবৈচিত্র্যই পরিস্ফূট হয়েছে। আবার, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন-

'অস্মান্মায়ী সৃজতে ৰিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ'[১৩৮]

অর্থাৎ মায়ী পরমেশ্বর মায়া থেকেই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জীব সেই জগতেই মায়া দ্বারা সম্যক্ রূপে নিরূদ্ধ থাকে। সুতরাং, 'মায়া' শব্দের দ্বারা মিথ্যা অজ্ঞান বোদ্ধব্য নয়। শ্রুতিবাক্যও জ্ঞাত করায় যে, 'মায়া' শব্দের দ্বারা সদসদনির্বচনীয় মিথ্যা জ্ঞানের প্রতীতি হয় না। অনির্বচনীয়রূপে অজ্ঞানের অস্তিত্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয়নি। সুতরাং, ভাবরূপ অজ্ঞান, যা অদ্বৈত মতে স্বীকৃত হলেও বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অস্বীকৃত।[১৩৯]

---

[১৩৬] বিষ্ণুপুরাণ ১/১৯/২০

[১৩৭] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ২৩৭

[১৩৮] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৪/৯

[১৩৯] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ২৩৮

শ্রীভাষ্যকার রামানুজ অদ্বৈতবাদী কর্তৃক স্বীকৃত মায়া বা অবিদ্যাকে সর্বৈব অস্বীকার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে অবিদ্যা মিথ্যা বা মায়া নয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে এই মতে অবিদ্যা কী? বস্তুতঃ অবিদ্যা হল অজ্ঞান এবং এটি নানাবিধ। আত্মার সংকোচ না থাকলেও জ্ঞানের সংকোচ এবং বিকাশ উভয়ই আছে। প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানের সংকোচ হয়ে থাকে। সুতরাং, মুক্তাবস্থায় সকল আত্মারই জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকশিত ও বিভু হলেও বদ্ধাবস্থায় তা পরিচ্ছিন্ন। নিদ্রাতে জ্ঞানের প্রসার হয় না। এই জ্ঞানের নিত্য, ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় এবং অজড় বলে তা দ্রব্যাত্মকও বটে। জ্ঞান অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই হয়ে থাকে। জীবের মুক্তাবস্থায় জ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং এই প্রকাশাবস্থার জ্ঞানই অনুকূল জ্ঞান, যা স্বভাবতঃ আনন্দস্বরূপ। অপরদিকে, বদ্ধাবস্থায় জীবের যে দেহাত্মভ্রম হয়, তাই হল প্রতিকূল জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানই শ্রী সম্প্রদায়ের মতে দুঃখের হেতু।

রামানুজের দর্শনে অন্যতম প্রধান তত্ত্ব হল অচিৎ তথা জড়জগৎ। এটি বিকারপ্রাপ্ত হয়। রামানুজ জগতের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। তবে, তিনি পরিণামবাদী। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে আমরা দেখেছি যে, তিনি জগৎ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে বিবর্তবাদ স্বীকার করেছেন; অর্থাৎ তাঁর মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত; ব্রহ্ম মায়ার প্রভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। জগৎ মিথ্যা; অর্থাৎ জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নেই। একমাত্র এবং কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য এই মতবাদে। অপরদিকে, রামানুজের দর্শনেও ব্রহ্ম একমাত্র ও অদ্বৈত সত্তা হলেও তিনি ব্রহ্মের সত্তার সাথে সাথে জগৎ ও জীবের সত্তাকেও অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ জগৎ, রামানুজের দর্শনে, মিথ্যা নয়, তা সৎ এবং তা ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, অর্থাৎ জগৎ শুধুমাত্র প্রতিভাত হয় না, তা হল ব্রহ্মের পরিণাম। দুধ যেভাবে দই-এ পরিণামপ্রাপ্ত হয়, সেরকমই জগৎ হল ব্রহ্মের পরিণাম। অর্থাৎ রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হওয়ার মতো ব্রহ্ম

জগৎরূপে প্রতিভাত হন না, ব্রহ্ম পরিণামপ্রাপ্ত হন। কাজেই, বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শনে সত্তার ত্রৈবিধ্যের প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না; কারণ, ব্রহ্মের মতো জগতেরও সত্তা স্বীকৃত।

শ্রীসম্প্রদায়ে তিন প্রকার জড়পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে; যথা - শুদ্ধসত্ত্ব, মিশ্রসত্ত্ব ও কাল। ত্রিবিধ গুণ তথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাথে সম্বন্ধের ভেদবশতঃই জড়পদার্থের উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্ব জড়পদার্থে রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ না থাকায় তা নিত্য, নির্মল, জ্ঞান ও আনন্দের জনক। অপরদিকে, মিশ্রসত্ত্ব রজঃ ও তমোমিশ্রিত। প্রকৃতি, অবিদ্যা, মায়া ইত্যাদি মিশ্রসত্ত্বেরই নামভেদ। এটিই বদ্ধজীবের জ্ঞান ও আনন্দের আবরক হয়ে থাকে। সুতরাং, মিশ্রসত্ত্বই জ্ঞানবিরোধী এবং বিপরীত জ্ঞানের হেতু। তা ছাড়া, ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির পরিকর হল এই মিশ্রসত্ত্ব; অর্থাৎ এটিই বিচিত্রসৃষ্টিসাধক; প্রদেশভেদ ও কালভেদে মিশ্রসত্ত্ব থেকেই সদৃশ ও বিসদৃশ যাবতীয় বিকার উৎপন্ন হয়। জড়তত্ত্বের অন্যতম বিকার হল কাল, যা সত্ত্বশূন্য, ত্রিগুণরহিত, নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত - সকল প্রকার প্রলয়ই কালের অধীন। পরিণত কালই ঈশ্বরের দেহস্বরূপ। এটি প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর পরিণামসাধক।

তবে, শ্রীসম্প্রদায়ের মতে যে তিনটি তত্ত্ব স্বীকৃত, তাদের মধ্যে ঈশ্বরই হল মূলতত্ত্ব। ঈশ্বরই সবকিছুর আশ্রয়স্বরূপ; চিৎ ও অচিৎ ঈশ্বরে আশ্রিত। ঈশ্বরের থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ-এর অবস্থিতি অসম্ভব। চিৎ ও অচিৎ তাঁর দেহস্বরূপ। ঈশ্বর একদিকে যেমন অচিৎ-এর আত্মা, তেমনই চিৎ বা আত্মারও আত্মা। তিনি অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মতে, জীব তিনপ্রকার; যথা - নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। নিত্য আত্মা কখনই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হননি; এই প্রকার আত্মা ঈশ্বরের সাথে বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করেন। নিত্য

জীব ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধাচরণ করেন না, তাঁদের জ্ঞানেরও সংকোচ হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হয় বলে নিত্য জীবের অধিকারও অনাদিকাল থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। ঈশ্বর যেমন স্বেচ্ছায় অবতাররূপ পরিগ্রহ করেন, সেইপ্রকার নিত্য জীবও স্বেচ্ছায় অবতাররূপ পরিগ্রহ করতে পারেন। গরুড়, অনন্ত প্রভৃতি হলেন নিত্য জীব।[১৪০]

আত্মা যা একদা সংসারবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে সংসারবন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সাথে সহাবস্থান করেন, তারা হলেন মুক্ত আত্মা। মুক্তির দ্বিবিধ উপায় আছে; যথা - সিদ্ধ উপায় এবং সাধ্য উপায়। সাধ্য উপায় হল ভক্তি; আর, সিদ্ধ উপায় স্বয়ং ঈশ্বর তথা নারায়ণ। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবদুপাসনার দ্বারা ভগবদ্ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলে তখন তাঁর ভক্তিতে ঈশ্বর আকৃষ্ট হন এবং তাঁর মুক্তিসাধন করে থাকেন।

আর, সংসারবন্ধন থেকে যারা নিবৃত্ত হয়নি, তারাই বদ্ধজীব। এই সকল বদ্ধজীব অনাদিকাল থেকেই প্রবৃত্ত। এরা বিদ্যা, কর্ম, বাসনা, রুচি, প্রকৃতির সম্বন্ধে বারবার ভিন্ন ভিন্ন বাল্য, যৌবন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, জরা, মরণ, স্বর্গ-নরক গমনাদি নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে অনাদি ও অনন্ত প্রকার দুঃসহ ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ দুঃখে তাপিত হয়ে ভগবদুপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে বাস করে। ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত চেতন প্রাণী মাত্রই বদ্ধজীব।

যাই হোক, বদ্ধজীব দুই ধরনের হয়ে থাকেন; যথা - শাস্ত্রোক্তকর্মকারী এবং শাস্ত্রনিরপেক্ষ। মানুষমাত্রই শাস্ত্রের অধীন। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যারা জ্ঞান আহরণ করে, তারা অর্থাৎ মানুষ মাত্রই শাস্ত্রোক্ত কর্মকারী। অপরদিকে, মনুষ্যেতর তীর্যক প্রাণীগণ শাস্ত্রের অধীন না হওয়ায় এরাই শাস্ত্রনিরপেক্ষ বদ্ধজীব। প্রথমপ্রকার বদ্ধজীব তথা শাস্ত্রোক্ত কর্মকারীগণ আবার

[১৪০] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ১৮৪

মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু ভেদে দ্বিবিধ। মুমুক্ষু জীব আবার দুই ধরনের হয়ে থাকেন; যথা - কৈবল্যপর মুমুক্ষু এবং মোক্ষপর মুমুক্ষু। কৈবল্য হল জ্ঞানযোগবশতঃ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মানুভবরূপ অনুভূতি। এখন, কৈবল্যপর জীবের প্রকৃতি বিষয়ে মতভেদ বর্তমান। যেমন, কারো কারো মতে, অর্চি প্রভৃতি মার্গের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হয়ে ভগবদনুভূতি ছাড়াই যাঁদের নিজ আত্মানুভূতি হয়ে থাকে, তাঁরাই কৈবল্যপর জীব। আবার কারো মতে, অর্চি প্রভৃতি মার্গের দ্বারা গমন ক'রে, প্রকৃতির কোনস্থানে অবস্থান ক'রে যাঁরা আত্মানুভব করে থাকেন, তাঁরাই কৈবল্যপর জীব। এই উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য হল যে, প্রথম মতানুসারে কৈবল্যপর জীব পরমপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু অপর মতে, তাঁদের সেই পরমপদপ্রাপ্তি ঘটে না।

মুমুক্ষু জীবের দ্বিতীয় প্রকার হল মোক্ষপরজীব, যা আবার ভক্ত এবং প্রপন্ন ভেদে দু'প্রকার। যাঁরা বেদাঙ্গ ও বেদান্ত সহ বেদ পাঠ করেছেন, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার জ্ঞান যাঁদের হয়েছে, যাঁরা চিদচিৎ লক্ষণযুক্ত, আনন্দস্বরূপ, নিখিল হেয়গুণরহিত, সমস্ত কল্যাণযুক্ত ব্রহ্মকে জেনেছেন, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ভক্তির দ্বারা যাঁরা মোক্ষলাভ করার অভিলাষী, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য - এই তিন বর্ণের ব্যক্তি ভক্ত হওয়ার অধিকারী। তবে, বেদে অনধিকারী হওয়ায় শূদ্রের উক্তপ্রকার ভক্ত হওয়ার অধিকার নেই। দেবতারাও ভক্তের অধিকারী হতে পারেন, যেহেতু দেবতাদের মোক্ষপ্রার্থী হওয়ার সামর্থ্য আছে। অপরদিকে, যাঁরা অনন্যগতি হয়ে ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে থাকেন, তাঁরাই প্রপন্ন। প্রপন্নজীব আবার ত্রৈবর্গিকপর প্রপন্ন এবং মুক্তপর প্রপন্ন হতে পারেন। যাঁরা ধর্ম, অর্থ ও কামের অভিলাষ করেন, তাঁরা ত্রৈবর্গিকপর প্রপন্ন। অন্যদিকে, যাঁরা সৎসঙ্গে থেকে নিত্য ও অনিত্য বিষয়ে পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হলে মুক্তি লাভের জন্য বেদজ্ঞান সম্পন্ন আচার্যকে গুরু বলে গ্রহণ ক'রে তাঁর দ্বারা পুরুষকারজাত শ্রীলাভ করে, ভক্তি প্রভৃতি উপায়

দ্বারা নিঃস্ব হয়ে ও ঈশ্বরে অনন্যগতি হয়ে শ্রী নারায়ণের চরণকেই মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করে থাকেন, তাঁরাই মুক্তিপর প্রপন্ন। এই প্রকার প্রপন্ন হওয়ার অধিকারী বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই আছে।

এই প্রকার মুক্তিপর প্রপন্ন আবার একান্তী এবং পরমৈকান্তী ভেদে দ্বিবিধ। মোক্ষকে ফলরূপে প্রাপ্তির সাথে সাথে যাঁরা ঈশ্বরের কাছে অন্যান্য ফলও কামনা করেন, তাঁরা একান্তী; আর, যাঁরা ভক্তিজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে অন্য ফলের প্রার্থনা করেন না, তাঁরা পরমৈকান্তী। পরমৈকান্তীর মধ্যে কেউ দৃপ্ত, আবার কেউ আর্ত। যাঁরা মনে করেন, দেহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তাঁরা দৃপ্ত; অপরদিকে, আর্ত তিনি, যিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য সংসারে অবস্থান করে এই সংসারের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে এই দুঃখ থেকে উত্তরণের জন্য মোক্ষ কামনা করেন।

উক্তভাবে মুমুক্ষু জীবের শ্রেণীবিভাগের পর বুভুক্ষু জীব সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। ভোগকারী পুরুষই হলো বুভুক্ষু। বুভুক্ষু জীব আবার দুই প্রকার; যথা - অর্থকামপর ও ধর্মকামপর। যাঁরা দেহকেই আত্মা বলে মনে করেন, তাঁরাই অর্থকামপর। আর, যাঁরা দেহকে আত্মা থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন এবং পরলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা ধর্মকামপর। ধর্মকামপর জীব আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে - দেবতান্তরপর ও ভগবৎপর। যাঁরা ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি আদি দেবতার আরাধনা করেন তাঁরা দেবতান্তরপর জীব। আর, আর্থ, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভেদে ভগবৎপরজীব তিন প্রকারের। যে ঐশ্বর্য্য বিগত হয়েছে সেই ভ্রষ্ট ঐশ্বর্য্যের জন্য যিনি কামনা

করেন, তিনি আর্থ। যিনি জানতে ইচ্ছুক তিনি জিজ্ঞাসু। আর, যে ঐশ্বর্য্য উপার্জিত হয়নি, সেই ঐশ্বর্য্যের যিনি কামনা করেন, তিনি অর্থার্থী।[১৪১]

তবে যাই হোক, জীবের বন্ধনদশা ব্রহ্মের সাথে আত্মার অভেদ জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হতে পারে না; কারণ বন্ধন পারমার্থিক। জীব বা আত্মার দেহ প্রবেশ হয় কর্মনিমিত্ত; আর দেহে প্রবিষ্ট হলেই সুখ-দুঃখের ভোগ অনিবার্য। এই সুখ-দুঃখের প্রতীতিই হল বন্ধন, যা শ্রীসম্প্রদায় মতে একেবারেই মিথ্যা নয়। অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে সুখ-দুঃখের প্রতীতি তথা বন্ধনকে মিথ্যা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই সবকিছু সত্য হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মব্যতীত সবই মিথ্যা। শাঙ্কর মতে, এই বন্ধন থেকে মুক্তি একমাত্র সম্ভব জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান থেকে। তবে, রামানুজীয়গণের মতে, অভেদজ্ঞান মিথ্যা এবং এই প্রকার জ্ঞান বন্ধন বৃদ্ধিরই কারণ। কাজেই, জীব ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য এবং ঈশ্বর প্রেরক - এইভাবে প্রতিটির স্বরূপগত ভেদ অবশ্যস্বীকার্য। এই পারমার্থিক ভেদ অভেদজ্ঞানে উপেক্ষিত হয় বলে তা মিথ্যা।

এখন এখানে একটি আশঙ্কার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ঈশ্বর চিৎ এবং অচিৎ উভয়েরই আত্মাস্বরূপ; অর্থাৎ জীব যেমন দেহাভ্যন্তরে আছেন, তেমনই ঈশ্বরও জীবের মতো দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান। ফলতঃ আশঙ্কা হয় যে, ঈশ্বরেরও জীবের মতো সুখ-দুঃখাদির ভোগ আছে। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য থাকায় উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ দেহাভ্যন্তরে অবস্থানই সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ নয়। জীবের সুখাদি ভোগের

---

[১৪১] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, পৃ - ১৮২

কারণ হল তার পুণ্যপাপরূপ কর্মফল। ঈশ্বর সর্ব পাপ বিনির্মুক্ত হওয়ায় তাঁর পুণ্যপাপরূপ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ সম্ভব হয় না।[১৪২]

এখানে আরও আশঙ্কা হয় যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আপ্তকাম। তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের জন্যই কার্যে প্রবৃত্ত হয়; ব্রহ্ম আপ্তকাম হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। জগৎ নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে। বিনা প্রয়োজনে কারোরই কোন কার্যে প্রবৃত্তি হতে পারে না। যেসব ব্যক্তিগণ বিবেচনাপূর্বক কার্যারম্ভ করেন, তাঁরা হয় নিজের অথবা অন্যের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই তা করে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আপ্তকাম, যাঁর সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়ে গেছে, তিনি জগৎসৃষ্টির দ্বারা এমন কী লাভ করবেন যা তিনি এতদিন লাভ করতে পরেননি? তাছাড়া, যদি স্বীকার করা হয় যে, অন্যের প্রয়োজনে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে বলতে হয় যে, অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের দ্বারাই তাঁর পরার্থতা সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক করুণাবশতঃ যদি তিনি জগৎ সৃষ্টি করতেন তাহলে তা হত সুখময় জগৎ; তা হলে জন্ম-মৃত্যু-জরাদি বিবিধ দুঃখসঙ্কুল জগতের সৃষ্টি কখনই করুণাবশতঃ হতে পারে না। সুতরাং, প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব উপপন্ন হয় না।[১৪৩]

উক্ত প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হয়েছে যে, প্রয়োজন না থাকলেও লোকে ক্রীড়াচ্ছলে বিবিধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাপরাক্রমশালী রাজা-মহারাজাগণেরও কেবলমাত্র লীলার্থ বা চিত্তবিনোদনের জন্যই কন্দুকাদি ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তি হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে, সম্পূর্ণকাম

---

[১৪২] 'সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষাৎ।' - ব্রহ্মসূত্র ১।২।৮

[১৪৩] 'ন প্রয়োজনোৰত্ত্বাৎ।।' - ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩২

ঈশ্বরের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ে যে প্রবৃত্তি, তা তাঁর লীলা। অর্থাৎ কেবল লীলাই তাঁর প্রয়োজন, অন্য কোন প্রয়োজন নেই। [১৪৪]

প্রসঙ্গতঃ পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, ঈশ্বরের লীলাবশতঃ সৃষ্ট এই বৈচিত্রপূর্ণ জগতে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। সুখ-দুঃখের বৈষম্যকে আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, স্থাবর ইত্যাদি উৎকৃষ্ট, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট সকল প্রকার সৃষ্টির কারণ ঈশ্বর । ফলতঃ ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্বের দোষ যেমন অনিবার্য হয়, তেমনই জগতকে অতিশয় দুঃখের সাথে সংসৃষ্ট কারায় ঈশ্বরে নির্দয়তা দোষও প্রসক্ত হয়ে থাকে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে বলা হয়েছে যে, সুখ-দুঃখের বৈষম্য এবং জগতের সংহার দেখে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বা নির্দয় বলে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, উৎকৃষ্ট, মধ্যম বা নিকৃষ্ট ইত্যাদি যে সৃষ্টিবৈষম্য, তা জীবগণের কর্মফলানুসারেই হয়ে থাকে। সুখ-দুঃখাদি জীবের কর্মফলকে অপেক্ষা করে। শ্রুতি এবং স্মৃতিতেও বলা হয়েছে যে, সৎকর্মকারী উৎকৃষ্ট হয়, পাপকর্মকারী অপকৃষ্ট হয়; পূণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান এবং পাপকর্মদ্বারা পাপী হয়। সুতরাং, দেবতা, মানুষাদি তাদের নিজ নিজ শরীরপ্রাপ্তি বিষয়ে নিজ নিজ কর্মফলকেই অপেক্ষা করে।[১৪৫]

এখানে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, সৃষ্টির পূর্বে কোনরূপ বিভাগ ছিল না, সবই একরূপ ছিল। অতএব, যে কর্মানুসারে এইপ্রকার বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে, সেই পাপপুণ্যাদি কর্মের বিভাগ ছিল না। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সৃষ্টিবৈষম্যজনক কোন কর্মই ছিল না। সৃষ্টির পূর্বে জীব না থাকায় তার কর্ম বলেও কিছু ছিল না। কর্মই যখন ছিল না, তখন কর্মাপেক্ষায়

---

[১৪৪] 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।' - ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩

[১৪৫] 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।' - ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪

সৃষ্টিবৈষম্য - একথাও বলা সঙ্গত নয়। এইপ্রকার আশঙ্কাও যথার্থ নয়; কারণ, এই সংসার অনাদি। এই কারণবশতঃ জীব ও তার কর্মপ্রবাহও অনাদি। ফলতঃ উক্ত আপত্তি অসঙ্গত।[১৪৬]

তবে, সংসার যে অনাদি, তা জানা যাবে কীভাবে? সংসারের অনাদিত্ব যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয় এবং শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারাও তার উপলব্ধি হয়।[১৪৭] সংসারের আকস্মিক উৎপত্তি স্বীকার করলে অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কর্ম করা হয়নি, তার ফলভোগপ্রসঙ্গ এবং কৃতনাশ অর্থাৎ যে কর্ম করা হয়েছে তার ফলভোগ না করা - এই দু'টি দোষের প্রসক্তি হয়। সুতরাং, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তসিদ্ধ। আবার শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের দ্বারাও জীব ও সংসারের অনাদিত্বের উপলব্ধি হয়।

সুতরাং, উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, রামানুজের দর্শনে সংসার, বন্ধন, বন্ধনজনিত দুঃখভোগ কোনকিছুই মিথ্যা নয়। জীবের কর্মফলানুসারে সুখ-দুঃখের ভোগের জন্যই ঈশ্বর লীলার জন্য এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি করেছেন।

ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ঃ

ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রসারক বা প্রচারক হলেন নিম্বার্কাচার্য। তিনি নারদের শিষ্য এবং বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতার ছিলেন। নিম্বার্ক মতের সমর্থকগণকে হংস সম্প্রদায়ও বলা হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, সনকাদি মহর্ষিগণকে নিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান হংসরূপে অবতীর্ণ হন। নারদ ঐ হংসরূপী ভগবানের

---

[১৪৬] 'ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।।' - ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫

[১৪৭] 'উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।' - ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৬

অনুচর ছিলেন। নিম্বার্ক সেই নারদের শিষ্য হওয়ায় তাঁর মতানুসারীগণ হংস সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যের উপর 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস।

যাই হোক, ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত কোন অভিনব দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়; কারণ নিম্বার্কের পূর্বে ভাস্করাচার্যও এই মতের সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া, প্রাচীন আচার্য তথা ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত ঔডুলোমি কর্তৃকও ভেদাভেদবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও নিম্বার্কের সাথে তাঁর মতের তফাৎ হল এই যে, ঔডুলোমি ব্রহ্মের সাথে বদ্ধ জীবের ভেদ এবং মুক্তজীবের সাথে অভেদ স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হলেও মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়।[১৪৮] কিন্তু নিম্বার্ক মতে, জীবের বন্ধন অথবা মুক্তি উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্মের সাথে স্বাভাবিক ভেদাভেদ বর্তমান থাকে।[১৪৯]

নিম্বার্ক মনে করেন যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে একদিকে যেমন অদ্বৈতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি দ্বৈতরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত হলেও তিনি নিজেকে নাম ও রূপ বিশিষ্টজগতের মধ্যে প্রকট করে থাকেন; আবার, প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম একাধারে অদ্বৈত, আবার তা বৈচিত্র্যপূর্ণ বা দ্বৈত। সুতরাং, জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধকে সর্প ও তার বিভিন্ন ভঙ্গিমার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সর্প এক হলেও তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিদ্যমান থাকে, যেমন কখনো কুণ্ডলীকৃতভাবে, কখনো বা ফণা উত্তোলন করে।[১৫০]

---

১৪৮ শ্রীবিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃ - ৩০।

১৪৯ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, সংস্কৃত কলেজ, গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক - ৩২, ১৯৬৫, পৃ - ২৬, ২৭।

১৫০ বেদান্তপারিজাতসৌরভ ৩।২।২৭।।

নিম্বার্ক ব্রহ্ম বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়েছেন। জগৎ এই ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম লীলার ছলে এই নাম-রূপ-বিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি করেছেন।[১৫১] ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মেই জগতের কারণরূপ সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন শক্তি এবং ঐ সূক্ষ্মরূপের মধ্যেই কার্যরূপ স্থূল জগতকে প্রকাশ করার শক্তি উভয়ই বর্তমান থাকায় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্রহ্ম লীলার ছলে জগৎ সৃষ্টি করলেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? উত্তর হল এই যে, জীবের সাথে তার স্বকৃত পূর্বকর্মের ফলপ্রদান করা এবং ঐ ফল ভোগের জন্য সকলপ্রকার ভোগসাধনসমূহের যোজনা করাই জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব অনাদি হওয়ায় জীবের কর্মসংস্কারও অনাদি এবং জীব এই অনাদি কর্মসংস্কারের বশীভূত। পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হলেও জীবের জ্ঞান অত্যন্ত সংকুচিত। এই কারণে সে ভোগ স্মরণ করতে সক্ষম হয় না। তাই জীবের কৃতকর্মের ফলভোগের উপযোগী জ্ঞানের প্রকাশ ক'রে ফল ও তা ভোগসাধনের সাথে ব্রহ্মাই জীবকে যোজিত করে থাকেন। এই কারণে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণও বটে।[১৫২]

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদে তিন প্রকার তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে; যথা - চিৎ বা জীবাত্মা তথা ভোক্তৃ, অচিৎ বা জড় তথা ভোগ্য এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তথা নিয়নতৃ। জীবকে ভোক্তৃ বলা হয়েছে; কারণ, উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বের মধ্যে জীবই ভোগ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল সুখ ও দুঃখের আকারে ভোগ করে থাকে। সংসার মানেই দুঃখ; কারণ সংসারে এমন কোন সুখ নেই যা দুঃখের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

[১৫১] বেদান্তপারিজাতসৌরভ - ১।৪।২৩, ১।৪।২৬।

[১৫২] শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃ - ২৯।

তবে, জীব মাত্রই যে দুঃখ ভোগ করে তা নয়; কারণ, জীব মূলতঃ দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ।[১৫৩] মুক্তজীব তাঁরাই যাঁরা সংসার দুঃখের থেকে মুক্ত অর্থাৎ যাঁদের সংসার-দুঃখের ভোগ নিবৃত্ত হয়েছে। অপরদিকে, মুক্ত ও বদ্ধ জীব প্রসঙ্গেই সংসার-দুঃখ ভোগের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কারণ, বদ্ধ জীবই সংসার বন্ধন ছিন্ন করলে মুক্তজীবে পরিণত হয়ে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে যে, সংসার বন্ধন কী? জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই বন্ধন বলে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই হল মায়া।[১৫৪] সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, পুরুষের সাথে প্রকৃতির সংযোগের ফলে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং তা থেকে মহদাদি তেইশটি তত্ত্বের অভিব্যক্তি ঘটে। এই তেইশটি তত্ত্বই বদ্ধ জীবের ভোগ্য বিষয় তথা সংসার[১৫৫] এবং এদের প্রতিটি ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় এদের ভোগের থেকেই জীবের তথা ভোক্তৃর দুঃখাদির উদ্রেক হয়ে থাকে। তবে, দেহ ব্যতিরেকে জীবের এই সংসার ভোগ সম্ভব হয় না। দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়েই জীব দুঃখাদি ভোগ করে; এই কারণে দেহই হল দুঃখাদির সাধন।

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, জীবের সংসার বন্ধনের কারণ কী? উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতির সাথে জীবের সম্বন্ধরূপ বন্ধনের মূল কারণ হল অবিদ্যা, যা অনাদি। এই অবিদ্যার প্রভাবেই জীব বারংবার দেবাদি দেহে আবদ্ধ হয় এবং সেই দেহ সম্বদ্ধ বস্তুকে আত্মা ও আত্মীয়রূপে অভিমান করে।

এখন বন্ধন যার আছে, তারই বন্ধন-মুক্তির প্রশ্ন ওঠে। তাই বদ্ধ জীবেরই মুক্তি বা মোক্ষের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতি-সম্বন্ধরূপ বন্ধন ছিন্ন জীবই হলেন মুক্ত। বদ্ধ জীবের মধ্যে

[১৫৩] Roma Bose, vol. III, p. 32.

[১৫৪] দশশ্লোকী - ২।।

[১৫৫] V. S. Ghate, "*Vedanta: a study of Brahma-sutras with the bhasya of Sankara, Ramanuja, Nimbarka, Madhva and Vallabha*", ed.V.G. Pranjpe, p. 30.

যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা সকল প্রকার কর্মসংস্কার এবং জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি প্রাপ্ত হন। নিম্বার্কাচার্যের বেদান্তপারিজাতসৌরভ নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর তাঁরই শিষ্য শ্রীনিবাস বেদান্তকৌস্তুভ নামক যে টীকা রচনা করেন, সেখানে কার্যকারণপ্রকৃতিনিবৃত্তিপূর্বক ভগবদ্‌ভাবাপত্তিকেই মুক্তি বলা হয়েছে। ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অপার কৃপার বর্ষণ হলেই মুমুক্ষু প্রকৃতিবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিলাভ করেন। যিনি মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছুক তিনি পরামুক্তিলাভের জন্য পরমাত্মার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপ ব্যক্তিকে প্রপন্ন বলে এবং আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়াকে প্রপত্তি বলা হয়। প্রপন্ন ব্যক্তির উপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হয় এবং সেই কৃপার ফলে প্রপন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়, যার মাধ্যমেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ দুঃখাদি ভোগের থেকে পরিত্রাণ সম্ভব হয়ে থাকে।

দ্বৈতবাদ ঃ

দ্বৈতবাদ হল অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদ। শ্রী মধ্বাচার্য দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার ও স্থাপন করতে যত্নবান হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য যেমন তাঁর অদ্বৈতবাদকে সব রকম দ্বৈতবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি মধ্বও তাঁর প্রচারিত দ্বৈতসিদ্ধান্তকে যেকোন প্রকার অদ্বৈতবাদের গন্ধ থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াস করেছিলেন। মধ্বাচার্য মনে করেছেন, অদ্বৈতবেদান্তে যে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ - এই জ্ঞান প্রচারিত হয়েছে, তা জীবের অকল্যাণই সাধন করে। তিনি ব্রহ্ম বলতে ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে বুঝিয়েছেন। দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন, বিষ্ণুপ্রধান্য প্রচার এবং অদ্বৈতবেদান্ত স্বীকৃত মায়াবাদ খণ্ডন - এই ছিল মধ্বের জীবনের

উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর সূত্রভাষ্য এবং শ্লোকনিবন্ধন অনুব্যাখ্যান রচনা করেছেন।

মধ্বাচার্যের মতে ভেদ নিত্য ও স্বাভাবিক। তিনি পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চবিধ ভেদ নিম্নরূপঃ

ক) ব্রহ্মের সাথে জীবের ভেদ,

খ) ব্রহ্মের সাথে জড়ের ভেদ,

গ) জড়ের সাথে জীবের ভেদ,

ঘ) জীবের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ, এবং

ঙ) জড় পদার্থের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ।

এই পঞ্চবিধ ভেদকেই মধ্ব প্রপঞ্চ বলেছেন। সুতরাং, মধ্বাচার্যের মতে শাঙ্কর বেদান্ত স্বীকৃত অভেদ মিথ্যা, বরং ভেদই অনাদি ও সত্য।

যাই হোক, উক্তভাবে মধ্বাচার্যের মতের সামান্যতঃ সূচনার পরে প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের তাঁর মতে দুঃখ, বন্ধন, জীবের প্রকার ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনার প্রসঙ্গ এসে যায়। জীবের মোক্ষ বা মুক্তির প্রশ্ন তখনই উত্থাপিত হয় যখন জীব বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ বন্ধনের বিমোচনই হল মুক্তি বা মোক্ষ। ব্রহ্ম তথা বিষ্ণুর কৃপাবর্ষণেই জীবের এই মোক্ষলাভ সম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে যে, মধ্বাচার্য জীবের বন্ধন সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, জীব অনাদি। অনাদিকাল থেকেই জীব বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন হল সংসার বন্ধন। নির্দিষ্ট জীবাত্মার নির্দিষ্ট দেহের সাথে সম্বন্ধই হল জন্ম এবং ঐ দেহ থেকে বিচ্ছেদই হল মৃত্যু। জীবাত্মার বারবার জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণের মাধ্যমে সংসারে আসা এবং দুঃখাদি ভোগই হল বন্ধন। ব্রহ্মই জীবকে অনাদিকাল থেকে এই বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছেন। এই বন্ধন কল্পিত নয়, তা

সত্য। কারণ, বন্ধনের কারণ যে অজ্ঞান তা সত্য, তা কল্পিত নয়। এই বিষয়টি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সেখানে অজ্ঞান বা মায়াকে মিথ্যা বলা হয়েছে; মায়াচ্ছাদিত ব্রহ্মই বদ্ধ জীব এবং মায়ার আবরণ সরে গেলেই জীবের ব্রহ্মোপলব্ধি হয় - একথাই শঙ্করাচার্য বলেছেন। মধ্ব মতে, ব্রহ্ম নয়, সসীম জীবই অজ্ঞানের জালে জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ অজ্ঞান জীবাশ্রিত; কারণ, ব্রহ্ম, যা স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, তাকে অজ্ঞান কখনো আচ্ছাদন করতে পারে না।[১৫৬] সুতরাং, বন্ধনকে সত্য বললে তবেই জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। যদিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মাধ্ব দর্শনে বলা হয়েছে, জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব থাকলেও তা মূলতঃ ব্রহ্মেরই ইচ্ছা। অর্থাৎ জীব নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করলেও আসলে তা ব্রহ্মের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এটিই হল অজ্ঞান বা অবিদ্যা। সুতরাং, অবিদ্যার প্রভাবেই জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদি সব কিছুকেই নিজের বলে মনে করতে থাকে, যদিও সেই সব কিছুতে জীবের অধিকার ব্রহ্ম প্রদত্ত। দেহাদির সাথে অলঙ্ঘ্যসম্বন্ধবশতঃ জীব দেহাদির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেকে কখনো ধন্য আবার কখনো হতভাগ্য বলে মনে করে থাকে।

যাই হোক, মধ্ব জীব ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে জীব তিন প্রকার; যথা, মুক্তিযোগ্য, নিত্যসংসারী এবং তমোযোগ্য।[১৫৭] প্রথম প্রকার তথা মুক্তিযোগ্য জীব মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য; অর্থাৎ এই প্রকার জীব নিশ্চিতভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত হবেই; তবে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা যথাসময়ে ভববন্ধন ছিন্ন করে সে মুক্তলাভ করবে। দ্বিতীয় প্রকার তথা নিত্যসংসারী জীব

---

[১৫৬] Dr. B.N.K Sharma, *"Philosophy of Sri Madhavacarya"*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, First Publication, 1962, p. 188-189.

[১৫৭] Ibid., p. 204.

জন্ম-মৃত্যুর অধীন; অর্থাৎ তারা চিরতরে সংসারে বাঁধা। তারা নিরন্তর পৃথিবী, স্বর্গ, নরকে সঞ্চরণ করে এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে। তৃতীয় প্রকার তমোযোগ্য জীব নরকভোগের দণ্ডপ্রাপ্ত।[১৫৮]

সুতরাং, জীবের স্বরূপের উক্তপ্রকার তারতম্য থেকে এই কথাই বোঝা যাচ্ছে যে, মাধ্বদর্শনে মোক্ষ সকলের জন্য নয়। নিত্যসংসারীগণ চিরবদ্ধ; অর্থাৎ তারা অনন্তকাল ধরে সংসারচক্রে ভ্রমণ পরায়ণ। আর, তমোযোগ্য জীব অনন্ত নরকাশ্রয়ী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মধ্বাচার্যই প্রথম এমন দার্শনিক যিনি অনন্তকাল ধরে সংসারে বদ্ধ এবং অনন্তকাল নরকের অভিশাপগ্রস্ত জীবের উল্লেখ করেন, যারা চিরবদ্ধ, যাদের মুক্তিপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। মুক্তিলাভের যোগ্য কোন পথই তাদের মুক্তির স্বাদ দিতে সক্ষম নয়। মধ্বের এই প্রকার কল্পনা ভারতীয় বৈদিক দার্শনিক সাহিত্যে অথবা ধর্মশাস্ত্রের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৫৯] বস্তুতঃ মধ্ব মনে করেন যে, অবিদ্যা জীবাশ্রিত এবং তা সর্বজীবাশ্রিত একমাত্র অজ্ঞান নয়। প্রতি জীবের ক্ষেত্রে অবিদ্যা বা অজ্ঞান পৃথক পৃথক হয়ে থাকে।[১৬০] এই কারণেই কোন কোন জীব তাঁর মতে মুক্তিযোগ্য; আবার কোন জীব চিরবদ্ধ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই জীবাত্মার উক্ত প্রকার তারতম্য লক্ষ্য করে প্রশ্ন হতে পারে যে, জীবাত্মার উক্তপ্রকার ভেদ কি স্বরূপগত? অর্থাৎ কোন জীব মুক্তিযোগ্য, কেউ সদা সংসারের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে সঞ্চরণশীল, আবার কেউ নরকভোগী - এই যে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদ, তা কী জীবাত্মার স্বরূপেই নিহিত? উত্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মা অনাদি এবং এদের স্বরূপগত ভেদ না থাকলেও দুঃখাদি ভোগের দিক থেকে এদের মধ্যে ভেদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে; কারণ, জীব

---

[১৫৮] P. Nagaraja Rao, *Introduction to Vedanta*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, First Publication, 1958, p.157.

[১৫৯] শ্রীবিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দর্শনে মুক্তবাদ, পৃ - ৫৯।

[১৬০] শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, ভারতীয় সাধনার ধারা, পৃ - ৪৭।

দেহাবচ্ছেদে যে সব কর্ম সম্পাদন করে, দুঃখাদি ভোগ সেই সব কর্মের ফল। লোহা যেমন স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ হলেও আর্দ্র আবহাওয়ায় তার উপর মরিচা ধরে, তেমনি প্রতি আত্মা স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ হলেও তার সম্পাদিত কর্মসংস্কারই তার দুঃখাদি ভোগের নির্ধারক হয়ে থাকে।[১৬১]

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মত আলোচনা করেই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি করতে চাই। ঠাকুর মনে করেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিচিত্র। তাঁর সৃষ্টিতে নানরকম জীবজন্তু যেমন আছে, তেমনি আছে নানা ধরনের উদ্ভিদ আবার এদের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে যমন ভালো-মন্দ আছে, তেমনি উদ্ভিদের মধ্যেও তা আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। আবার, উদ্ভিদের মধ্যে যেমন অমৃতের মতো ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ আছে, তেমনি বিষ ফল উৎপন্ন করে - এমন উদ্ভিদও আছে। কাজেই, সব কিছুর ভালো ও মন্দ উভয়ই আছে। অনুরূপ কথা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মানুষের মধ্যে যেমন ভালো মানুষ অর্থাৎ সাধু ব্যক্তি আছেন, তেমনি মন্দ অর্থাৎ অসাধু ব্যক্তিও আছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যেমন সংসারী আছেন, তেমনি আবার আছেন ভক্ত। ঠাকুরের মতে, জীব চার প্রকার; যথা, বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব, মুক্ত জীব ও নিত্য জীব। বদ্ধ জীব হলেন তাঁরা, যাঁরা সংসারে ও সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত অর্থাৎ সংসারী লোক। তাঁরা এতটাই বিষয়াসক্ত যে, তাঁরা ভগবান-চিন্তা করেন না, ভগবানকে ভুলে থাকেন। তাছাড়া, বদ্ধ জীব মৃত্যু শয্যায় শুয়ে শুয়েও বিষয়-চিন্তা করেন। সে সংসারের অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনের মায়ার দ্বারা এমনভাবেই আবিষ্ট

[১৬১] P.Nagaraja Rao, *Introduction to Vedanta*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, First Publication, 1958, p.152.

হয়ে থাকে যেন তার হাত পা বাঁধা। সে মনে করে যে, সংসারই অত্যন্ত সুখের জায়গা; অর্থাৎ নিত্যানিত্যের ভেদ সে বোঝে না। এমনই বিষয়াসক্তি যে, মৃত্যু শয্যাতেও প্রদীপে বেশি সলতে জ্বলতে দেখলে সে তেল বেশি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রদীপের সলতে কমিয়ে দিতে বলে। তারা অবসর সময়ে ঈশ্বরচিন্তা করে না; বরং আবোল-তাবোল গল্প করে, বা ''মিছে কাজ করে'' অথবা অবসর সময় কাটে না - এই কথা বলে বেড়া বাঁধে অথবে তাস খেলে। মুমুক্ষু জীবের সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মেছে; অর্থাৎ তাঁরা মুক্ত হতে ইচ্ছুক। তবে, তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, আবার কেউ সেই স্তরে উন্নীত হতে পারে না। যাঁরা মুক্ত জীব তাঁদের বিষয়বুদ্ধি নেই; ঠাকুর বলেছেন, যাঁরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়- যেমন সাধু-মহাত্মারা।[১৬২] তাঁরা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, অর্থাৎ 'হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে।' সর্বশেষ হল নিত্য জীব, যাঁরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য, জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য; যেমন - নারদাদি।[১৬৩]

একটি উপমার সাহায্যে ঠাকুর এই চতুর্বিধ জীবের বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছেন। উপমাটি হল এইরূপ ঃ পুকুরে মাছ ধরার জন্য যখন জাল ফেলা হয়, তখন কিছু মাছ আছে, যেগুলো কখনই জালে ধরা পড়ে না; এগুলো হল নিত্য জীবের মতো। অর্থাৎ মাছের জাল হল এখানে সংসার বন্ধন, যে বন্ধনে ''সেয়ানা'' মাছ অর্থাৎ নিত্য জীব কখনো আবদ্ধ হয় না। আবার যেসব মাছ জালে ধরা পড়ে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু পালাবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জালরূপী সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই, মুমুক্ষুগণ হলেন সেইসব মাছের মতো যারা জালে ধরা পড়ে জাল থেকে পালাবার চেষ্টা করে। তবে, যেসব মাছ জালে ধরা পড়ে,

---

১৬২ শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম কথিত, প্রথম খণ্ড, পৃ - ২৫।

১৬৩ তদেব।

তাদের মধ্যে যারা জাল থেকে পালাবার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু মাছ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরা হলো মুক্ত জীবের মতো। তবে, জালে ধরা পড়া বেশিরভাগ মাছই নিশ্চেষ্ট হয়ে জাল থেকে পালাবার চেষ্টাও করে না। 'বরং জাল মুখে করে, পুকুরে পাঁকের ভিতর গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে - মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে।'[১৬৪] অর্থাৎ বদ্ধ জীব হলো এই সকল মাছের মতো। অর্থাৎ বদ্ধ জীব সংসারেই থাকে, সেখানে থেকে মুক্ত হওয়ার তার কোন ইচ্ছা থাকে না; সংসারকেই পরমসুখের স্থান বলে মনে করে; তবে এই বোধ তার হয় না যে, জালরূপী সংসারই সব দুঃখের মূল; পাঁকরূপী বিষয়ের মধ্যেই তাই বদ্ধ জীব মুখ গুঁজড়ে থাকে।

---

[১৬৪] তদেব।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যাবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব

তত্ত্ব ও ব্যবহার বিষয় দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এদের একটি অপরটির পরিপূরক। পাশ্চাত্য দর্শনে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাবহারিক দিকের আলোচনা হয়ে থাকে। তবে, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এখানে তত্ত্বের আলোচনার মধ্যেই তার ব্যবহার বা প্রয়োগের দিকটিকে খুঁজে নিতে হয়। এখানে তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগের আলোচনা হয় না। আমার এই গবেষণামূলক নিবন্ধের আগের অধ্যায়গুলিতে আমি দুঃখের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, মানুষের ব্যবহারিক জীবন সমস্যা সঙ্কুল। সমস্যার পাঁকে নিমগ্ন ব্যক্তি এক সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাক বা না পাক অপর সমস্যা তার পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। সমস্যার নিষ্কৃতি হলে ব্যক্তির সাময়িক সুখ লাভ হয় বটে; কিন্তু ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুঃখ মানুষের পিছু ছাড়ে না।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দুঃখের গুরুত্ব কী? অর্থাৎ দুঃখের অভিঘাত মানুষের জীবনে কীভাবে তাৎপর্যবহ হয়ে থাকে? এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এটাই, যা এই অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট।

যাই হোক উক্ত প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের কিছু দিক আলোচনা করব এবং সেখানে দেখব যে, দুঃখ অনেকসময়ই আমাদের বন্ধুর মতো কাজ করে। প্রকৃত বন্ধু যেমন আমাদের পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি দুঃখও আমাদের জীবনে চলার সঠিক পথ দেখায়। বিশেষতঃ দুঃখ আমাদের বিবেচক, নৈতিক ও ধর্মপরায়ণ হতে সাহায্য

করে থাকে। আমরা জানি যে, চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম অন্যতম প্রধান, যা আমাদের পরম পুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তিতে তথা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহায়ক হয়। ধৃ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ হল ধর্ম। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যা ধারণ করে তাই ধর্ম। সাধারণভাবে কর্তব্য কর্মকেই ধর্ম বলা হয়ে থাকে। জীবনে চলার পথে কোন্‌টি কর্তব্য কর্ম এবং কোন্‌টি অকর্তব্য তা নির্ধারণ করে দেয় ধর্মশাস্ত্রাদি বিভিন্ন শাস্ত্র। এখন, মানুষ যখনই বারবার দুঃখের পাঁকে নিমজ্জিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাকেই তাঁর মনে প্রশ্ন হয় যে, কেন বারবার আমি দুঃখ পাচ্ছি? কেন দুঃখ আমার পশ্চদ্ধাবন করেই চলেছে? এই 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ এমন পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করে যা তাকে ভবিষ্যত-দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেবে। অতীত দুঃখ মানুষকে ভোগ করেছে; বর্তমানের দুঃখ থেকেও কোনভাবে মুক্তি সম্ভব নয়; কিন্তু অনাগত বা ভবিষ্যত দুঃখকে কীভাবে এড়ানো যায় - এই পথের সন্ধানে মানুষ তার জীবনের কোন না কোন স্তরে গিয়ে বুঝতে পারে যে, কর্মই একমাত্র আমাদের বাঁচাতে পারে। অর্থাৎ কর্মবাদের নিয়মকে মানুষ মান্যতা দিতে শুরু করে। উচিৎ কর্মের গ্রহণ, অনুচিৎ কর্মের বর্জন - এইভাবে মানুষ জীবন পরিচালনা করতে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ ধর্মই তখন মানুষের জীবনের পথের পরিচালক বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে গণ্য হয়।

নৈতিক উভয়সংকটে ব্যক্তির অনুশোচনাজনিত দুঃখ ঃ

নীতি, ধর্ম ইত্যাদি কথা যখনই ব্যাবহারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ওঠে, তখনই এদের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকে দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের পরিস্থিতি, যাকে বলে নৈতিক উভয় সংকট। নৈতিক উভয়সংকটের পরিস্থিতিকে বোঝার আগে উভয়সংকটময় পরিস্থিতিকে বুঝতে হবে। উভয়সংকট বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়

যেখানে সামঞ্জস্যহীন সমমূল্যের দু'টি বিকল্প কর্ম সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকে। অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য প্রথমেই একটি পরিচিত দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে আমরা মাঝে মাঝেই কথা প্রসঙ্গে বলে থাকি, 'সাপ মারা যাবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না।' কিন্তু অধ্যাপক মতিলাল বলতে চেয়েছেন যে, যদি লাঠি না ভাঙে তাহলে সাপও মরবে না; কারণ, একইসাথে দু'টি কর্ম সম্পাদিত হতে পারে না। একটি বিকল্প কর্মের সম্পাদন অপর বিকল্প কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। বস্তুতঃপক্ষে উভয়সংকটের পরিস্থিতিগুলি দুই বা ততোধিক শত্রুভাবাপন্ন বা বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট বিকল্প কর্মের সাথে উপস্থাপিত হয় এবং ঐ বিকল্প কর্মগুলির মধ্যে থেকে একটি কর্ম সম্পাদিত হলে অপর বিকল্প কর্মটি সম্পাদিত হয় না। শুধু তাই নয়, যে বিকল্প কর্মটি সম্পাদিত হয় তার পিছনে কোন বৌদ্ধিক বা নৈতিক ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এই উভয়সংকটকেই যখন দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যবোধ এবং মূল্যবোধক নীতির দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে, তখন তাকে নৈতিক উভয়সংকট বলে। মতিলাল মনে করেন যে, নৈতিক উভয়সংকট (moral dilemma) হল একধরনের কার্যনিয়ামক উভয়সংকট (action-guide dilemma)। কার্যনিয়ামক উভয়সংকট বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যে পরিস্থিতিতে কর্তা যে যে বিকল্প কর্ম সম্পাদন করতে দায়বদ্ধ, সেই সকল কর্ম একইসাথে সম্পাদন করতে পারে না। অর্থাৎ যদি সেই পরিস্থিতিতে কর্তা ক ও খ - এই দু'টি বিকল্প কর্ম করতে দায়বদ্ধ থাকে, তা হলে কর্তার পক্ষে ক ও খ - এই দু'টি বিকল্প দায়বদ্ধতা একসঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব নয়। কর্তা দায়বদ্ধ হয়ে ক বিকল্পটি সম্পাদন করলে খ বিকল্পটিকে বর্জন করতে হবে এবং বিপরীতক্রমে, খ বিকল্পটিকে গ্রহণ করলে ক বিকলপটিকে বর্জন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সূচনায় উল্লিখিত অর্জুনের অবস্থার কথা উল্লেখ করছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অজুন শোকমোহাদিগ্রস্ত হয়ে স্বধর্মানুষ্ঠান থেকে বিরত হয়েছিলেন। শোকমোহাদি হল স্বধর্মানুষ্ঠানের পরিপন্থী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমারম্ভে অর্জুন এক নৈতিক উভয়সংকটে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধ তাঁর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল। যুদ্ধ মানেই রক্তক্ষয়ী। তবে, এই যুদ্ধে অর্জুনের প্রতিপক্ষ হিসেবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন (অর্থাৎ কৌরবগণ) তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর আত্মীয়। তাই অর্জুনের মনে স্বজনাদি বধের আশঙ্কায় কাতরতা ও বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল এবং ফলতঃ তিনি যুদ্ধরূপ নৃশংস বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে যুদ্ধে বিরত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ পাণ্ডবগণ বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করে যখন প্রতিজ্ঞা অনুসারে নিজেদের অর্ধেক রাজ্য অধিকার হিসাবে দাবী করেন, তখন দুর্যোধনাদি কৌরবগণ অর্ধরাজ্য তো নয়ই, এমনকি সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ জমিওই বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের দিতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদের দূতরূপে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন, তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ কৌরবগণ তাঁকে বন্দি করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া, দুর্যোধনাদি সভামধ্যে সকলের সামনে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করে অপমানিত করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, এই ছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রেক্ষাপট। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডব বীরচূড়ামণি অজুনের মনে দু'টি নীতির মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। একটি হল স্বজনহত্যাজনিত পাপ এবং অপরটি হল স্বধর্ম তথা ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা। এই উভয় নীতির দ্বন্দ্বে পড়ে অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অর্জুনের এই প্রকার নৈতিক দ্বন্দ্বকে উভয়সংকট বলা হয়।

তবে, নৈতিক উভয়সংকটগুলির কোন সুস্থ বৌদ্ধিক সমাধান সম্ভব নয়; কারণ, ঐ পরিস্থিতি থেকে কর্তার পালাবার কোন পথ নেই। অর্থাৎ ঐ পরিস্থিতিতে

সম্পাদনযোগ্য বিভিন্ন বিকল্প কর্মগুলির মধ্যে কোন না কোন বিকলপকে গ্রহণ করে কর্তাকে তার ইচ্ছানুসারে কর্ম সম্পাদন করতেই হয়। কারণ, কোন একটি বিকল্প কর্মকে স্বেচ্ছায় নির্বাচনপূর্বক সম্পাদনের মাধ্যমেই ঐ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। তবে, যে বিকল্প কর্মটিকে কর্তা বর্জন করে তথা সম্পাদন করতে পারে না, সেটি অসম্পাদনের জন্য কর্তার একধরনের অনুশোচনা বা আক্ষেপ বা বিবেক-দংশন হয়। কারণ, ঐ পরিস্থিতিতে কর্তার দ্বারা অসম্পাদিত বিকল্প কর্মটিও কর্তার দ্বারা সম্পাদিত বিকল্প কর্মের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং উভয় বিকল্পকেই সমান গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই কর্তার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে কর্তার এগোলেও দোষ, পিছালেও দোষ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে এক কঠিন অভিজ্ঞতা হয়; ফলতঃ ব্যক্তির ধৈর্য্য ও সহনক্ষমতা বাড়ে। অর্থাৎ দুঃখ মানুষকে সহনশীল করে। কারণ, যে বিকল্প কর্মটি এই ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তি করতে পারে না, সেই কর্মের সম্পাদনের জন্যও ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা কিছু কম থাকে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই একটি বিকল্প কর্মকে ব্যক্তি ঐ পরিস্থিতিতে সম্পাদনের জন্য বেছে নেয়। কিন্তু বর্জিত কর্মের জন্য ব্যক্তির যে আবেগ বা অনুভূতি থাকে, তাকে দমন করতেই হয় ব্যক্তিকে। কাজেই, এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন দুঃখও ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের জন্য এক ধরনের শিক্ষা দেয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেককেই আবেগ-অনুভূতিকে দমন করতেই হয়; অন্যথায় মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলা যায় না। তা ছাড়া আরো বলা যায় যে, নৈতিক উভয়সংকটের পরিস্থিতি মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতি ঘটায়, নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কর্তার পালানোর পথ না থাকায় বলতে হয় যে, বিকল্প নীতি দু'টির মধ্যে একটি নীতিকে গ্রহণ করে অপর নীতিটিকে লঙ্ঘন করা। এই নীতি লঙ্ঘনের জন্য কর্তা যেমন

অনুশোচনা করে, তেমনি কর্তাকে শাস্ত্রানুযায়ী শাস্তিও ভোগ করতে হয়। কারণ, নীতি লঙ্ঘন মানেই পাপ। আর পাপজনিত শাস্তিও তাই ব্যক্তির ভোগ্য।

দুঃখের ভয় নৈতিক কর্মে প্রবৃত্তির কারণ ঃ

কথিত আছে যে, 'ভয়বশতঃ কোন কর্মে যেরকম ঝটিতি লোকের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় - লোকে তা করতে যেরকম দ্রুত প্রবৃত্ত হয়, শত কোটি বিধির দ্বারাও সেইভাবে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হতে পারে না।' তাই দুঃখের ভয়ে কর্মে প্রবৃত্তি বা কর্ম থেকে নিবৃত্তি বিষয়ে এখানে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চলেছি।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্তজনিত দুঃখ ঃ

আমার আগের আলোচনার সাথে রেশ টেনেই বলা যায় যে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয় দু'টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, পাপ বা প্রত্যবায় জন্মালে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তার ক্ষয় সম্ভব হয়। প্রায়শ্চিত্ত একপ্রকার দুঃখই; তা হল লঘু দুঃখ। পাপের ভয়েই ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয় না। তা ছাড়া যদি কেউ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করেও, তাহলেও প্রায়শ্চিত্তই কম দুঃখ ভোগের মাধ্যমে শাস্ত্রবিধি অকরণের মতো পাপজনিত অধিক দুঃখ ভোগের হাত থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে। বেদ যে সকল কর্মসমূহের নির্দেশ করে তাদের মধ্যে কিছু বিহিত এবং অপর কিছু নিষিদ্ধ। বেদ নির্দিষ্ট বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করলে প্রত্যবায় উৎপন্ন হয় এবং ফলতঃ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সেই প্রত্যবায় ধ্বংসের জন্য। কাজেই, প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হল সেই ব্যক্তি যিনি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান থেকে নিবৃত্ত হন এবং নিষিদ্ধ কর্মের

আচরণে প্রবৃত্ত হন। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারটি নৈমিত্তিক। সুতরাং, বিহিত কর্মের অসম্পাদন এবং নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ - এই দু'টিই প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত; এই দু'টি নিমিত্ত ঘটলেই ব্যক্তির কাছে প্রায়শ্চিত্তকর্তব্যমূলক হয়ে ওঠে। সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্র যাগ ইত্যাদি কর্ম নিত্য কর্মরূপে অর্থাৎ অবশ্যকরণীয়রূপে বিহিত হয়েছে। আবার, অশুচিস্পর্শজনিত স্নানাদিরূপ নৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্ত উপস্থিত হলে তদ্নিমিত্ত কর্মও বেদবিহিত কর্ম। আলস্য বা অনবধানতার জন্য উক্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম না করলে পাপ হয় এবং তা ক্ষয়ের জন্য উপায় হল প্রায়শ্চিত্ত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ফলসিদ্ধির জন্য যে শাস্ত্রবিধির কর্তব্যতার কথা বলা হয়, সেই শাস্ত্রবিধির অকরণে বা লঙ্ঘনে ফলটি নিষ্পন্ন হয় না মাত্র; কিন্তু এক্ষেত্র ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হয়ে পড়েন না এবং ফলতঃ এখানে প্রায়শ্চিত্তেরও কোন প্রশ্ন উঠে না। তবে, নিত্য কর্মের অকরণে ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হয় - একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকার বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ কী? 'অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের অকরণে ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হবে' - এইরূপ শ্রুতিবাক্যের খোঁজ মেলে না। এর উত্তরে বলা যায় যে, বিধায়ক বাক্য মাত্রই তার অর্থবাদ আছে এবং 'যজ্ঞবেদি সকল থেকে পরমাগতি প্রাপ্তি হয়ে থাকে' -এইরূপ উল্লেখ অর্থবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কর্ম বিধায়ক সকল বাক্যেরই বহু অর্থবাদ বর্তমান যেগুলির মাধ্যমে প্রত্যবায় প্রদর্শিত হয়। বিধির সাথে ঐ সকল অর্থবাদের একবাক্যতা থাকায় একথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রত্যবায়ের উল্লেখ সমন্বিত অর্থবাদের মূল বর্তমান। তবে, যে স্থলে কর্মবিধায়ক বাক্যের এইপ্রকার অর্থবাদ নেই, সেই স্থলে বিধিবাক্যের পরিপোষকতা করার জন্য একথা কল্পনা করে নিতে হয় যে, বিধির অসম্পাদনে প্রত্যবায় উৎপন্ন হয়। 'বিধির অকরণে ব্যক্তি প্রত্যবায়ী হবে' - এইরূপ অর্থবাদ কল্পনার প্রয়োজন হল, ব্যক্তির প্রত্যবায়ী হওয়ার ভীতি। কাজেই, 'যদি এই কর্মটি না করা হয়,

তাহলে প্রত্যবায় উৎপন্ন হয়' - এই কল্পনা না করলে বিধি কোন ব্যক্তিকেই নিত্যকর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাতে সক্ষম হয় না এবং ফলতঃ বিধির প্রবর্তকতা অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যবায় পরিহারই পুরুষের প্রবর্তনার কারণ। এখানে যদি প্রশ্ন হয় যে, কোন কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে বলেই তার অনুষ্ঠান করতে হবে; কিন্তু সেই বিহিত কর্মটি যদি ব্যক্তির পুরুষার্থের বিষয় না হয়, তাহলে ব্যক্তি কেন ঐ শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন করবে? এখানে উল্লেখ্য যে, 'পুরুষার্থ' শব্দের দ্বারা এখানে পুরুষের অভিপ্রেত বিষয়কে বোঝায়। অর্থাৎ বিহিত কর্মের দ্বারা যদি পুরুষের কোন অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ না হয়, তাহলে ঐ বিহিত কর্মে ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই, এইরূপ হলে বিধির প্রবর্তকতা প্রতিহত হয়ে পড়ে। বিধির কর্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করার শক্তি যাতে প্রতিহত হয়ে না পড়ে, সেই কারণেই প্রত্যবায় পরিহারের কল্পনা করা হয়ে থাকে। আপত্তি হতে পারে যে, গ্রামের ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে গ্রামকামী ব্যক্তি যেমন সাংগ্রহণী যাগ করবে, ঠিক সেরকম অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের ক্ষেত্রেও একথা বলা যেতেই পারে যে, স্বর্গকামী ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষায় অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মের সম্পাদন করবে। অর্থাৎ ফলের কল্পনা করলেও বিধিবাক্যের প্রবর্তকত্ব রক্ষিত হয়। সুতরাং, প্রত্যবায় পরিহারের কল্পনা এবং ফলের কল্পনা উভয়েই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। কিন্তু এইরূপ আপত্তি যথার্থ নয়। কারণ, যদি ফলাকাঙ্ক্ষা থেকেই নিত্যকর্ম সম্পাদিত হত, তাহলে নিত্যকর্ম ও কাম্যকর্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকত না। কাম্যকর্মে ব্যক্তি ফলের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। কাজেই, স্বর্গাদিকামনায় যদি অগ্নিহোত্রাদি কর্মে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তা আর নিত্যকর্মরূপে বিবেচিত না হয়ে কাম্যকর্মরূপে পরিগণিত হবে। কারণ, যে ব্যক্তির স্বর্গকামনা নেই, সেই ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্মে প্রবৃত্ত হবে না। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি যাগের ক্ষেত্রে নিত্যকর্মত্বের বোধক 'যাবজ্জীবম্' আদি পদের উপস্থিতিই বুঝিয়ে দেয় যে, এই কর্ম নিত্য, কাম্যকর্মের মতো অনিত্য নয় এবং এই সকল পদের

দ্বারা নিত্যকর্মের সাথে কাম্যকর্মের বিরোধ স্পষ্ট হয়। এই কারণেই স্বর্গাদি ফলের কল্পনা নিত্যকর্মের প্রবর্তক হয় না, বরং প্রত্যবায় পরিহারের কল্পনাতেই প্রবর্তকত্ব নিহিত।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, 'যাবজ্জীবম্' শব্দটি নিত্যকর্মের বোধক হলেও সকল নিত্যকর্মস্থলেই তা পঠিত হয় না। যেমন, অশুচিস্পর্শজনিত স্নান নিত্যকর্মরূপে বিহিত; কিন্তু ঐস্থলে ঐরূপ কোন শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না, যার দ্বারা কর্মটি নিত্য বলে বোধিত হয়। এমন কি অগ্নিহোত্রাদি কর্মের ক্ষেত্রেও 'নিত্য' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো হয়নি যে, এগুলি নিত্যকর্ম। এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অশুচিস্পর্শজনিত স্নান ইত্যাদি কর্ম নিমিত্ত উপস্থিত হলেই করণীয়। অর্থাৎ ঐ বিশেষ নিমিত্তটি যখন উপস্থিত হবে, তখনই ঐ বিশেষ কর্মটি কর্তব্য - এই প্রকার বোধ থাকায় উক্ত কর্মগুলি যে অবশ্যকরণীয় বা নিত্যকর্ম, তার পৃথক উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। আবার, অগ্নিহোত্রাদি কর্মও যে নিত্য তা বোঝাতে 'নিত্য' শব্দের প্রয়োগ হয়নি, কারণ সেখানেও জীবনরূপ নিমিত্তটি নিত্য থাকায় সেখানে 'নিত্য' শব্দের পৃথকভাবে প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়।

পুরুষ বা জীবের পাপমূলক আচরণ ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক তা থেকে প্রায়শ্চিত্ত উৎপন্ন হবেই। অনবধানতাবশতঃ অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি বা নিষেধের লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে সেই স্থলে পণ্ডিতগণ প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কাজেই, অনিচ্ছাপূর্বক কৃত পাপাচরণের ক্ষেত্রে যদি প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয়, তাহলে এর থেকে যৌক্তিকভাবেই নিঃসৃত হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক যেক্ষেত্রে শাস্ত্র বিধি বা নিষেধের লঙ্ঘনের মাধ্যমে পাপাচরণ করা হবে, সেক্ষেত্রেও প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য, এবং শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর হবে। বেদে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক মুণিগণকে

কুকুরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন এবং এর জন্য প্রজাপতি ইন্দ্র উপহব্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা ছিল ইন্দ্রের ঐ প্রকার কর্মের প্রায়শ্চিত্ত।

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন অথবা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ - এই উভয় নিমিত্ত ঘটলে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন ওঠে। অর্থাৎ শাস্ত্রলঙ্ঘনের ফলস্বরূপ যে প্রত্যবায় বা দোষ উৎপন্ন হয়, তাকে বিনষ্ট করার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের অধিকার জন্মায়। কিন্তু এখানে সংশয় উত্থাপিত হয় যে, শাস্ত্রলঙ্ঘনের ফলে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তা ক্ষয়ের জন্যই যে প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা হয়, সেই প্রায়শ্চিত্তের কার্য কী মাত্র প্রত্যবায়ের ক্ষয়? শৌচাদি নিত্যকর্মের আচরণ শাস্ত্র বর্নিত বিধি এবং ঐ কর্মের আচরণ শরীরের মলাদি দূষিত ও বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করে। আবার, অন্যদিকে সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপ নিত্যকর্মও আছে, যা শুধুমাত্র কর্তব্যের জন্য সম্পাদিত হয়, যার কার্যস্বরূপ অন্য কোন ফল নেই। তাই সংশয় হয় যে, প্রত্যবায় ক্ষয় করার উদ্দেশ্যে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃতি কী রকম? তা কী শৌচাদি নিত্যকর্মের অনুরূপ অথবা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মের মতো? অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত কী শুধুমাত্র প্রত্যবায় ক্ষয় করেই সমাপ্ত হয়, অথবা প্রত্যবায়ের ক্ষয় ছাড়াও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অন্য কোন প্রয়োজনও সাধিত হয়? উক্ত প্রকার সংশয় উৎপন্ন হলে, সেই সংশয়ের নিরসনে বলা হয় যে, কর্ম মাত্রই ফল প্রদান করে। শুভ কর্মের ফল ধর্ম এবং অশুভ কর্মের ফল অধর্ম। এই ধর্মাধর্ম, যা শুভাশুভ কর্মজনিত, তা ফল প্রদান না করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। কাজেই, ভোগ ব্যতীত কর্মের ক্ষয় হয় না। সুতরাং, শাস্ত্রবিধির অসম্পাদন অথবা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করলে তার ফলস্বরূপ ব্যক্তিকে নরকভোগ করতে হয়।

এখানে পুনরায় আপত্তি হতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রলঙ্ঘন করলে নরকভোগ অনিবার্য। তা হলে এই বক্তব্য থেকে অনিবার্যভাবে যা নিঃসৃত হয় তা হল এই যে, শাস্ত্র লঙ্ঘন

করে যদি কোন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের বিধানও লঙ্ঘন করে তাহলে ঐ ব্যক্তির পুনরায় পাপ উৎপন্ন হয়। কারণ, সেটিও একপ্রকার শাস্ত্রীয় নির্দেশ, যার অসম্পাদনেও পাপ বা অধর্ম উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠান এবং অননুষ্ঠান উভয়েই ফল উৎপন্ন করে তারপরেই ধ্বংস হবে। তাই, প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের ফল যেমন প্রত্যবায়ের ধ্বংস, তেমনি প্রায়শ্চিত্তের অননুষ্ঠানের ফল পুনরায় প্রত্যবায়ের উৎপত্তি। তবে উক্তপ্রকার আপত্তি সঙ্গত নয়। কারণ, প্রায়শ্চিত্তের ফল হল শুদ্ধিলাভ। অর্থাৎ শাস্ত্রলঙ্ঘিত হলে যে প্রত্যবায় হয়, সেই প্রত্যবায় দূর করতেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হয়েছে। ব্যক্তি যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাপ করে, তেমনি প্রায়শ্চিত্ত-ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করতে হয়। এর অন্য কারণ আছে। শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘনকারী বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মকারী ব্যক্তির যে প্রত্যবায় উৎপন্ন হয়, তা দুঃখের কারণ হয়। সেই দুঃখের ক্ষয়ের জন্যই প্রায়শ্চিত্তের বিধান। তবে, প্রশ্ন হয় যে, প্রায়শ্চিত্তের জন্যও তো ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাহলে সেই দুঃখ সম্পর্কে অবগত হয়েও ব্যক্তি কেন প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রবৃত্ত হবে? এর উত্তর হল এই যে, ব্যক্তির শাস্ত্র লঙ্ঘনজনিত পাপ যত পরিমাণ দুঃখের কারণ হয়, প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তার তুলনায় কম পরিমাণ দুঃখের ভোগের দ্বারাই ভবিষ্যতের গুরুতর দুঃখভোগের হাত থেকে ব্যক্তি নিষ্কৃতি পায়। মেধাতিথি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, ঠিক যেমন তিক্ত ও কটু ওষুধ সেবন অথবা ভোজন সংযমরূপ অল্প কষ্ট ভোগ করে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ব্যধিজনিত গুরুতর কষ্টের নিবৃত্তি হয়। আবার এর অন্য প্রকার উদাহরণও মেধাতিথি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি বে-আইনি কোন কাজ করে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে, তা হলে তাকে সেই অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে পরিপূর্ণ শাস্তি না দিয়ে অর্ধেক শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অপরাধী ব্যক্তি আত্মগোপন করে থাকে, আর রাজপুরুষগণ তাকে জোর করে রাজার কাছে নিয়ে আসে, তাহলে তাকে দণ্ডবিধান

অনুসারে অধিক দণ্ডই দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে, পাপ দূর করার জন্য গুরুতর দুঃখ ভোগের অধিকারী ব্যক্তি স্বতঃকৃত প্রায়শ্চিত্তরূপ অল্প দুঃখ ভোগের দ্বারাই ঐ গুরুতর দুঃখ ভোগের থেকে নিষ্কৃতি পায়। এখানেই শাস্ত্রমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সার্থকতা নিহিত আছে। কাজেই, প্রায়শ্চিত্ত হল নিষ্কৃতিস্বরূপ। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় কর্মে পুনরায় অধিকার লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি কর্তৃক পঞ্চবিধ মহাপাতক অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল প্রকার শাস্ত্রীয় কর্মের অধিকার হারায়। এখানে শাস্ত্রীয় কর্ম বলতে দ্বিজাতিগণের করণীয় কর্মকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, দ্বিজাতিগণেরই শাস্ত্রে অধিকার রয়েছে। শাস্ত্রীয় কর্মে অধিকারহীন ব্যক্তিকে পতিত বলে এবং এই প্রকার অধিকারহানিকে পতন বলা হয়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পাপাচরণ ইচ্ছাকৃত হতে পারে, আবার অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। ইচ্ছাকৃত পাপাচরণের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত গুরু হয়; অন্যদিকে, পাপাচরণ অনিচ্ছাকৃত হলে প্রায়শ্চিত্ত লঘু হয়। তবে, অনিচ্ছাকৃত পাপের স্থলে বারংবার বেদাধ্যয়নই প্রায়শ্চিত্ত, আর ইচ্ছাকৃত পাপের ক্ষেত্রে তপশ্চরণ প্রায়শ্চিত্ত - এই প্রকার কোন নিয়ম নেই। উভয়স্থলেই উক্ত দু'টিই প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।

এখানে একটি সংশয় উত্থাপিত হয়। ইচ্ছাকৃত কর্মে ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকলেও অনিচ্ছাকৃত কর্মে ব্যক্তির কর্তৃত্ব যথার্থ নয়। কারণ, কর্তা তাকেই বলে যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক কোন কর্ম করে এবং সেই কর্মেই তার কর্তৃত্ব যথার্থ; অর্থাৎ সেই কর্মই ইচ্ছাকৃত কর্ম। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কর্মে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক কর্ম সম্পাদন করেনা। লোক ব্যবহারেও এমন কথা শোনা যায় যে, 'দৈব শক্তির জন্যই ব্যক্তি এইরূপ কর্ম করছে, সে নিজে এইকাজ করছে না।' অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপাচরণের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে মেধাতিথি ব্যক্তির দু'ধরনের প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল, রাগলক্ষণা প্রবৃত্তি এবং অপরটি হল বিধিলক্ষণা প্রবৃত্তি। এই দু'প্রকার প্রবৃত্তি

উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে। যে ব্যক্তি লোভবশতঃ মদ্যপান করে, সেক্ষেত্রে মদ্যপানের প্রতি ব্যক্তির রাগ বর্তমান; এই কারণে মদ্যপানের প্রতি ব্যক্তির যে প্রবৃত্তি, তাহল রাগলক্ষণা প্রবৃত্তি। অপরদিকে, সৌত্রামণী ইষ্টি প্রভৃতি স্থলে শাস্ত্রের বিধি অনুসারেই মদ্যপানের প্রতি ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়, তা হল বিধিলক্ষণা প্রবৃত্তি। যেহেতু শাস্ত্রনির্দেশেই এই প্রকার প্রবৃত্তি হয়, সেহেতু এই প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ নয়। তবে, রাগলক্ষণা প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ; কারণ, লিপ্সা বা লোভবশতঃ যে প্রবৃত্তি হয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করতেই নিষেধ করা হয়। যেমন, 'মদ্যপান করো না' - এই প্রকার নিষেধের মাধ্যমে মদ্যপানের স্পৃহাযুক্ত ব্যক্তিকে মদ্যপান থেকে বিরত করার চেষ্টা করা হয়। যদিও সেই নিষিদ্ধ কর্মটি ব্যক্তি করবে কিনা, তা ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর। যাই হোক, উক্ত উভয় প্রকার প্রবৃত্তি অর্থাৎ রাগলক্ষণা ও বিধিলক্ষণা প্রবৃত্তি উভয়েই ব্যক্তির ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্তি। কিন্তু যেক্ষেত্রে ব্যক্তি জলের জন্য প্রবৃত্ত হয়, অথচ জলের পাত্রটি মদ্যমিশ্রিত হয় এবং জলভ্রমে ব্যক্তি মদ্যমিশ্রিত জলপান করে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তির এই যে প্রবৃত্তি তা রাগলক্ষণা প্রবৃত্তি নয়; ফলতঃ তা নিষিদ্ধও হতে পারে না। অর্থাৎ তা অজ্ঞানপূর্বক অনিচ্ছাকৃত আচরণ। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, এরূপ অনিচ্ছাপূর্বক কৃত আচরণের দ্বারা পাপ কেন উৎপন্ন হবে? এরূপ প্রশ্নের সমাধানে কেউ কেউ বলেছেন যে, যা নিষিদ্ধ কর্ম, তা অজ্ঞানপূর্বক সম্পাদিত হলেও নিষিদ্ধ কর্মেরই সম্পাদন। কারণ, সেক্ষেত্রেও কর্তৃতব থাকে। ব্যাকরণ অনুসারে, যার প্রবৃত্তি অন্য সাপেক্ষ নয়, অথ্রাৎ স্বাধীন, তাকেই কর্তা বলে। কাজেই, শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে, অচেতন পদার্থেরও কর্তৃত্ব বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, যদি বলা হয় জে, 'নদীর কূল পড়ে যাচ্ছে' - এক্ষেত্রে 'পড়ে যাওয়া'-রূপ ক্রিয়ার কর্তৃত্ব নদীকূলে থাকায় নদীকূলই পতনক্রিয়ার কর্তা, তা সে অচেতন পদার্থ হলেও কর্তা। আবার, নিষিদ্ধ কর্ম ইচ্ছাপূর্বক হোক বা না হোক, তা থেকে পাপ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, আমরা লোকব্যবহারেও দেখি যে, তীব্র বিষ পান - তা

ইচ্ছাকৃত হোক বা আনিচ্ছাকৃত হোক, তাতে মৃত্যু আনিবার্য। কাজেই, উপরের উদাহরণগুলি থেকে আমরা যা বুঝি তা হল, যা শাস্ত্র কথিত নিষিদ্ধাচরণ, তা অনিচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞানপূর্বক সম্পাদিত হলেও তা পাপজনক হবে এবং এই বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না।[১৬৫]

কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন এবং তার পরিণতি ঃ

আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে কর্তব্যাকর্তব্যের বহু দিক মনুসংহিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ রাজা কর্তৃক শাসিত হত। তাই রাজার কর্তব্যাকর্তব্য কী তাও মনুস্মৃতিতে বিশেষরূপে স্থান পেয়েছে। রাজার ধর্ম কীরকম হওয়া উচিৎ - এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই এই স্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলেও মনুস্মৃতিকার এখানে এমন কিছু কথা বলেছেন যা মাত্র রাজার পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও অহিতকর। এখানে কিছু নেশা বা ব্যসন থেকে রাজাকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।[১৬৬] সেগুলি হল, কামজব্যসন এবং ক্রোধজব্যসন। এগুলি পরিণামে দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে এবং এই কারণেই এগুলিকে যত্নসহকারে বর্জন করা উচিৎ। এগুলির অবসান বা সমাপ্তি দুঃখকর। এইসকল ব্যসনের ধর্মই এমন যে, প্রথমে সেগুলি প্রাপ্তিকালে সুখকর বলে প্রতীত হলেও এগুলির অন্ত দুঃখময়। অর্থাৎ এগুলি ব্যক্তিকে সাময়িক সুখ বা স্বস্তি প্রদান করলেও তা দীর্ঘমেয়াদী নয়; বরং তা ব্যক্তির জীবনে দুঃখকে বহন করে নিয়ে আসে। তবে, কথায় আছে মানুষ ঠেকে শেখে।

[১৬৫] মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ৪৩ - ৪৫।

[১৬৬] মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ৪৫ - ৫৩।

অর্থাৎ ভুল করলেই মানুষ তার কৃত ভুল থেকে শিক্ষা নেয় এবং ভুল সংশোধন করে। কারণ, যা ভুল তা কখনই সুখদায়ক হয় না, অথবা তা সাময়িক সুখদায়ক হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই ভুল পথে চলে ব্যক্তি যে দুঃখ পায়, সেই দুঃখই ব্যক্তিকে ভুল সংশোধন করিয়ে সঠিক পথ দেখায়। ব্যাবহারিক জীবনে এখানেই দুঃখের গুরুত্ব। কাজেই, জীবন চলার পথে দুঃখও প্রয়োজন।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্ত্রকারগণ কোন কোন বিশেষ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে ব্যক্তিকে সাবধান করে। কারণ, সেই সকল কর্ম ব্যক্তির শুধুমাত্র অনিষ্টই সাধন করে। তাই সেইসব কর্মে ব্যক্তি একবার প্রবৃত্ত হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন। অর্থাৎ সেইসব কর্ম ব্যক্তির শুধুমাত্র দুঃখকেই বহন করে নিয়ে আসে না, বরং তা সাক্ষাৎ মৃত্যু। ব্যসনগুলি এই প্রকার। মনুসংহিতাকার বলেছেন, ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তি ব্যসনমুক্ত হতে পারেনা; তাই ব্যসনের অন্ত পাওয়া কঠিন। এই কারণে এগুলিকে 'দুরন্ত' বলে। শুধু তাই নয়, সকল প্রকার ব্যসনই কামনা থেকে জাত হওয়ায় এগুলিকে 'কামসমুখ' বলা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ মনুসংহিতায় যে দশবিধ কামজ ব্যসনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল,

১) মৃগয়া, অর্থাৎ বনে পশু বধ করা;

২)পাশাখেলা বা অক্ষক্রীড়া অর্থাৎ দ্যূতবিষয়ক ক্রীড়া;

৩) দিবাস্বপ্ন অর্থাৎ দিনেরবেলা ঘুমানো, যার ফলে কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে, এখানে 'দিবা' শব্দের দ্বারা এর মুখ্যার্থকে গ্রহণ করে মাত্র দিবসভাগকে বোঝায় না, বরং যে সময় জেগে থাকা উচিৎ সেই সময় অর্থাৎ কাজ করার সময় ঘুমানো এক প্রকার ব্যসন।

৪) পরিবাদ, অর্থাৎ অন্যের অসাক্ষাতে বা আড়ালে তার দোষ উদ্‌ঘাটন করা। এরূপ পরিবাদের ফলে সব প্রকৃতিই বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। আর, যেসব ব্যক্তি প্রকৃতই পরিবাদের পাত্র নয়, তাদের দোষ উদ্‌ঘাটন করলে অধর্ম জন্মায়।

৫) স্ত্রীগণের প্রতি আসক্তি;

৬)মদ্যপান, কারণ মদ্যপানজনিত মত্ততা অনর্থস্বরূপ;

৭) নাচের প্রতি আসক্তি,

৮) গানে আসক্তি;

৯) বাজনায় আসক্তি;

১০) অনর্থক বা বিনা প্রয়োজনে বা অতি অল্প প্রয়োজনে ঘুড়ে বেড়ানো, যাকে বৃথাট্যা বলা হয়।

আবার, ক্রোধজব্যসন আট প্রকারের হয়। এগুলি হল,

ক) পৈশুন্য, অর্থাৎ অমাত্য প্রমুখ থেকে জ্ঞাত কোন বিষয় যা গোপন করা উচিৎ, তা যদি রাজা সৎকর্মের বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করেন, তা হলে তা হবে রাজার পক্ষে পৈশুন্য।

খ) সাহস, যা দুইভাবে হতে পারে; প্রথমতঃ কোন মানীব্যক্তিকে যদি নীচ কর্মে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তা রাজার পক্ষে 'সাহস' বলে গণ্য হয়; দ্বিতীয়তঃ অল্প আপরাধে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হলে তাকেও সাহস বলে।

গ) দ্রোহ, অর্থাৎ গুপ্তহত্যা;

ঘ) ঈর্ষ্যা, অর্থাৎ গুপ্তভাবে কোন ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় অঙ্গবৈকল্য ঘটানো;

ঙ) অসূয়া, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির গুণে দোষ আবিষ্কার করা, অথবা গুনিগণকে বরদাস্ত না করা, কিংবা সর্বসাধারণের অধিকার আছে যে বিষয়ে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

চ) অর্থদূষণ, অর্থাৎ অপরের অর্থ হরণ করা, অথবা কোন ব্যক্তির প্রাপ্য ন্যায্য অর্থ না দেওয়া।

ছ) বাক্‌পারুষ্য, অর্থাৎ কাউকে মর্মভেদী বাক্য বলা বা গালাগালি করা।

জ) দণ্ডপারুষ্য, অর্থাৎ বিনা দোষে কাউকে প্রহার করা।

উক্ত আট প্রকার ক্রোধজব্যসন ক্রোধ অর্থাৎ বিদ্বেষের বশে সম্পাদিত অপকর্ম।

উভয় প্রকার ব্যসন অর্থাৎ কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনে প্রসক্তির পরিণতি শুধুমাত্র রাজার পক্ষেই নয় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক। কামজব্যসনে প্রসক্তির ফলে ব্যক্তির অর্থ এবং ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। অন্যদিকে, ক্রোধজব্যসনে প্রসক্তির ফল হল আত্মবিয়োগ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তি। সুতরাং, কামজব্যসনের ফলে আত্মবিয়োগ না হলেও অর্থবিয়োগ ও ধর্মবিয়োগ হয়ে থাকে; আর ক্রোধজব্যসনে সবকিছু থেকেই বিচ্যুতি ঘটে।

দশবিধ কামজব্যসনের মধ্যে মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া - এই চারটির মধ্যে বহু দোষ বেশী করে বিদ্যমান থাকায় এইগুলি কষ্টতম। অপরদিকে, ক্রোধজব্যসনের মধ্যে দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য এবং অর্থদূষণ অন্যান্যগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়ায় বেশী অনিষ্টকর।

তবে আমরা জানি যে, কারণ ব্যতিরেকে কার্য উৎপন্ন সম্ভব নয়। তাই কারণকে যদি সমূলে উৎপাটন করা যায়, তাহলে কার্যের উৎপত্তি হবে না। এই উদ্দেশ্যে মনুস্মৃতিকার উভয়প্রকার ব্যসনের কারণের অনুসন্ধান করেন। উদ্দেশ্য হল সেই কারণের নাশে কার্যের নাশ ঘটানো। কামজব্যসন ও ক্রোধজব্যসনের মূল অর্থাৎ কারণ হল লোভ। কাজেই, প্রাচীন সুধীগণ মনে করেন, যে লোভ এই সমস্ত ব্যসনের মূল, সেই লোভকে অত্যন্ত যত্নসহকারে জয় করতে হবে। এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। আপত্তিটি হল, কামজব্যসনবর্গের মূল লোভ - একথা বলা গেলেও ক্রোধজব্যসনবর্গেরও মূল লোভ, একথা বলা সঙ্গত নয়। কারণ, কাম, ইচ্ছা, অভিলাষ, লোভ - এগুলি পর্যায় শব্দ। কাজেই, লোভকে কামজব্যসনের মূল বলা হলে তাতে কোন অসঙ্গতি না থাকলেও লোভকে ক্রোধজব্যসনের মূল বলা কীভাবে সম্ভব? উত্তরে বলা যায় যে, লোভই উক্ত উভয়প্রকার ব্যসনের মূল - একথা বলার অভিপ্রায় হল এই যে, উক্ত দ্বিবিধ প্রকার ব্যসনের সবগুলি একত্রে ব্যক্তির পক্ষে যা অনর্থ ঘটাতে পারে, লোভ একাই সেই অনর্থ ঘটাতে সক্ষম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যসনহীন, অথচ লোভযুক্ত সেই ব্যক্তিরও ততটাই অনর্থ ঘটে

যতটা অনর্থ কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির ঘটে। বলা বাহুল্য এখানে ঔপচারিকভাবে লোভকে দ্বিবিধ ব্যসনের কারণ বলা হয়েছে। প্রাচীন সুধীগণের মতে, লোভ যেহেতু সকল গুণকে অভিভূত করে, সেহেতু গুণগত সাদৃশ্য থাকার দরুণ গৌণভাবে এইরূপ বলা হয়েছে যে, উক্ত দ্বিবিধ ব্যসনবর্গের মূল হল লোভ। কারণের মধ্যে যে দোষ থাকে তা কার্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। উক্ত দ্বিবিধ ব্যসনবর্গের কারণ লোভ হওয়ায় ব্যসনবর্গের মধ্যে যে দোষ প্রকটিত তা লোভের মধ্যেও নিশ্চিতরূপে বর্তমান। এই কারণেই লোভকে ঔপচারিকভাবে দ্বিবিধ ব্যসনবর্গের মূল বলা হয়েছে। কাজেই, লোভই ব্যক্তির নৈতিক পতনের মূল কারণ, যার পরিণাম হল দুঃখভোগ।

ব্যসনের প্রকার এবং কারণের উল্লেখের পর মনুস্মৃতিকার ব্যসনের পরিণতির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যসন এবং মৃত্যু - এই উভয়ের মধ্যে তুল্যতা বা সাদৃশ্য আছে। কারণ, এরা উভয়েরই ব্যক্তির সর্বস্ব হরণ করে। এই দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে বিশেষত্বও বর্তমান। বিশেষত্ব এই যে, মৃত্যু ব্যক্তির ইহলোক নষ্ট করে মাত্র; কিন্তু ব্যসন ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট করে। কাজেই, উক্ত উভয়ের মধ্যে ব্যসনই অনিষ্টজনক। ব্যসনীব্যক্তির ক্রমশঃ অধঃগতিই হয়। যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যসনবর্গের এক বা একাধিক বিষয়ে আসক্ত সেই ব্যসনীব্যক্তি। যে ব্যক্তি ব্যসনী, সে মৃত্যুর পরে নরকে গমন করে। কাজেই, ব্যসন শুধুমাত্র ইহলোকেই সর্বহর নয়, পরলোকেও সর্বহর। মৃত্যু ইহলোকে সর্বহর হলেও মৃত্যুর পর ব্যক্তি স্বর্গেও গমন করতে পারে। কিন্তু ব্যসনী ব্যক্তির স্বর্গে আশ্রয় না হওয়ায় ব্যসন ব্যক্তির পরলোকও নষ্ট করে থাকে। উক্ত আলোচনার পর মনে হতে পারে যে, ব্যসনী ব্যক্তির মৃত্যু যেহেতু অবধারিত, সেহেতু ব্যসনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিজেকে সংশোধনের আর কোন উপায় নেই। কারণ ভুলের সংশোধন করতে পারলেই ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান

পায়। কিন্তু মৃত্যু হলো জীবের সেই চরম অবস্থা যা ঘটলে সংশোধনের সুযোগ আর থাকে না। তাই এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্যসনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা মনে হয় সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। কারণ, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, যার নিজের মনের উপর আধিপত্য আছে সে খুব আনায়াসেই এই কাজ করতে পারে। নিজের মনের বল্গা যদি নিজের হাতে থাকে, তাহলে ব্যসনের বিষয়গুলির অতিরিক্ত মাত্রায় সেবা করা থেকে ব্যক্তি বিরত হবে। এই কারণে ব্যসনের বিষয়গুলির বারবার সেবা করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। এই কারণেই ব্যসনের বিষয়গুলির বারবার সেবা করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও বিষয়গুলির অল্প পরিমাণে সেবা নিষিদ্ধ না হলেও তা যখন ব্যসনে পরিণত হয়, তখন তা ব্যক্তির ধর্ম, অর্থ, কাম ও প্রাণ - সকলই বিনষ্ট করে। তবে, মদ্যপান প্রভৃতি যে ব্যসনগুলি অধিক অনিষ্টকর, সেগুলির অল্প পরিমাণ সেবা বা আশ্রয়ও অনুচিত; কারণ অভ্যাসের ফলে সেইসব ব্যসনে আধিক্য ঘটবেই। এই কারণেই এগুলি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম। ব্যসনের বিষয়গুলির অল্প পরিমাণে সেবার পর ব্যক্তি যখন বুঝবেন যে, সেই বিষয়ের সেবার ফলে তার অনিষ্ট হচ্ছে বা তাকে জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করবেন এবং ভুল পথকে অর্থাৎ ব্যসনের পথকে পরিত্যাগ করে সঠিক পথ বেছে নেবেন। এখানেই দুঃখের সার্থকতা। সুতরাং, বাস্তব জীবনে দুঃখ ব্যক্তির উত্তরণ ঘটায়, সামগ্রিক উন্নতি ঘটায়।

তা ছাড়া, কোনো বিষয়ের প্রতি ভয়ও সেই বিষয়ের চর্চা থেকে ব্যক্তিকে নিবৃত্ত রাখে। ব্যসনের বিষয়ের সেবার ফলে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে স্বর্গ তো নয়ই, বরং নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। নরকে গমনের এই ভয়ও ব্যক্তিকে ব্যসনে প্রবৃত্ত হতে বাধা দেয়। সুতরাং, কোন্ বিষয়ের সেবা করলে কী ধরনের দুঃখভোগ ব্যক্তিকে করতে হবে - একথা শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল যে, কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি ফলে যদি পরিণামস্বরূপ দুঃখভোগ করতে হয়, তাহলে ঐ ভোগের

সম্বন্ধে অবগত হয়ে ব্যক্তি ঐ কর্ম থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে। সুতরাং, ব্যক্তি দুঃখভোগ না করেও কেবলমাত্র দুঃখভোগের কথা শুনেও নিজের সংশোধন করতে পারে। সুতরাং, কোন কর্মের সম্পাদনে কী দুঃখের ভোগ হবে - শাস্ত্রে একথা যে বলা হয়েছে, তার থেকেও ব্যাবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হতে পারি। কারণ, দুঃখভোগের ভয় ব্যক্তিকে অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে বাধা দিয়ে থাকে।

যোগসূত্রে কর্মবাদ সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

কর্মবাদ বলে, যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু কর্ম কীভাবে ফল প্রদান করে, তা এক জন্মেই ফলপ্রদান করে অথবা পরবর্তী কোন জন্মে ফলপ্রদান করে - এই বিষয়ে আমরা সকলেই অজ্ঞ। যোগসূত্রকার কর্মবাদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ কর্মবাদের রহস্য একটু হলেও বুঝতে পারেন। সেখানে জন্মান্তরের সমর্থনেও আলোচনা রয়েছে। এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা এখানেই যাতে কর্মবাদের রহস্য অবগত হয়ে মানুষ পাপমূলক কর্মে লিপ্ত না হয়; কারণ, পাপ বা অধর্মই দুঃখের জনক, যা কোন না কোন জন্মে অনিবার্যভাবে ফলপ্রদায়ী। আসলে আমরা নিজেরাই আমাদের ভবিষ্যতকে তৈরী করি। তাই মানুষকে কর্মবাদের বিষয়ে অবগত করার অর্থ হল, কিছুটা ভীত হয়েই যাতে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত না হয় তারই প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

যোগদর্শনে বলা হয়েছে, কর্মাশয় বা কর্মসংস্কার দ্বিবিধ; যথা - ধর্ম ও অধর্ম। চিত্তের কোন ভাব হলে তার যে ছাপ চিত্তে ধরা থাকে, তাকেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার আবার দুই প্রকার - সবীজ সংস্কার ও নির্বীজ সংস্কার। সবীজ সংস্কার অজ্ঞানমূলক বা ক্লিষ্টবৃত্তিজনিত হতে

পারে, আবার প্রজ্ঞামূলক বা অক্লিষ্টবৃত্তিজনিত হতে পারে। ক্লিষ্টবৃত্তিজ সবীজ সংস্কারই হল কর্মাশয়।

যাই হোক, কাম, লোভ, মোহ, ক্রোধ - এই ক্লেশ সকল থেকেই ধর্ম অর্থাৎ পূণ্যকর্মাশয় ও অধর্ম অর্থাৎ অপূণ্যকর্মাশয় উৎপন্ন হয়। এই সকল কর্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আবার কতকগুলি অদৃষ্টবেদনীয়। কর্ম যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তার ভোগ বা পরিপাক হয়, তাহলে তা দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম। যেমন, তীব্র বিরাগের সাথে আচরিত মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধির দ্বারা নিবর্তিত যে পূণ্যকর্মাশয়, অথবা পরমেশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভব বা মহাত্মগণের আরাধনার দ্বারা পরিনিষ্পন্দ যে পূণ্যকর্মাশয়, তা সদ্য অর্থাৎ যে জন্মে সম্পাদিত হয়, সেই জন্মেই পরিপাক বা ভোগ উৎপন্ন করায় এগুলি হল দৃষ্টজন্মবেদনীয় পূণ্য কর্মাশয়। আবার, উৎকট অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্বক ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, শরণাগত অথবা মহানুভব তপস্বীদের প্রতি বারবার অপকার করলে তার থেকে উৎপন্ন যে পাপ কর্মাশয় তাও সদ্য বিপাকগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এটি হল দৃষ্টজন্মবেদনীয় পাপকর্মাশয়ের উদাহরণ। দৃষ্টজন্মবেদনীয় পূণ্য কর্মাশয়ের মূর্ত উদাহরণস্বরূপ ভাষ্যকার বালক নন্দীশ্বরের উল্লেখ করেন। রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনার মাধ্যমে মৃত্যুর পূর্বেই মনুষ্য পরিণাম বা মনুষ্য শরীর ত্যাগ করে দেবশরীর লাভ করেছিলেন। আবার, দৃষ্টজন্মবেদনীয় পাপকর্মাশয়ের মূর্ত উদাহরণ হিসাবে ভাষ্যকার নহুষ রাজার কথা বলেন, যিনি ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত হয়েও মহর্ষির শাপবশতঃ দেবত্ব পরিত্যাগ করে তির্য্যক রূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগর-এ পরিণত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন যে, যারা নারক অর্থাৎ যাদের পাপকর্মাশয়ের ভোগ নরকে হবে, তাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় থাকতে পারে না; কারণ, মনুষ্য শরীরের দ্বারা নরকভোগ, যা দীর্ঘকাল ভোগ্য, সম্ভব নয়। ফলতঃ পাপকর্মবশতঃ নারকগণের নরকভোগের জন্য তদুপযোগী শরীরের প্রয়োজন হয়, যা মৃত্যুর পরে তথা মনুষ্য

শরীরের অবসানের পরেই সম্ভব। আবার, ভাষ্যকার এও উল্লেখ করেন যে, যে যোগীগণের ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয়েছে, তাঁদের সকল কর্মাশয়ই দৃষ্টজন্মবেদনীয়, তাঁদের অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় নেই; কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ রাখার পর বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হন।

কর্মফলের ভোগ যে জন্মান্তরেও সম্ভব - এইকথার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্যই যোগভাষ্যকার অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের অবতারণা করেছেন। কারণ, আমরা অনেকক্ষেত্রেই দেখি যে, দুরাচারী ব্যক্তির জীবন সুখে অতিবাহিত হচ্ছে, পাপীর কষ্টভোগের পরিবর্তে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, পুণ্যবান জীবনে দুর্বিসহ কষ্ট ভোগ করছে ইত্যাদি। এইসব দেখে অনেকেরই ধর্মাধর্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু এইরূপ অবিশ্বাস করা উচিৎ নয়; কারণ পাপ বা পুণ্য উৎকট হলে তবেই তা দৃষ্টজন্মবেদনীয় হয়, অন্যথায় তা জন্মান্তরে ফল প্রদান করে থাকে।

এখন, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ থাকলে ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়, কিন্তু কারণস্বরূপ ঐ ক্লেশসকল উচ্ছিন্ন হলে তা আর হয় না। উপমাস্বরূপ ভাষ্যকার বলেছেন, শালিতণ্ডুল বা ধান্যবীজ তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকলেই তা অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু অপনীততুষ বা তুষের বিমোক করলে তা থেকে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হতে পারেনা। অনুরূপভাবে, ক্লেশযুক্ত হয়েই কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়ে থাকে; কিন্তু ক্লেশ অপনীত হলে বা প্রসংখ্যান ধ্যানের দ্বারা ক্লেশবৃত্তি দগ্ধবীজভাব হলে, তা আর ফলজননে সমর্থ হয় না।

যাই হোক, কর্মাশয়ের বিপাক বা পরিণাম ত্রিবিধ; যথা - জাতি (মনুষ্যাদি জন্ম), আয়ু (জীবনকাল) ও ভোগ (সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার)। আমরা জানি যে, কর্ম মাত্রই তা ফলপ্রদায়ী। এটিই কর্মবাদের মূলকথা। যোগভাষ্যকার কর্মফলসম্বন্ধে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম বিচার্য হল যে, একটি কর্ম (ধর্ম বা অধর্মরূপ) কি একটি জন্মের কারণ হয়? অথবা একটি কর্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে?

ভাষ্যকারের দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হল, অনেক কর্ম কি যুগপৎ অনেক জন্মের কারণ হয়? অথবা অনেক কর্ম একটি জন্মের কারণ হয়?

ভাষ্যকার উক্ত দ্বিবিধ বিষয় আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা হল - জন্ম ও মরণের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তি কর্তৃক যে সকল বিচিত্র কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম প্রধান ও অপ্রধানভাবে স্থিত মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং সেই পুণ্য ও অপুণ্য কর্মাশয় যুগপৎ মিলিত হয়ে মরণসাধন ক'রে একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ভাষ্যকার প্রথম বিচার্য বিষয়ের বিকল্প দু'টির খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি কর্ম একটি জন্মের কারণ - এই কথা বলা যায় না; কারণ, এইরূপ বললে অনাদিকাল থেকে যেসকল জন্মান্তরীয় সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ অবশিষ্ট আছে এবং বর্তমান শরীরে কৃত কর্মের ফলের উৎপত্তি - এদের পৌর্বাপর্যের মধ্যে কোন নিয়ম থাকবে না। তার ফলে সাধারণ লোকের ধর্মানুষ্ঠানে আশ্বাস থাকবে না। আবার, একটি কর্ম অনেক জন্মের কারণও হতে পারে না, কারণ অসংখ্য কর্মের মধ্যে একটিমাত্র কর্মই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে, তা হলে ঐ কর্মটি ব্যতীত অবশিষ্ট কর্মরাশির বিপাক বা ফলভোগ হবে কীভাবে? কাজেই, অবশিষ্ট কর্মের ফলাফল বা বিপাককালের অবসর না হওয়ার কারণে এই বিকল্পটাও বর্জিত হল। এখন যদি প্রশ্ন হয়, অনেকগুলি কর্ম অনেক জন্মের কারণ - একথা বলা যায় কি? ভাষ্যকারের মতে, তাও বলা যায় না; কারণ, অনেক জন্ম একেবারে নিষ্পন্ন হয় না। অর্থাৎ একটি জন্মের পর অপর জন্ম ক্রমে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু একথা বললে পুনরায় আগের মতো দোষ ঘটে। অর্থাৎ কর্মান্তরের বিপাকের সময়াভাবসংক্রান্ত দোষ থেকে এই বিকল্পটিও নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং, পরিশেষানুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, অনেক কর্ম একটি জন্ম নিবর্তিত করে। কাজেই ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত হল, কর্মাশয় হল একভবিক, অর্থাৎ একটি জন্মের কারণ। একটি শরীরের

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে কর্তার দ্বারা যেসব কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তারাই প্রধান ও অপ্রধানভাবে অবস্থান করে এবং সেই পুণ্য ও অপুণ্য কর্মাশয় মরণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং তারা একত্র মিলিত হয়ে মরণসাধনপূর্বক একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। এইকথা বললে আর পূর্বের দোষ হয় না; কারণ, এক একটি জন্মে যেমন অনেক কর্ম উৎপন্ন হয়, তেমনি একটি জন্মের দ্বারাও অনেক কর্মের বিপাক অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে আয় ও ব্যয় তুল্য হয়ে পড়ে। যে কর্মাশয় জন্ম নিষ্পন্ন করে, সেই জন্ম সেই কর্মাশয়ের দ্বারাই আয়ু লাভ করে এবং ঐ কর্মাশয়ের দ্বারাই ঐ আয়ুতে সুখ ও দুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কর্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ হওয়ায় তা ত্রিবিপাক বলে কথিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কর্মাশয় যেমন ত্রিবিপাক হয়, তেমনি একবিপাকারম্ভক, আবার দ্বিবিপাকারম্ভকও হয়ে থাকে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় শুধুমাত্র ভোগের (একটি বিপাকের) হেতু হলে তাকে একবিপাকারম্ভক বলে (যেমন, নহুষ রাজার)। আর, দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় যখন আয়ু ও ভোগ উভয়ের জনক হয়, তখন তাকে দ্বিবিপাকারম্ভক বলে (যেমন, নন্দীশ্বরের আয়ু ছিল মাত্র আটবছর; কিন্তু শিবের বরের দ্বারা তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদুপযুক্ত ভোগ হয় তাঁর)।

কর্মাশয় নিয়ত বিপাক আবার অনিয়ত বিপাক উভয়ই হতে পারে। যেসব কর্মাশয়ের পরিণাম-সময় অবধারিত থাকে, অর্থাৎ যেগুলি নিজের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব করে, সেগুলি নিয়তবিপাক। আর, যেসব কর্মাশয়ের পরিণাম কীভাবে হবে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না, সেগুলি অনিয়ত বিপাক। এখন, দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়তবিপাক কর্মাশয় একভবিক হয়; অর্থাৎ তা সম্পূর্ণভাবে সেই জন্মেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মাশয়ের পক্ষে একভবিকত্বের ঐ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না; কারণ, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক

কর্মাশয়ের তিন প্রকার গতি হতে পারে; যথা, প্রথমতঃ বিপাক উৎপন্ন না করেই কৃত কর্মাশয়ের নাশ হতে পারে। যেমন, পাপের দ্বারা পুণ্য নষ্ট হয়, আবার পুণ্যের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। ক্রোধমূলক আচরণের ফলে যে পাপ-কর্মাশয় জন্মায়, তা অক্রোধ অভ্যাসের মতো পুণ্যের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সুতরাং, কর্ম করলেই যে তার ফলভোগ অনিবার্য - এই কথা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রসূ হয় যেসব কর্মাশয় তা হল প্রধান কর্মাশয়, যা ফলদানের জন্য উন্মুখ থাকে। আর, প্রধান কর্মাশয়ের বিপরীত কর্মাশয় হল অপ্রধান কর্মাশয়, যা স্বাধীনভাবে ফলপ্রসূ হয় না, বরং প্রধান কর্মাশয়ের সহকারি হয়। যেমন, যজ্ঞের ফলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাগানুকূল হিংসার ফলে যে অল্প পরিমাণ পাপ বা অধর্ম উৎপন্ন হয়, তা যদি ভুলবশতঃ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উচ্ছেদ করা না হয়, তাহলে যজ্ঞরূপ প্রধান কর্মফলের উদয়ের সময় ঐ অল্প অধর্মেরও বিপাক হয়, ফলে অনর্থ জন্মায়। তবে, যজ্ঞের ধর্মজনিত সুখের সমুদ্রস্বরূপ স্বর্গভোগের মধ্যে ঐ সামান্য অধর্মজনিত দুঃখ আগুনের ফুলকির মতো, যা সহজেই সহ্য করা যায়। এই প্রকার প্রধান ও অপ্রধান কর্মাশয়ের সমষ্টিই ভবিষ্যত জন্মের হেতু। কিন্তু প্রধান কর্মাশয়ের সাথে একত্রভাবে অপ্রধান কর্মাশয়ের বিপাক হওয়ায় তার ফল (অপ্রধানের ফল) ক্ষীণভাবে অভিব্যক্ত হয়। এই কারণেই অপ্রধান কর্মাশয় সম্বন্ধে একভবিকত্বের নিয়ম খাটে না। তৃতীয়তঃ অতি প্রবল বা প্রধান কোন কর্মাশয়ের বিপাক হলে তার অন্যরূপ অপ্রধান কর্মাশয় অভিভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার ফল তখন হয় না; কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ কর্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হলে তার বিপাক হতে পারে। এক্ষেত্রেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম অভিভূত হয়ে থাকে বলে সেইস্থলে একভবিকত্বের নিয়ম অনুসৃত হয় না।

তবে, যোগসূত্রকার একথা বলেছেন যে, জন্ম, আয়ু ও ভোগ পুণ্যের দ্বারা সম্পাদিত হলে সুখের কারণ হয়, এবং পাপের দ্বারা সম্পাদিত হলে দুঃখের কারণ হয়।[১৬৭] সর্বজনপ্রসিদ্ধ এই দুঃখ প্রতিকূল স্বভাব। তবে, যোগীগণ বৈষয়িক সুখকালেও দুঃখের অনুভব করেন; কারণ, তাঁরা বিষয় সুখকেও দুঃখ বলে মনে করেন।[১৬৮]

গরুড় পুরাণে বর্ণিত কর্মানুসারে যোনিপ্রাপ্তি ঃ

আগেই আমরা দেখলাম যে, কর্মই আমাদের ভবিষ্যত গঠন করে; অর্থাৎ আমাদের স্বসম্পাদিত কর্মই আমাদের সুখ-দুঃখাদি ভোগের হেতু। পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ন্যায়দর্শনেও একথা স্বীকার করা হয়েছে যে, জীবের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভালো বা মন্দ কর্মের কারণেই কেউ সুখী, কেউ বা দুঃখী; কেউ উচ্চ বংশজাত, কেউ নিম্ন বংশজাত; কেউ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কেউ রোগে জর্জরিত; কেউ স্ফীত, কেউ কৃশ; কেউ বা সুন্দর কেউ কুৎসিৎ ইত্যাদি। অর্থাৎ কর্মানুসারেই জীব জন্মলাভ করে থাকে। গরুড় পুরাণেও এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। গরুড় পুরাণ বলেছেন, জীবের পূর্বকৃত কর্মের বিভেদের জন্যই জগতের প্রাণীদের ভোগের নানত্ব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জীবের কর্মের তারতম্যেই জন্মের তারতম্য হয়ে থাকে। কর্মের জন্যই জীব সংসার-বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। পূর্বজন্মে যে ব্যক্তি মহাপাপ করেছে, সে মহাপাতক থেকে জাত ঘোর নরক ভোগের শেষে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব

---

[১৬৭] 'তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ।' - যোগসূত্র ২।১৪।।

[১৬৮] 'যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ।।' - যোগসূত্রভাষ্য ২।১৪।।

ইত্যাদি হল দুঃখদায়ী জন্ম।[১৬৯] পাপানুসারে নরক যন্ত্রণা ভোগের শেষে নরক থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পাপীরা কৃমি, কীট-পতঙ্গাদি তির্যক যোনি প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। পাপীরা গর্দভ, ঘোড়া ইত্যাদি রূপে একখুর বিশিষ্ট প্রাণীর যোনিতে, আবার পাঁচ নখবিশিষ্ট প্রাণির যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে। তারপর ক্রমে মানুষরূপে কুৎসিত, কুঁজো, বামন, চণ্ডাল বা অধম জাতির যোনিতে জন্মে থাকে। এইভাবে বারবার পাপক্ষয় হলেও জীব প্রতি জন্মেই কিছু না কিছু পাপ-পুণ্য উৎপন্ন করে। ফলতঃ অবশিষ্ট পাপ-পুণ্যের ভোগের জন্য জীবকে বারবার জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এই জগৎ-সংসারে ফিরে আসতে হয়। জীব ক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ক্রমে উচ্চ যোনিতে জন্মায় এবং ক্রমে কর্মের প্রকৃতি অনুসারে পুণ্যবলে দেবত্ব ও ইন্দ্রত্ব ইত্যাদিও লাভ করে থাকে।[১৭০]

যাই হোক, কী পাপের ফলে কোন্ ধরনের জন্মলাভ হয়ে থাকে, সে ব্যাপারে গরুড় পুরাণ আমাদের অবহিত করিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

১) ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি মৃগ, অশ্ব, শূকর ও উটের যোনিতে জন্মে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়।

২) যে ব্যক্তি গুরুপত্নীগামী হয়, সে ঘাস, লতা, গুল্মরূপে জন্মে থাকে, ক্রমে কর্কশ শরীরবিশিষ্ট হয়।

৩) যেসব ব্যক্তি পতিত, তাদের সাথে সহবাস করলে পতিত হতে হয়।

৪) ধর্মপত্নী পরিত্যাগকারী ব্যক্তি বোবা হয়ে জন্মায়।

৫) গুরুজনের নিন্দাকারী ব্যক্তি ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়।

---

[১৬৯] গরুড় পুরাণ, উত্তর খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পুরাণ সংগ্রহ - ৩, প্রধান সম্পাদক গৌরীনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ - ৩৩৬।

[১৭০] তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ - ৩৪০।

৬) মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তোৎলা হয়ে জন্মায়।

৭) বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিরা মাথাব্যথা ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হয়।

সুতরাং, জীব তার নিজ নিজ পাপ অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্মে থাকে এবং যন্ত্রণা ভোগ করে।

গরুড় পুরাণে বর্ণিত মৃত্যুর স্বরূপ এবং নরক যন্ত্রণা ঃ

জীবের পূর্বজন্মের কর্ম যেমন তার বিশেষ যোনিপ্রাপ্তিকে নির্দিষ্ট করে, তেমনি মৃত্যুর মুহূর্ত সুখকর হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক হবে, তাও জীবের কর্ম দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, কাল মৃত্যুর সময় জীবনের সকল লক্ষণকে সংহার করে থাকে। অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত সুখের বা যন্ত্রণার যাই হোক না কেন কালই জীবের জীবনের সংহারকর্তা। এই পুরাণ মতে, যে সব ব্যক্তি মিথ্যা বলে না, বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায় না, আস্তিক এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবান তাদের সুখে মৃত্যু হয়। তা ছাড়া, কাম, ক্রোধ বা দ্বেষবশতঃ যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম পরিত্যাগ না ক'রে যথাযথভাবে কর্মানুষ্ঠান করে এবং ক্ষমাশীল হয়, তা হলে সেই ব্যক্তির সুখে মৃত্যু হয়।[১৭১] এই পুরাণে মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণনার সময় জীবের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। যেমন, প্রথমতঃ কাল কোন ব্যক্তিকে সংহার করার পূর্ব মুহূর্তে যদি সেই ব্যক্তি কুপথ্য ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহলে দৈবযোগে ঐ ব্যক্তির শরীরে রোগ উৎপন্ন হয় এবং ফলতঃ ক্রমশঃ তার ইন্দ্রিয়ের বিকলতা ও শক্তিহীনতা উৎপন্ন হয়ে থাকে। আবার, কোন ব্যক্তির শরীরে হঠাৎ শত

[১৭১] তদেব, পৃ - ৩৩৫।

শত বিছা দংশন করার মতো যন্ত্রণা হয়, তবে তার মারাত্মক রোগ হবে - এমনই অনুমান করতে হয়; তখনই ঐ ব্যক্তির শরীর বিকল হয়ে জড়বৎ হয়ে পড়ে ও জ্ঞান হারায়। সেইসময় নিকটস্থ যমদূতগণ ঐ রোগীর পাঁচটি প্রাণকে সবলে আকর্ষণ করতে থাকে এবং ফলতঃ রোগী বীভৎসরূপ ধারণ করে; তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। ব্যক্তির মুখ দিয়ে তখন ফেনা নির্গত হতে থাকে এবং তার মুখ লালাযুক্ত হয়। সেই সময় ব্যক্তি ভয়ে ত্রাসে হাহাকার করতে থাকে এবং ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে আর এক প্রকার মৃত্যুযন্ত্রণার কথা বলেছেন। অনেক সময় এমন হয় যে, কুপিত বায়ু চালিত হয়ে দেহের তাপ ব্যক্তির হৃদয় ভেদ করে। তাপ দীপ্যমান হলে তার নিবারণের জন্য কোন খাদ্য-পানীয় ব্যবহার করা হয় না; ফলে দেহ ধাতুর শোষণ করে মর্মভেদ করে থাকে। উদান বায়ু উপরের দিকে যায়। ক্রমশঃ অন্যান্য দোষ প্রবল হয়ে ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে।

তৃতীয়তঃ যেসব ব্যক্তি অন্যকে মোহজ্ঞান দান করে অথবা কূট সাক্ষ্য দেয়, যারা মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক এবং বেদের নিন্দা করে, সেইসব ব্যক্তি মৃত্যুর সময় জ্ঞান হারায়। তাদের যমলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গদা, যষ্টি ইত্যাদি হাতে নিয়ে ভীষণ আকারবিশিষ্ট যমদূতেরা এসে থাকে। সেই জীবের শরীর তখন ভয়ে কম্পিত হতে থাকে এবং জীব সেই মুহূর্তে তার পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতিকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকে। তখন জীব অনেক চেষ্টা করেও একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না এবং ত্রাসের জন্য তার দৃষ্টি ঘুরতে থাকে, মুখ শুকিয়ে যায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণায় সে শরীর ত্যাগ করে।

উক্তভাবে মৃত্যুর স্বরূপ বা মৃত্যুকালীন জীবের যন্ত্রণার স্বরূপ উদ্ঘাটন করার পর ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে নরকের স্বরূপ বিষয়ে বলেছেন। মৃত্যু যন্ত্রণাতেই জীবের যন্ত্রণামুক্তি ঘটে

না; জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু অবধি জীব ইহলৌকিক যন্ত্রণা ভোগ করে; কিন্তু মৃত্যুর পরেও তার যন্ত্রণার অবসান হয় না; বরং জীবের পারলৌকিক যন্ত্রণা ভোগের সূচনা হয়। মৃত্যুর পর যমদূতগণ জীবকে স্বর্গ অথবা নরকে নিয়ে উপস্থিত করে। জীব স্বর্গে যাবে অথবা নরকে যাবে, তা তার পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যারা শুভ কর্মের সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্যার্জন করেছেন তথা পুণ্যবানেরা স্বর্গভোগ করে এবং অপরদিকে পাপীগণ নরকভোগ করে।

যেসব জীব পুণ্যবান, তাঁরা যম নির্দিষ্ট নির্মল বিমানে উত্তরণ করে দিব্যগন্ধ চন্দন লেপন করে ভ্রমণ করতে থাকেন। এইসব বিমান গন্ধর্বদের নাচ ইত্যাদি উৎসবে সমাকুল, হার, নূপুর আদি অলংকার শোভিত। জীবের পুণ্য ক্ষয় হলে তারা রাজা বা অন্যান্য রোগহীন সাধু, মহাত্মাদের কুলে জন্মে পুনরায় সংসারে ফিরে আসে এবং সৎ আচার পালন করে কর্মানুসারে উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয় অথবা নিকৃষ্ট যোনি লাভ করে।

এ তো গেল পুণ্যবানগণের পারলৌকিক ভোগের কথা। কিন্তু যারা পাপী, তাদের কষ্ট বা যন্ত্রণা প্রদানের জন্য নরকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। নরক বিভিন্ন ধরনের হয়। নরক মাত্রই তামস এবং মাটির নীচে অবস্থিত। যমই নরকের অধিকর্তা। জীবের পাপনুসারে পাপীদের সেখানে যন্ত্রণা দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন নরকে যন্ত্রণা ভোগের বিভিন্নতা আছে। ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে প্রধান সাতটি নরকের কথা বলেছেন এবং সেখানে পাপীগণ কী ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বিষ্ণু কর্তৃক বিবৃত সাতটি প্রধান নরক হল যথাক্রমে রৌরব, মহারৌরব, অতিশীত, নিকৃন্তন, অপ্রতিষ্ঠ, অসিপত্রবন এবং তপ্তকুম্ভ।

রৌরব নামক নরক হল প্রধান। এই নরক দুই হাজার যোজন বিস্তৃত। এই নরকে জানু অবধি গর্ত করে তাতে অঙ্গার ছড়ানো আছে। ফলতঃ এই নরক প্রচণ্ড উত্তপ্ত। যেসব

জীব মিথ্যাবাদী বা মিথ্যাসাক্ষ্যদান করে, যমদূতগণ সেইসব পাপীদের নিয়ে এই নরকে উপস্থিত করে থাকেন। সেখানে তারা দগ্ধ হয়ে নানদিকে ছুটতে থাকে এবং বারবার তাদের পদস্খলন হওয়ায় তাদের শরীর পুড়ে যায়। এভাবে এক হাজার যোজন পথ অতিক্রম করলে হয় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়, অথবা তার অন্য পাপ থাকলে সেই পাপনুসারে আবার অন্য নরকে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় নরক হল মহারৌরব। এই নরক পাঁচ হাজার যোজন বিস্তৃত। এখানে মাটির নীচে আগুন আছে এবং মাটি তামাপূর্ণ। মাটির নীচে আগুন থাকায় সেই তাপে উত্তপ্ত হওয়া মাটি বিদ্যুতের মতো দেখায়, যা পাপীদের চোখে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে থাকে। যমদূতগণ পাপীদের হাত-পা বেঁধে এই নিক্ষেপ করে এবং হাত-পা বাঁধা থাকার জন্য পাপীরা লুটিয়ে পড়ে এদিক সেদিক গড়াতে থাকে। এই নরকে আবার কাক, বক, নেকড়ে, পেঁচা, মশা, বিছা ইত্যাদি প্রাণী থাকায় তারা পাপীদের শরীর ভক্ষণ করতে থাকে এবং সেই যন্ত্রণায় তারা আকুল স্বরে কাঁদতে থাকে। ফলতঃ সেখানে সামান্য শান্তিও তারা পায় না। এইভাবে অযুত বছর নরকযন্ত্রণা ভোগের পর এই নরক থেকে পাপীরা মুক্তি পেয়ে থাকে।

তৃতীয় হল অতিশীত নরক। এই নরক মহারৌরবের মতোই পাঁচ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং ঘোর অন্ধকারাবৃত। নরকটির নাম থেকেই স্পষ্ট যে, এখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। যমদূতেরা পাপীদের এই নরকে নিক্ষেপ করলে তারা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় একে অপরের সাথে জড়াজড়ি করে কিছুটা ঠাণ্ডা নিবারণের চেষ্টা করে এবং ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে তাদের দাঁতগুলি ভেঙ্গে যায়। বায়ুর সাথে প্রবাহিত হিমের টুকরো তাদের শরীরে লাগলে সেই আঘাতে তাদের হাড় পাঁজর গুঁড়ো হতে থাকে। তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে সেখানকার মানুষদের গলিত মজ্জা, হাড়, রক্ত আদি ভক্ষণ করতে থাকে।

পরবর্তী নরক হল নিকৃন্তন। সেখানে কুমোরের চাকায় সব আরোপিত আছে এবং কালের সুতোর দ্বারা সেই চাকায় বেঁধে পাপীদের সবসময় উল্লেখন করা হয়ে থাকে। এভাবে হাজার হাজার বছর ঘুতে ঘুরতে যখন পাপ ক্ষয় হয়, তখন এই নরকভোগ থেকে পাপী মুক্তি লাভ করে।

পঞ্চম নরকের নাম অপ্রতিষ্ঠ। এখানেও পূর্ববর্তী নরকের মতো চাকা আছে; আবার ঘটীযন্ত্রের মতো যন্ত্রও আছে। এই নরকে নিক্ষিপ্ত পাপীদের মধ্যে কাউকে চাকায় ঘোরানো হয়, আবার কাউকে ঘটি যন্ত্রে আরোপ করিয়ে ঘোরানো হয়ে থাকে। পাপীদের শরীর উল্লেখনের ফলে তাদের কারোর রক্ত বমি হয়, আবার কারোর সব অন্ত্র মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, চোখ দু'টি বেরিয়ে আসে। এভাবে পাপীরা এই নরকে বহু যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে।

এরপরে আছে অসিপত্রবন। এটি হাজার যোজন বিস্তৃত এবং এখানকার ভূমিতে আগুন ছড়ানো। এই নরকের মাঝখানে স্নিগ্ধ পাতায় ছায়াঘেরা বন আছে। তবে, পাতাগুলি আপাতদৃষ্টিতে স্নিগ্ধ বলে মনে হলেও আসলে সেগুলি অসির মতো ধারযুক্ত। ফলতঃ পাপীরা এই নরকের অত্যন্ত তীব্র আগুনের তাপে তপ্ত হয়ে মহাকষ্ট পতে পেতে যখন সেই স্নিগ্ধবন দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাদের পা ঠাণ্ডা হয়ে আসলেও তারা অন্য যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। প্রবল বায়ুর প্রবাহে অসির মতো ধারযুক্ত পাতা পাপীদের শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তারা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে।

সপ্তম প্রধান নরক হল তপ্তকুম্ভ। এই নরকের চারিদিকে আগুনের শিখাময় গরম তেল ও লোহার চূর্ণে পূর্ণ কুম্ভ আছে। যমদূতগণ কর্তৃক পাপীরা সেইসব কুম্ভে নিক্ষিপ্ত হলে তাদের শরীর পুড়ে যায় এবং মজ্জা জ্বলতে থাকে। চিমি চিমি শব্দে তারা কুম্ভের মধ্যে ভাজা হতে থাকে এবং যমদূতরা মাঝে মাঝে হাতা দিয়ে তাদের ঘেঁটে দেয়।

উক্তভাবে সাতপ্রকার নরকে পাপীরা নানভাবে কষ্টভোগ করে তাদের পাপক্ষয় করতে থাকে। উক্ত সাতটি প্রধান নরক ছাড়াও রোধ, শূকর, তাল, তপ্তখল্ব ইত্যাদি অন্যান্য নরকও আছে। পাপ অনুসারে পাপীরা ভিন্ন ভিন্ন নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং পাপক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নরক যে মহাদুঃখময়, তা সর্বজনস্বীকৃত; অপরদিকে, স্বর্গ আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সুখের বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্গও সুখের নয়। জীব স্বর্গ প্রাপ্তির পর পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় নরকে যাওয়ার ভয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তা ছাড়া, স্বর্গ থেকে যারা নরকে যায়, তাদের নিদারুন দুর্গতি দেখেও স্বর্গের জীবেরা কষ্ট পেয়ে থাকে। সুতরাং, উক্ত আলোচনা থেকে একথাই স্পষ্ট হয় যে, স্বর্গ প্রাপ্তিও জীবের আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি ঘটায় না। জীবের আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি কেবলমাত্র মোক্ষ লাভের মাধ্যমেই সম্ভব।

গরুড় পুরাণে বর্ণিত গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন জীবের যন্ত্রণা ঃ

গরুড় পুরাণের উত্তরখণ্ডে জীবের গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন যন্ত্রণার বিষয়ে বলা হয়েছে। মৃত্যু সর্বকালেই দুঃখদায়ক বলে বিবেচিত হলেও জন্ম আনন্দের মুহূর্তরূপেই গণ্য হয়ে থাকে। তাই জন্ম সর্বদাই সুখের এবং আপাতদৃষ্টিতে সেখানে দুঃখ বা যন্ত্রণার কোন স্পর্শ নেই বলেই মনে হয়ে থাকে। কিন্তু গরুড় পুরাণ পাঠ করলে অবহিত হওয়া যায় যে, নবজাতকের পরিবার পরিজনের কাছে জন্ম বিষয়টি আনন্দের হলেও জাতকের গর্ভাবস্থা থেকে যোনিপিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময় মোটেই সুখকর হয় না। আমরা আগেই দেখেছি গরুড় পুরাণ মতে, নিজের পূর্বকৃত কর্মানুসারেই জীব মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। জীবের আয়ু, কর্ম, বিদ্যা, সম্পদ, মৃত্যু -

এগুলি গর্ভে ভ্রূণসঞ্চারের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়। মায়ের ভুক্ত দ্রব্যের রসের মাধ্যমে জীব মাতৃগর্ভে বড় হতে থাকে। সেই সময় জীব তার পূর্বের শত শত জন্মের স্মরণ করে। অর্থাৎ পূর্বে দেবতা, তির্যক, মানুষ ইত্যাদি যে বিভিন্ন জন্ম সে লাভ করেছিল, সেই সকল জীবনের অনুভূতি স্মরণ করে জীব মাতৃগর্ভে কষ্ট পায়। পূর্বে সংসারঘটিত নানা স্মৃতির জ্বালায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে সে মনে করে যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার মতো কোন খারাপ কাজ করবে না। কারণ, পুনরায় গর্ভে প্রবেশের অর্থ হল পুনরায় পূর্ব পূর্ব জন্মের অনুভূতির স্মৃতির জ্বালায় দগ্ধ হওয়া।

এইভাবে ক্রমে নয়মাস অতিক্রান্ত হলে জীব অধোমুখে ভূমিষ্ঠ হয়। জীব গর্ভে উপরের দিকে পা এবং নিচের দিকে মুখ করে থেকে বায়ুর আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যোনি থেকে নিঃসারিত হয়। যোনিপিষ্ট হওয়ার সময় জীব প্রাজাপত্য নামক বায়ুতে পীড়িত হয়ে থাকে। এই বায়ুর প্রভাবে সে বারবার মূর্ছা যায়। সেই সময় বৈষ্ণবী মায়া তাকে পুনরায় মোহিত করে; অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে জগতের মায়ায় জীব আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পূর্বের সব জ্ঞান তার বিলুপ্ত হয়। এমন কি গর্ভাবস্থায় সে যে সঙ্কল্প করেছিল, যাতে তাকে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করতে না হয়, সে সবও বিস্মৃত হয়। ফলতঃ জীব পুনরায় শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি দশা ভোগ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে থাকে।[১৭২]

[১৭২] তদেব, পৃ - ৩৪২।

অন্যের দুঃখ ঃ

ব্যাবহারিক জীবনে আমরা দেখি যে, সামাজিক জীবরূপে আমরা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকি। আসলে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের নিজেদের দুঃখ অপর ব্যক্তির দুঃখ-যন্ত্রণাকে বুঝতে সাহায্য করে থাকে। ব্যক্তির নিজের দুঃখের অনুভূতি না থাকলে সে কখনও অপরকে বুঝতে সক্ষম হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে রন্তিদেব-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের নবম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে আমরা রন্তিদেব নামে একজন রাজার কথা পাই। তাঁর মহিমা ইহলোক এবং পরলোক সর্বত্র গীত হয়; কারণ তিনি অন্যের দুঃখ নিয়ে ভেবেছিলেন।[১৭৩] তিনি এমনই দাতা ছিলেন যে, দৈববশে তাঁর যা প্রাপ্তি ঘটত, তার সবটাই তিনি দান করে দিতেন। নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখে দান করতেও তিনি বিরত থাকতেন না। একবার দীর্ঘদিন খাদ্য-পানীয়ের অভাবের জন্য তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সংকটাপন্ন অবস্থায়, ক্ষুৎপিপাসায় উৎপীড়িত হয়ে দিনযাপন করতে হয়েছিল। তারপর কেউ তাঁকে ঘি, পায়েস, হালুয়া, জল ইত্যাদি এনে দিল। তিনি ও তাঁর পরিবার যখন সেই খাদ্যগ্রহণ করতে উদ্যত, তখনই সেই মুহূর্তে এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। যেহেতু রাজা রন্তিদেব সবকিছুর মধ্যেই শ্রী হরিকে দর্শন করতেন, সেহেতু তিনি সশ্রদ্ধভাবে ব্রাহ্মণের ভোজন সৎকার করলেন। অবশিষ্ট খাদ্য যখন রন্তিদেব পরিবারের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোজন করতে গেলেন, তখন আবার অতিথিরূপে এক শূদ্রের আগমন ঘটল। রাজা নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যের কিছু অংশ শূদ্ররূপী অতিথিকে ভোজন করালেন। ভোজনান্তে শূদ্র বিদায় নিলে পুনরায় এক ব্যক্তি একপাল কুকুর নিয়ে হাজির হল এবং জানাল যে, কুকুরগুলি ক্ষুধার্ত, তাই রাজা তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।। যেটুকু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল রন্তিদেব তা সম্মানপূর্বক এবং ভগবদ্‌চিত্তে

---

[১৭৩] '...রন্তিদেৱস্য হি যশ ইহামুত্র চ গীয়তে।।' - শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।২।।

কুকুরদের উদরপূর্তির জন্য দিলেন। এরপর একজনের পিপাসা নিবৃত্ত হওয়ার মতো জল অবশিষ্ট রইল। সেই জলটুকু যখন রন্তিদেব তাঁর পরিবারসহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে পান করতে উদ্যত হয়েছেন, ঠিক সেইসময় এক চণ্ডাল এসে রাজার কাছে জল পানের জন্য করুণ আর্তি করল। চণ্ডালের অতি কষ্টে উচ্চারিত করুণ আবেদনে রাজা চণ্ডালের দুঃখে দুঃখিত হলেন। সেইসময় রন্তিদেব যা বলেছিলেন তা এককথায় অমৃতবাক্য। তা হল -

'ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।।'[১৭৪]

অর্থাৎ তিনি ভগবানের কাছে অষ্টসিদ্ধিসংযুক্ত পরমগতি প্রার্থনা করেন না, এমনকি মোক্ষও কামনা করেন না। তিনি শুধু চান যে, সমস্ত প্রাণীর অন্তরের বেদনা অনুভব করে সেই দুঃখ সহ্য করে তাদের দুঃখ দূর করতে।

দৈনন্দিন জীবনে দুঃখের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কুন্তীর দুঃখের আর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধর্মের নিধন এবং ধর্মের সংরক্ষণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বারবার তাঁর অবতাররূপ পরিগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে তাই তিনিই পাণ্ডবদের ফ্রেণ্ড, ফিলোসফার ও গাইড হয়ে চালিত করেছিলেন এবং সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে উত্তরার গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরীক্ষিৎকে রক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে। পাণ্ডব বংশকে নির্বংশ করার জন্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকল জীবের অন্তরস্থ আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, তিনি পাণ্ডবদের বংশ রক্ষার জন্য উত্তরার গর্ভকে নিজ মায়াকবচ দিয়ে এমনভাবে আচ্ছাদন করেছিলেন যে, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রও নিবারিত হয়ে গিয়েছিল। এই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে বলেছিলেন,

[১৭৪] তদেব, ৯।২১।১২।।

'ৰিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভৰতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভৰদর্শনম্।।'[১৭৫]

অর্থাৎ কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিপদের প্রার্থনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন যে, তাঁদের (পাণ্ডবকুলের) জীবনে পদে পদে বিপদ তথা দুঃখ আসুক; কারণ, বিপদের সম্মুখীন হলেই নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ সম্ভব হয় এবং তাঁর দর্শন হলে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়াতে হয় না। অর্থাৎ তাঁর দর্শন লাভ মোক্ষেরই নামান্তর। সুতরাং, দুঃখ জীবনে না আসলে মানুষ দুঃখ মুক্তির কোন পথ পাবে। একথাই কুন্তীর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। সেখানে কুন্তীকে আরো বলতে শোনা যায় যে,

'জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানৰমদঃ পুমাণ্।
নৈৰার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।'[১৭৬]

অর্থাৎ জাত, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও সৌভাগ্যের গর্বে যে ব্যক্তি গর্বিত, সে শ্রীকৃষ্ণের নামও উচ্চারণ করেন না; কারণ, তিনি কেবলমাত্র অকিঞ্চনদেরই দর্শন দান করেন। এই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ হল এই যে, যে ব্যক্তির জীবনে সুখের আতিশয্য, সে দুঃখের জ্বালাপোড়াকে অনুভব করেনি, সে কখনো দুঃখমুক্তির চেষ্টা করে না। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধের উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তির উপায় হল তাঁর দর্শন। তবে, বিপদসঙ্কুল দুঃখে নিমজ্জিত ব্যক্তিই তাঁর দর্শন পায় অর্থাৎ মুক্তি পায়।

বস্তুতঃ সংসারে সুখের প্রতি জীবের তৃষ্ণা আরো বেশী করে দুঃখের আহ্বান করে থাকে। শ্রীমদ্ভাগত মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ে আমরা পুরূরবার কথা পাই। পুরূরবা একসময় উর্বশীর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, উর্বশী তার চিত্ত আকর্ষণ করে

[১৭৫] তদেব, ১।৮।২৫।।
[১৭৬] তদেব, ১।৮।২৬।।

তাঁকে ত্যাগ করে যায়; আর অতৃপ্ত পুরূরবা উন্মত্ত অবস্থায় উর্বশীর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন এবং চলে না যাওয়ার আর্তি জানান। কামের মতো ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ের সেবনে পুরূরবা এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, বহু বছরের দিন-রাত্রি তাঁর অলক্ষ্যে কীভাবে কেটে গেছিল, তা তিনি বুঝতেই পারেননি। এই কারণে বিলাপ করে তিনি বলেছিলেন,

'সেৰতো ৰর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসৰম্।
ন তৃপত্যত্যাত্মভূঃ কামো ৰহ্নিরাহুতিভির্যথা।।'[১৭৭]

অর্থাৎ এই বক্তব্যের সারকথা এই যে, আহুতি যেমন অগ্নিকে তৃপ্ত করতে পারে না, তেমনি কামবাসনাও অগ্নির মতোই কখনো তৃপ্ত হয় না, তার যতই পরিপালন করা হোক না কেন।

সংসারের স্বরূপ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা দিয়েই এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে চলেছি। সংসারই হল বন্ধন একথা আমরা এই নিবন্ধের গোড়ার থেকেই বলে আসছি। সংসারে থেকেই আমরা অপরাপর ব্যক্তি ও বিষয়ের সাথে নানা সম্পর্কে আবদ্ধ থাকি। এইসব সম্পর্ক আমাদের সুখও যেমন দেয়, তেমনি দুঃখেরও হেতু হয়ে থাকে। তাই সংসারে থকেও কীভাবে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়, তার উপায় শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি রেখেই মানুষকে সংসারে থাকতে হবে; তা না হলে মানুষ আরো বিপদ, শোক, তাপ ইত্যাদির দ্বারা দগ্ধ হবে। মানুষ কাঁঠাল ভাঙার সময় হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙে যাতে হাতে কাঁঠালের আঠা না লেগে যায়। অনুরূপভাবে, সংসার হল আঠাল কাঁঠালের মতো, যা ভাঙতে হলে তথা সংসাররূপ কাঁঠালের দুঃখাদিরূপ আঠার দ্বারা মানুষের মন যাতে অধৈর্য না হয়, তার জন্য ঠাকুর ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেলের আশ্রয় নিতে বলেছেন। কারণ, বিষয়-চিন্তা উত্তরোত্তর মানুষের মধ্যে আসক্তিরই বৃদ্ধি করে। ভক্তির মাধ্যমেই সংসারের বিষয়-চিন্তাকে অতিক্রম করা সম্ভব। এই

[১৭৭] তদেব, ১১।২৬।১৪।।

প্রসঙ্গে ঠাকুরের প্রদত্ত বিভিন্ন উপমার উল্লেখ করা যায়। প্রথমতঃ ঠাকুর বলেছেন যে, সংসারে থাকতে হলে আমাদের বড় মানুষের বাড়ীর দাসী বলে মনে করেই থাকতে হবে; কারণ, বড়লোকের বাড়ীর দাসী নিজ দেশ ছেড়ে মণিবের বাড়ীতে থাকে, মণিবের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করে; কিন্তু সে মনে মনে ভালোই জানে যে, মণিবের বাড়ী বা ছেলে কোনটাই তার নিজের নয়; ফলতঃ তার মন পড়ে থাকে দেশে নিজের বাড়ির দিকে। এই উপমার মাধ্যমে ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের নিজেদের বড়লোকের বাড়ীর দাসী মনে করে সংসাররূপ মণিবের বাড়ীতে থাকতে হবে, যেখানে আমরা সবকিছুকে আপন বললেও আসলে প্রকৃত আপন হল ঈশ্বরে ভক্তি, যা দেশের বাড়ীর সমান। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের মনে যেন এই ভাব থাকে যে, জগৎ-সংসারে প্রকৃতপক্ষে নিজের কিছুই নেই, যতই তাতে আমাদের আপন-ভাব হোক না কেন; বরং ঈশ্বরই হলেন আমাদের আসল আপনজন। তাই ঈশ্বরেই মন ফেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ঠাকুর।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর অপর একটি উপমা দিয়ে বলেছেন যে, কচ্ছপ জলে চড়ে বেড়ালেও তার মন পড়ে থাকে আড়ায় যেখানে তার ডিম আছে। আমাদেরও সংসাররূপ জলে কচ্ছপের মতোই থাকতে হবে, যদিও মন রাখতে হবে ঈশ্বরে, যা ঐ আড়ায় পড়ে থাকা ডিমের সমান।[১৭৮]

সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ঠাকুর সংসার ত্যাগ করতে বলছেন না, বরং এই সংসারের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখতে বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের এইরকম ভাব রাখতে হবে যে, এই সংসার ঈশ্বরেরই। কারণ, সংসার ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। শরীর রক্ষা করতে, শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে শরীরের চাহিদা পূরণ করা একদিকে যেমন ব্যক্তির কর্তব্য, তেমনি অপরদিকে, পরিবার-পরিজন, সমাজ, দেশ, জগতের প্রতিও প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কর্তব্য

[১৭৮] শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খণ্ড, শ্রীম কথিত, পৃ - ২০।

থাকে। এই কর্তব্যের বন্ধন ত্যাগ করা অর্থাৎ কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি সহজ ব্যাপার নয়। সংসারে থাকতে হলে ব্যক্তিকে ভেবে নিতে হবে যে, এই সকল কর্তব্য ঈশ্বর কর্তৃক আরোপিত, যা আমাদের নির্লিপ্তভাবে, নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে। যে ব্যক্তি যত বেশী নিখুঁতভাবে তা পালন করতে পারবে, তার কর্তব্যের বন্ধনমোচন তত শীঘ্র হবে।

প্রশ্ন হয় যে, তবে কী এই কর্তব্যকে অস্বীকার করে সংসার ত্যাগ কখনই সম্ভব নয়? ঠাকুরের উত্তর হল, আমার আমিকে ত্যাগ করাই আসল ত্যাগ। এই 'আমি' অর্থাৎ কর্তৃভাব যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্যকে ত্যাগ বা অস্বীকার করা চলবে না। এই 'আমি' ভাব লুপ্ত হলেই ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য পাগল হতে পারে; আর তখনই কেবল কর্তব্য ত্যাগ সম্ভব হয়ে থাকে।[১৭৯]

----

[১৭৯] শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, স্বামী ভূতেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ - ৩৫ - ৩৭।

পঞ্চম অধ্যায়

দুঃখই মুক্তির সোপান

মুক্তি বা মোক্ষ ভারতীয় দর্শনের পরম প্রতিপাদ্য বিষয়। বহুবিধ বিষয় ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হলেও সেই সব আলোচনাই মোক্ষে গিয়ে থেমেছে। অর্থাৎ মোক্ষই ভারতীয় দার্শনিক আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এক এক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মুক্তি সম্পর্কে এক এক মত পোষণ করলেও সামান্যতঃ সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যা কিছু দুঃখদায়ক, তা থেকে আত্যন্তিক অর্থাৎ চিরকালের জন্য নিষ্কৃতিই হল মুক্তি। সুতরাং, দুঃখ আছে বলেই মুক্তির প্রশ্ন ওঠে, দুঃখের প্রসঙ্গেই মুক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা পায়। মানুষ ফাঁদে পড়লে যেমন ঐ ফাঁদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে, ঠিক তেমনি মানুষ দুঃখ নামক বন্ধনে আবদ্ধ হলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তথা মুক্তি লাভের চেষ্টা করে। এই কারণে দুঃখকে মুক্তির সোপান বলা যায়। 'সোপান' শব্দটির অর্থ সিঁড়ি বা ধাপ। সিঁড়ি আমাদের উপরে উঠতে সাহায্য করে। দুঃখকে যখন মুক্তির সোপান হিসাবে গণ্য করা হয়, তখন তার অর্থ এই যে, দুঃখ নামক সোপানের মাধ্যমেই মানুষের বন্ধনদশা থেকে মুক্তির পথে উত্তরণ ঘটে।

ন্যায়দর্শনেও আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার উদ্দেশের ক্ষেত্রে মহর্ষি গৌতম প্রচ্ছন্নভাবে উক্ত মতই সমর্থন করেছেন। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ - এই হল গৌতম কথিত দ্বাদশ প্রমেয়ের ক্রম।[১৮০]

[১৮০] ''আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাৰ-ফল-দুঃখাপৰর্গাস্তু প্রমেয়ম্।।'' - ন্যায়সূত্র ১।১।৯।।

শেষ প্রমেয় অপবর্গের অব্যবহিত পূর্বেই দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায় মতে, প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই অপবর্গ তথা মুক্তির প্রযোজক। সুতরাং, অপবর্গের অব্যবহিত পূর্বের প্রমেয় পদার্থ অর্থাৎ দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান হলে পরেই দুঃখের অত্যন্তবিয়োগ তথা মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। শাস্ত্রীয় মতানুসারে, জন্মই হল দুঃখ; কারণ জন্ম হলেই শরীর ধারণ করতে হয়। পূর্বেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয় যে, মুখ্য দুঃখ, শরীর, ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়, ষড়্‌বিধ অর্থ, ষড়্‌বিধ বুদ্ধি এবং সুখ - এই হল একবিংশতি প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। মুমুক্ষুর সামনে ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেও তাতে বিতৃষ্ণারূপ উপেক্ষাবুদ্ধি জন্মায়, যাকে বৈরাগ্য বলে। যে ব্যক্তির বৈরাগ্য জন্মেছে তিনিই বিরক্ত। এরূপ বিরক্ত ব্যক্তিই সাধনার ফলে কালে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে থাকেন। সুতরাং, দুঃখরূপ সিঁড়িতে না দাঁড়ালে মুক্তিরূপ সিঁড়িতে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটতে পারেনা।

প্রসঙ্গতঃ স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি হতে পারে যে, সোপানের মাধ্যমে যেমন উত্তরণ ঘটে, তেমনি তা নিম্নাভিমুখীও করে। তাই দুঃখ যদি মুক্তি লাভের সোপান হয় অর্থাৎ যদি দুঃখের আগুনের দগ্ধ হয়েই জীবের মুক্তির স্তরে উত্তরণ ঘটে, তাহলে মুক্তির স্তর থেকে অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থা থেকে পুনরায় দুঃখের স্তরে জীবের নিম্নগমনও সম্ভব হতে পারে। তবে, এরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়; কারণ, এই সোপান শুধু উত্তরণই ঘটায়, এক্ষেত্রে নিম্নগমনের কোন সম্ভাবনাই নেই। অর্থাৎ মুক্তি হল আত্যন্তিক দুঃখ নাশের অবস্থা। জন্ম যা স্বরূপতঃ দুঃখ, তার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। কাজেই, যে জীব মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না, মুক্তি এক চিরস্থায়ী অবস্থা। সাংখ্যকারিকাতেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মুক্তপুরুষের পুনরায় জন্ম স্বীকার করা যায় না; এমন কি মুক্ত পুরুষের অন্য কল্পেও বন্ধন স্বীকার করা হয়

না; কারণ তাহলে আর মুক্ত ও বদ্ধ জীবের মধ্যে কোন বিভেদ থাকে না।[১৮১] তাছাড়া মুক্তজীবের যে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এই বিষয়ে উপনিষদেও প্রমাণ আছে। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন, 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ'; ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন, 'ন চ পুনরাবর্ত্ততে'।[১৮২]

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অপবর্গ তথা মুক্তির স্বরূপ ঃ

দুঃখ কীভাবে মুক্তির সোপান তা আলোচনার পূর্বে মুক্তি কী, তা জেনে নেওয়া দরকার। ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে অপবর্গ তথা মুক্তি হল সর্বশেষ তথা চরম উদ্দিষ্ট প্রমেয়। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুঃখের স্বরূপ না জানলে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ বোঝা যায় না; তাই মহর্ষি দুঃখের লক্ষণ প্রদানের পরেই অপবর্গের লক্ষণ প্রদান করেছেন। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম অপবর্গের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, মুখ্য ও গৌণ সর্ববিধ দুঃখের অত্যন্ত বিয়োগই মুক্তি বা অপবর্গ।[১৮৩] দুঃখের অত্যন্ত বিয়োগ বা বিমুক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? - এরূপ প্রশ্ন হতে পারে। উত্তরে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, দেহাদি ফলের ত্যাগ তথা গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর দেহাদি ফল তথা পুনর্জন্মের অগ্রহণকেই দুঃখের আত্যন্তিক বিয়োগ বলা হয়।[১৮৪] বৈশেষিক দর্শনেও মুক্তি সম্বন্ধে অনুরূপ মতের সমর্থন

---

[১৮১] 'ন মুক্তসা পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপি অনাবৃত্তিশ্রুতেঃ' - সাংখ্যকারিকা ৬। ১৭।।
'অপুরুষার্থত্বমন্যথা' - সাংখ্যকারিকা ৬। ১৮।।
'অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ' - সাংখ্যকারিকা ৬। ১৯।।

[১৮২] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।২। ১৫।
ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮। ১৫। ১।

[১৮৩] 'তদত্যন্তবিমোপক্ষোঽপবর্গঃ।।' ন্যায়সূত্র ১।১।২২।।

[১৮৪] 'উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্যস্য চানুপাদানাম্।' - বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।২২।।

পাওয়া যায়। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বলেছেন, অদৃষ্টজ শরীরের সাথে সম্বন্ধই সংসার এবং সেই সম্বন্ধবিচ্ছেদই মুক্তি।[১৮৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রলয়কালে জীবের দেহাদি পরিগ্রহ না হওয়ায় দুঃখভোগও হয় না; কিন্তু প্রলয়কালীন জীবের এই অবস্থাকে দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তি বলা যায় না। প্রলয়কালে জীবের দুঃখ-ভোগ না থাকলেও এই দুঃখ-শূন্য অবস্থার সীমা আছে; কারণ, পুনঃসৃষ্টিতে ঐসব জীবেরই জন্মাদি দুঃখ-ভোগ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রলয়কালীন জীবের দুঃখ-শূন্য অবস্থা দুঃখের সর্বতোভাবে অবসানের অবস্থা নয়। দুঃখের সর্বতোভাবে অবসান একমাত্র অপবর্গ প্রাপ্তির মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ মোক্ষ প্রাপ্তি হলে আর জন্মাদি দুঃখের পুনরাবৃত্তি হয় না।

যাই হোক ন্যায়সূত্রকার যেভাবে মুক্তির লক্ষণ প্রদান করেছেন, তাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যে, মুক্তিতে আনন্দানুভূতি থাকে কিনা। মুক্তি যে আত্যন্তিক দুঃখবিমুক্তির অবস্থা - এই বিষয়ে সবাই একমত। তবে, কারোর মতে এই আত্যন্তিক দুঃখ-বিমুক্তিরূপ অবস্থায় নিত্যসুখের অভাব হয়; আবার কারোর মতে, মুক্তিতে নিত্যসুখের উপলব্ধি হয়। তবে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমুখ ন্যায়াচার্যগণ মুক্তিতে সুখানুভূতির বিরোধিতা করেছেন। বাৎস্যায়ন বলেছেন যে, মুক্তিতে আত্মার নিত্যসুখের অভিব্যক্তি তথা অনুভব হয় - এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অনুমান প্রমাণ অথবা শব্দ প্রমাণও নেই। আর যদিও মুক্তিতে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় - এইরূপ শাস্ত্রবাক্য বা শব্দপ্রমাণ থাকেও, তাহলেও বুঝতে হবে যে, সেখানে 'সুখ' শব্দটি আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থে গৃহীত হয়েছে। কারণ, দুঃখাভাব অর্থে যে 'সুখ' শব্দের প্রয়োগ হয়,

[১৮৫] বৈশেষিক সূত্র ৫।২।১৮।।

তা লৌকিক বাক্যেই দৃষ্ট হয়। আর মুক্তিতে যদি সুখাভিলাষ তথা সুখের প্রতি রাগের পরিত্যাগ না হয়, তাহলে মুক্তি সম্ভব হয় না; কারণ, রাগ বন্ধন বলেই জ্ঞাত।[১৮৬]

এখানে প্রসঙ্গতঃ অপর একটি প্রশ্ন জাগে। আমরা দেখলাম যে, মোক্ষ হল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যেও কোন মতবিরোধ নেই। তবে, মুক্তি প্রাপ্ত হলে দুঃখের নিবৃত্তি হয় - এই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ না থাকলেও এই নিবৃত্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তিরূপ অবস্থাটি কী দুঃখের প্রাগভাব না ধ্বংসাভাব না কি অত্যন্তাভাব - এই বিষয়ে বিরোধ আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলতে দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবকে বোঝায়। অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাবই মুক্তি। মুমুক্ষু ব্যক্তি 'আমার আর কখনো দুঃখ না হোক' - একথা ভেবেই মোক্ষকামী হন। অর্থাৎ মোক্ষার্থী ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাবই কামনা করেন। ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব হওয়ায় তা প্রাগভাবই হয়। ভবিষ্যৎ দুঃখ উৎপন্ন না হলে তার ধ্বংস হতে পারে না এবং তার প্রাগভাব থাকলে অত্যন্তাভাবও বলা যায় না। সুতরাং, দুঃখের প্রাগভাবই মুক্তি। তাছাড়া ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞান এগুলির উত্তরোত্তর অপায় তথা নিবৃত্তি হলে অপবর্গ বা মুক্তি হয়।[১৮৭] এই সূত্রের আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির ফলে দুঃখের যে অপায় বা নিবৃত্তি হয়, তা দুঃখের প্রাগভাবই।

এখানে আপত্তি করে অন্য সম্প্রদায় বলেছেন যে, প্রাগভাব অনাদি পদার্থ হওয়ায় তার উৎপত্তি নেই, ফলতঃ তা জন্য বা সাধ্য পদার্থ নয়; কিন্তু মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান সাধ্য পদার্থ হওয়ায় মুক্তি তথা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে দুঃখের প্রাগভাব বলা যায় না।

---

[১৮৬] ন্যায়সূত্রভাষ্য ১।১।২২।।

[১৮৭] ন্যায়সূত্র ১।১।২।।

কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে যাঁরা দুঃখ প্রাগভাব বলেছেন তাঁদের মতে, দুঃখ প্রাগভাবরূপ মুক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যতা আছে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের কারণের একবার উচ্ছেদ হলে আর কখনো দুঃখ উৎপন্ন হবে না। ফলতঃ তখন থেকে চিরকালই দুঃখ প্রাগভাব থেকে যাবে। দুঃখের পুনরায় উৎপন্ন না হওয়ায় ঐ প্রাগভাব আর কখনো বিনষ্ট হবে না। দুঃখের এই প্রাগভাবকে রক্ষা করার জন্য দুঃখের কারণ জন্মের নিরোধ করা প্রয়োজন। আবার, জন্মের নিরোধের জন্য ধর্মাধর্মরূপ প্রবৃত্তির নাশ প্রয়োজন এবং তা যাতে পুনরায় উৎপন্ন হতে না পারে সে দিকেও নজর দিতে হবে। তার জন্য মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক। মিথ্যাজ্ঞানের নাশের জন্য আবার তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং, এইভাবে দুঃখ প্রাগভাব তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। তত্ত্বজ্ঞানের পর মোক্ষার্থীর প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ হলে তখন থেকে দুঃখের যে প্রাগভাব থাকে, তার রক্ষাকে ক্ষেম বলে।[১৮৮] নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় উক্ত মতকে প্রাভাকর মীমাংসক মত বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা সমর্থনও করেছেন।

তবে, গঙ্গেশ উক্ত মতকে সমর্থন করলেও তিনি এর বিরুদ্ধে আপত্তিও করেছেন। অর্থাৎ উক্ত মতকে খণ্ডন করতে তিনি বলেছেন যে, প্রাগভাব হল তার প্রতিযোগীর জনক। প্রাগভাবের প্রতিযোগিজনকত্ব নিয়ম থাকায় প্রাগভাব তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হলেও মুক্তিকে দুঃখের প্রাগভাবরূপে স্বীকার করলে পুনরায় দুঃখের উৎপত্তিকে স্বীকার করতে হবে। কারণ, প্রতিযোগিজনকত্ব নিয়মানুসারে দুঃখ হল দুঃখপ্রাগভাবের প্রতিযোগী। অর্থাৎ প্রাগভাব থাকলে কোন কালে তার প্রতিযোগী উৎপন্ন হবেই। কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির কখনো দুঃখ উৎপন্ন হলে ঐ ব্যক্তিকে আর মুক্ত বলা যেতে পারে না। ফলতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি দুঃখপ্রাগভাব হতে পারে না।

---

[১৮৮] 'ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণং' অর্থাৎ যা আছে, তার রক্ষার নামই ক্ষেম।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে দুঃখপ্রাগভাব বলা হোক - এরূপ প্রাভাকর মতকে কোন নৈয়ায়িকই সমর্থন করেন না। নব্য নৈয়ায়িক গদাধর তাঁর ''নব মুক্তিবাদ'' গ্রন্থে বলেছেন যে, যেহেতু মুক্ত পুরুষের পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয় না, সেহেতু দুঃখের নিবৃত্তিকে দুঃখপ্রাগভাব বলা যায় না। তিনি মুক্ত পুরুষের দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সেই বস্তুর অভাবকেই প্রাগভাব বলে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যার উৎপত্তি অবশ্যই হবে, তারই উৎপত্তির পূর্বের অভাবকে প্রাগভাব বলে। কিন্তু যা কখনো উৎপন্ন হবে না, তা কখনো প্রাগভাবের প্রতিযোগী হতে পারে না। 'আমার দুঃখ না হোক' - এই প্রকার যে কামনা তাও উত্তরোত্তর কালের সম্বন্ধবিশিষ্ট দুঃখের অত্যন্তাভাব বিষয়ক। ঐ অত্যন্তাভাব নিত্য হলেও তাও প্রাগভাবের মতোই সাধ্যপদার্থ হতে কোন বাধা নেই। বস্তুতঃ গদাধর ভট্টাচার্যের মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের সাথে অত্যন্তাভাবের কোন বিরোধিতা নেই। তিনি দুঃখের প্রাগভাবের অভাববিশিষ্ট দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই 'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি' বলতে চেয়েছেন।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈশেষিকাচার্য শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক দর্শনের চতুর্থ সূত্রের উপস্কারে এই বিষয়ে প্রাভাকর মতকেই সমর্থন করেছেন। উক্ত মতের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে যে, মুক্ত ব্যক্তির আর ভবিষ্যত দুঃখ উৎপন্ন না হলে সেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে দুঃখপ্রাগভাব বলা যায় না। এর উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেছেন যে, প্রতিযোগীর জনকরূপ যে অভাব, তা-ই প্রাগভাব। তবে, প্রতিযোগীর জনক বলতে এখানে প্রতিযোগী উৎপন্ন করার যোগ্যতা বুঝতে হবে। অর্থাৎ দুঃখপ্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখের উৎপাদন করার কারণ বা হেতু হলেও মাত্র দুঃখপ্রাগভাবই দুঃখ উৎপাদন করতে যথেষ্ট নয়; কারণ, দুঃখের উৎপত্তিতে আরো অনেক কারণ আছে। সেই সকল কারণ বা হেতুর অনুপস্থিতিতে মুক্ত ব্যক্তির দুঃখ

উৎপন্ন হওয়ার আর কোন অবকাশ নেই। শঙ্কর মিশ্র দ্বিতীয় ন্যায়সূত্রের উল্লেখ করেও বলেছেন যে, দুঃখের প্রাগভাবই মুক্তি। কারণ, জন্মের অপায়ে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তা অতীত দুঃখ নয়, বরং ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবৃত্তি তথা ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব। ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব যে প্রাগভাবই তা অবশ্যস্বীকার্য। কাজেই, যে পদার্থ ভবিষ্যতে অনুৎপন্ন হবে, তারও প্রাগভাব স্বীকার করতে হবে - প্রভাকরের এই মতকে শঙ্কর মিশ্রও স্বীকার করেছেন। যে প্রাগভাব কখনো তার প্রতিযোগী উৎপন্ন করতে পারবে না, তাকে মীমাংসাশাস্ত্রে পশুপ্রাগভাব বলা হয়েছে। এই প্রকার প্রাগভাব গঙ্গেশ, বগদাধর প্রমুখ নৈয়ায়িক স্বীকার করেননি।

আবার, কোন কোন সম্প্রদায় আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলতে দুঃখের অত্যন্তাভাবকে বুঝিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থকগণ শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করেন। 'দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই মুক্তি বলা হয়েছে। কিন্তু শঙ্কর মিশ্র উক্ত মতের খণ্ডন করে বলেছেন, দুঃখের অত্যন্তাভাব নিত্য পদার্থ; সুতরাং তা সাধ্য পদার্থ না হওয়ায় পুরুষার্থ হতে পারে না। বস্তুতঃ উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবই অত্যন্তাভাবের সমানরূপে উক্ত হয়েছে। মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশও তাঁর ''ঈশ্বরানুমানচিন্তমণি'' গ্রন্থে উক্ত মতের খণ্ডন করে বলেছেন যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি তথা মুক্তি বলতে দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংসকেই বোঝায়।[১৮৯]

---

[১৮৯] ন্যায়দর্শন, চতুর্থ খণ্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ- ৪২৩ - ৪২৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৮।

দুঃখ থেকে উত্তরণের দৃষ্টান্ত ঃ

ন্যায়দর্শনে মুক্তির স্বরূপ আলোচনার পরে এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কম-বেশী দুঃখ থাকলেও মুক্তির স্বাদ আমরা পাই না। তবে, দুঃখ আমাদের জীবন-সংগ্রামে হারিয়ে দেয় না, বরং আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শেখায়। অর্থাৎ দুঃখ আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে দুঃখ আমাদের পূর্বের পরিস্থিতির থেকে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে কিছু পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখ করব যাঁদের জীবন-সংগ্রাম তথা জীবনের দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং অনুসরণীয়।

সীতা ঃ

দুঃখের অন্যতম উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; কারণ, রামায়ণের পরতে পরতে রয়েছে দুঃখ, বিষাদ, বেদনা, প্রিয়-বিরহের করুণ বিলাপ। বস্তুতঃ রামায়ণ রচনার প্রাক্কালের একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনার প্রভাবেই বাল্মীকি কর্তৃক বিষাদময় রামায়ণ রচিত হয়েছিল। একদিন প্রাতঃকালে তমসানদীতে শিষ্য ভরদ্বাজের সাথে মহর্ষি বাল্মীকি স্নানের জন্য রওনা হয়েছিলেন; তবে ঐ শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে তিনি পথে শুনেছিলেন এক আর্তনাদ এবং দেখেছিলেন যে, এক নিষ্ঠুর ব্যাধ কামমোহিত-ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে বধ করেছে। ক্রৌঞ্চ রক্তাক্ত, শরবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর সামনে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে ও ক্রৌঞ্চী প্রিয়-বিরহের কাতর ধ্বনি করতে করতে উপরে উড়ছে। এই দৃশ্য দেখে বাল্মীকির ব্যথিত কোমল হৃদয় থেকে নিষ্ঠুর ব্যাধের উদ্দেশ্যে অভিশাপরূপে যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য নিঃসৃত হয়েছিল, তাই ব্রহ্মা

কর্তৃক 'শ্লোক' বলে খ্যাত হয়। এই ঘটনা ঘটার পরই বাল্মীকি ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এই কারণে রামায়ণের প্রতি পর্বেই প্রিয় বিরহের নিদারুণ ব্যথা আমরা দেখতে পাই।

প্রথমেই যদি রাজা দশরথের প্রতি আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখি যে, তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র ছিলেন রাম। কিন্তু সুযোগ-সন্ধানী কৈকেয়ীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব-মুহূর্তে তাঁকে চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসন দিতে দশরথ বাধ্য হয়েছিলেন। রামের নির্বাসনের ষষ্ঠ দিনের রাত্রিতে রামের জন্য শোকে বিলাপ করতে করতে দশরথ প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তবে, মৃত্যুর পূর্বে দশরথ স্বীকার করেছিলেন যে, কুমার জীবনে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ ক'রে নদীতে জল পান করতে আসা মৃগ বা হস্তী ভেবে অজ্ঞাতে তিনি অন্ধ মুণির পুত্রকে হত্যা করেছিলেন এবং অন্ধমুণি দশরথকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তাঁরও মৃত্যু হবে পুত্রশোকেই। সুতরাং, দশরথের আপন কর্মফলই তাঁকে তাঁর পুত্রের জন্য বিলাপ করিয়েছে। অর্থাৎ অদৃষ্টই দশরথের থেকে রামকে দূরে সরানোর জন্য দায়ী। তবে, মৃত্যুর পর তিনি জানতে পারেন যে, রাম ঈশ্বরের অবতার।

প্রসঙ্গতঃ রামের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, ধর্মপালনের জন্য তিনি যাবৎ আত্মসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন। এই ত্যাগের মধ্যে মূলতঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রথমতঃ পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাস যাপন; এবং দ্বিতীয়তঃ রাজা হিসাবে অর্থাৎ রাজধর্ম পালনের জন্য প্রজানুরঞ্জনের জন্য নিজেই নিজের জীবন তথা সীতাকে ত্যাগ করে তাঁকে নির্বাসিত করা।

তবে, রামায়ণের সর্বাধিক দুঃখ-জর্জরিত চরিত্রের যদি অন্বেষণ করা হয়, তাহলে তা হলেন সীতা। তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করে মহাদুঃখের জীবন যাপন করেছিলেন। তবুও তিনিও তাঁর জীবনের এই দুঃখের জন্য নিজেকেই অর্থাৎ নিজ অদৃষ্টকেই দায়ী করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি চিরকালই নিজের ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সীতা সম্পর্কে তাঁর রচনায় বলেছিলেন যে, রামের চরিত্রের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা গেলেও সীতা চরিত্র আর হয়নি।[১৯০]

সমগ্র রামায়ণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সীতার মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন। কন্যারূপে তাঁর ছ'বছর কাটে; অযোধ্যায় স্ত্রীরূপে বারো বছর, বনবাসে প্রায় তের বছর, রাবণের কারাগারে প্রায় এক বছর, আবার এক বছর কাটে অযোধ্যায় এবং শেষ জীবনের বারো বছর তিনি কাটিয়েছেন বাল্মীকির তপোবনে। এই অল্প জীবনেই তিনি আমাদের কাছে আদর্শ কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে এবং মাতারূপে সর্বক্ষেত্রেই আদর্শ নারীর উজ্জ্বল ও অক্ষয় প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। তবুও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি চরম দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেই দুঃখ সহ্য করাকেই তাঁর কর্তব্য বলে স্বীকার করেছেন। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েই তিনি জীবনের সর্বত্র পূর্ণতার পথ খুঁজে পেয়েছেন এবং দুঃখ সহ্য করার মাধ্যমেই যে মোক্ষ বা জীবনের শ্রেষ্ঠ মার্গ লাভ করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা প্রদান করেছেন। অশোকবনে সীতার একবছর বন্দী অবস্থা এবং রাবণ বধের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে লোকনিন্দার ভয়ে রামকর্তৃক গর্ভাবস্থায় সীতার নির্বাসন - এই দু'টি দুর্বিসহ ঘটনা সীতার জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। সীতার জীবনের এই দু'টি বেদনাময় ঘটনাই আমরা এখানে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

---

[১৯০] স্বামীজীর বাণী ও রচনা; পৃ - ১১৪।

অশোকবনে রাবণকর্তৃক বন্দী অবস্থায় সীতা দুঃখের শরীরী মূর্তি হয়ে ওঠেন। দুঃখ যেমন শারীরিক ছিল, ততোধিক ছিল তাঁর মানসিক জ্বালা। উপবাসে শীর্ণ, ছিন্ন মলিন বসনে আবৃত দেহ - এ সীতার শারীরিক দুঃখ। অপরদিকে, চেড়ী রাক্ষসীবৃন্দের কঠোর শাসন, প্রীতি-লোভ-ভয় প্রভৃতি কৌশলের মাধ্যমে রাবণ কর্তৃক সীতার প্রতি প্রণয় নিবেদন, সর্বোপরি পতি ও দেবরের জন্য চিন্তা, উদ্‌বিগ্নতা - এইসব হল তাঁর মানসিক জ্বালা। অর্থাৎ এক কথায় তিনি যমযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। চেড়ীদের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি অশোকবৃক্ষের শাখা ধরে কেঁদেছেন এবং বিলাপ করে তিনি তাঁর জন্মান্তরে সম্পাদিত পাপকেই এই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণরূপে দায়ী করেছেন। আবার, রামের লঙ্কায় প্রবেশের পরে সীতাকে বশে আনার জন্য রাবণ মায়া দ্বারা রচিত রামের ছিন্ন মুণ্ড সীতাকে প্রদর্শন করলে সীতা বিলাপ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন (৬/৩২/৬)। আবার, সীতার মন কৌশল্যার জন্যও ব্যথিত হয়েছে - এ প্রমাণও আমরা রামায়ণে পেয়েছি (৬/৪৮/২৪-২৯)।

এখন প্রশ্ন হল এই যে, সীতার এই দুঃখ কীভাবে তাঁর উত্তরণে তাঁকে সহায়তা করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনার জন্য প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ত্যাগ ও সংযম - এই দু'টি হল ধর্মের মেরুদণ্ড। সীতা ছিলেন ত্যাগ এবং সংযমের মূর্ত প্রতীক। বস্তুতঃ রামের ধর্মসংস্থাপনায় সহধর্মিণীরূপে সীতা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে - 'যে সহে, সে রহে'। সীতা সহ্য করেছেন, তাঁর জীবনপথে আসা সব দুঃখ-যন্ত্রণাকে। দুঃখের আগুনে তিনি শুধু নিজেই দগ্ধ হননি, বরং তাঁর এই সহনশক্তির তেজেই রাম কর্তৃক রাবণবধ সম্ভব হয়েছে, তাঁর তেজেই লঙ্কা দগ্ধ হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুঃখের জ্বালা সহন করার মাধ্যমেই যে ব্যক্তি মোক্ষের পথে এগিয়ে যেতে পারটে - এই বিষয়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমরা

অশোকবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এটি পূর্বনির্ধারিত ছিল যে, সীতা যত বেশী সহ্য করবেন, ততই লঙ্কা-ধ্বংস, রাবণ-বিনাশ আশু সম্পাদিত হবে। বস্তুতঃ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের ইচ্ছা ছাড়া তৃণের মতো একটি তুচ্ছ বিষয়ও নড়ে না। এ কথার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন উপনিষদ্-এ পেয়ে থাকি। কেনোপনিষদ্-এ দেখি যে, অগ্নিদেব বা বরুণদেব তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একটি তৃণকে দগ্ধ করতে বা উড়িয়ে দিতে চাইলেও তা করতে সমর্থ হননি, কারণ তা ব্রহ্মের ইচ্ছার দ্বারা স্বীকৃত হয়নি।[১৯১] সুতরাং, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম হলেন দেবতার দেবতা, তিনিই সর্বশক্তির আধার; দেবতারাও তাঁর ইচ্ছার অধীন; অর্থাৎ সকল লোকই তাঁর শক্তি দ্বারা শাসিত হচ্ছে।[১৯২] কাজেই, উপনিষদীয় প্রমাণের আলোতে একথাই সিদ্ধ হয় যে, সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা ব্যতীত যেমন একটি তৃণও স্থান পরিবর্তন করে না, ঠিক তেমনই সীতার অদৃষ্টে যে পরিমাণ দুঃখ লিখিত, তা সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। অশোকবনে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বারবার আমরা সেই প্রমাণ পেয়ে থাকি।

প্রথমতঃ অতিশয় শোকে এবং ভয়ে যখন সীতা বন্দিনী মৃগের মতো অন্নপানাদি গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন, তখন তাঁকে নিয়ে দেবগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন, পাছে অন্নপানাদির অগ্রহণে সীতার মৃত্যু হলে রাবণ বধ না হয়। এই কারণে প্রজাপতির আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের সুসংবাদ দিয়ে দিব্য হবিষ্যান্ন দান করেছিলেন।

---

[১৯১] 'তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্, স তত এব নিববৃতে - নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।' - কেনোপনিষদ্ ৩।৬।।

এবং

'তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্; স তত এব নিববৃতে - নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।।' - কেনোপনিষদ্ ৩। ১০।।

[১৯২] 'সর্বাঁল্লোকানীশতে ঈশনীভিঃ।' - শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩। ১।।

দ্বিতীয়তঃ অশোকবনে ধর্মজ্ঞানসম্পন্না ত্রিজটা নামক এক বৃদ্ধা রাক্ষসীর স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং সীতাকে প্রদত্ত সান্ত্বনা প্রমাণ করে যে, সীতার দুঃখ সহ্য করার জন্য বিধি পূর্ব থেকেই যেন ত্রিজটার মতো রাক্ষসীকে অশোকবনে অন্যান্য ভয়ঙ্কর চেড়ী ও রাক্ষসীদের সাথে রেখেছিলেন। ইন্দ্রজিতের নাগবাণে রাম ও লক্ষণ বিদ্ধ হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন এবং তখন সীতাকে পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়ে বীরদ্বয়ের অচেতন শরীর দেখানো হলো, তখন মৃতপ্রায় রাম ও লক্ষণকে দেখে সীতা বিলাপ করেছেন যে, তাঁকে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণ বলেছিলেন যে, স্বামী রামের সাথে তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে, তিনি পুত্রবতী হবেন, বিধবা হবেন না - ইত্যাদি, এইরকম দুঃখের দিনে ত্রিজটা রাম কর্তৃক লঙ্কা জয় এবং রাবণ বধের স্বপ্ন দেখেন। ত্রিজটার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে সীতা দুঃখের দিনে দুঃখের তীব্রতায় লাগাম দেওয়ার জন্য সাময়িক শান্তিলাভ করেছিলেন। এ যেন দৈবনির্ধারিত বলেই মনে হয়।

তৃতীয়তঃ বেদনার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সীতা যখন নিজের বেণীর দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার জন্য বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হন, ঠিক সেই মুহূর্তেই বৃক্ষের ভিতর থেকে 'জয়তু......জয়তু রামচন্দ্র' - এই মধুর কণ্ঠে রাম নাম শ্রবণ করেছিলেন। অর্থাৎ অশোকবটিকায় হনুমানের উপস্থিতি ঘটেছে। এখানে লক্ষণীয় যে, আর কয়েকক্ষণ পরে যদি হনুমানের আবির্ভাব ঘটত, তা হলে হয়ত সীতা সেই সময়ের মধ্যে নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে দিতেন। কিন্তু তা বিধির ইচ্ছার বিরোধী; তাই হয়তো যথাসময়েই তিনি হনুমানকে অশোকবনে প্রেরণ করেন এবং আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুঃখে শোকে জর্জরিত আনমনা সীতার কর্ণেও হনুমান কর্তৃক রাম নাম প্রবেশ করেছিল।

সর্বোপরি, হনুমান নিজের পিঠে করে সীতাকে রামের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে সীতা নানা যুক্তি-বলে অশোকবন থেকে অর্থাৎ দুঃখ থেকে নিজের মুক্তির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান

করেন। কারণ, সীতা মনে করেছিলেন যে, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে রামের কাছে গেলে তা তাঁর বংশ-মর্যাদার উপযুক্ত কাজ হবে না (৫।৬৮।১৩)। তবে, সীতা যে যুক্তি দিয়েই হনুমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন না কেন, আসল বিষয় হল, সীতা যদি আরো কিছুদিন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হন, তা হলে রাবণ বধ সহ লঙ্কা জয় নিশ্চিত হবে - এই ছিল বিধাতার গোপন নির্দেশ।

যাই হোক, এ তো গেল অশোকবনে সীতার দুঃখের কথা। তবে, এখানেই তাঁর জীবনের দুঃখ শেষ হল না। তাঁর জন্য আরো বড় দুঃখ অপেক্ষা করেছিলেন। তা হল গর্ভবতী অবস্থায় রামকর্তৃক সীতা নির্বাসন। লঙ্কাজয়ের পর রাম ও লক্ষ্মণ সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে তার পর এক বছর তাঁরা সুখে-শান্তিতেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইতিমধ্যে সীতার গর্ভসঞ্চারও হয়েছে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ঝটিকার মতো সীতার সুখময় জীবনে নেমে আসে এক ঘোর অন্ধকারময় দুঃখের কাল। নগরবাসীগণের তাঁদের রাজা সম্পর্কে ধারণা কীরূপ - তা বারবার রামচন্দ্র কর্তৃক গুপ্তচর ভদ্র জিজ্ঞাসিত হলে তিনি অতিগোপনে প্রকাশ করেছেন যে, পৌরগণ সর্বদাই তাঁদের রাজা রামচন্দ্রের সর্ববিষয়ে প্রশংসা কীর্তন করলেও তাঁরা সীতার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করছে; কারণ, তিনি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে রাক্ষস-ভবনে বাস করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, রাবণ-বধের পরেই রামচন্দ্র সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন; কারণ, রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে উত্তোলন করে অপহরণ করেছিল এবং তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্যে দেখেছিল। এই সংশয় থেকে মুক্তির জন্য সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এই সময়ে সীতার যে বিলাপ তা তাঁর অন্তরের মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণারই প্রকাশ। এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন (৬।১১৯।১৮)। চরম পতিব্রতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্র বিষয়ে এই ধরণের সন্দেহ যে তাঁকে কী পরিমাণ অপমানিত করেছিল

তা অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে অগ্নিদেবের কাছে তাঁর প্রার্থনা থেকে ফুটে ওঠে (৬।১১৬।২৫-২৮)।

অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার পরও সীতার চরিত্রে সেই সন্দেহের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল যকন ভদ্র নামক গুপ্তচর কর্তৃক পৌরবাসীর সীতা-চরিত্র বিষয়ে সংশয়ের কথা শ্রীরামচন্দ্র অবগত হয়েছিলেন। সীতা পরিব্রতা, শুদ্ধশীলা - এটি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র যেমন সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিলেন, তেমনি ভদ্রের কথা শুনে রাজার কঠোর কর্তব্যের কথা স্মরণ করে রাম সীতার প্রতি আরো কঠিন হয়েছিলেন। জীবনে সুখ অপেক্ষা রাজার কর্তব্যপালন করাকেই প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য মনে করে, প্রাচীন ও নিষ্কলঙ্ক অযোধ্যার রাজ-বংশের মান, কীর্তি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য, উপায়ান্তর না দেখে শ্রীরামচন্দ্র আসন্ন-প্রসবা পত্নীর পরিত্যাগের দ্বারা এই অপবাদ স্খালন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সীতার অনুরোধেই রাম তাঁকে লক্ষ্মণের সঙ্গে তপোবন দর্শনে পাঠিয়েছিলেন, তবে গর্ভিণীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নয়, তাঁকে নির্বাসনের উদ্দেশ্যে।

সীতা-নির্বাসনের অনুকূলে যত অকাট্য যুক্তিই থাকুক না কেন, এ যেন সীতার কপালে ঘোর অবিচার, প্রচণ্ড বজ্রপতনের সমান, তা মহাকবি কালিদাসও অস্বীকার করে চুপ থাকতে পারেননি। তাই জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের আদেশ পালনের জন্য লক্ষ্মণ সীতাকে যে নির্বাসন দিতে যাচ্ছেন, তা যে ঘোর অকার্য - একথা রঘুবংশম্-এ প্রকাশ করেছেন।[১৯৩]

---

[১৯৩] 'গুরোর্নিয়োগাদ্ ৰনিতাং ৰনান্তে সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো ৰিহাস্যন্।
অৰাৰ্য্যতেৰোত্থিত-ৰীচি-ইস্তৈর্জহ্নোদুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ।।' - রঘুবংশম্, চতুর্দশ সর্গ/৫১।।

এই কঠোর আদেশ শুনে সীতা অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান এবং লক্ষ্মণের যত্নে তাঁর মোহভঙ্গ অবস্থা অপেক্ষা তাঁর মোহই ভাল ছিল; কারণ, অজ্ঞান অবস্থায় পতি কর্তৃক চিরকালের জন্য তিনি যে পরিত্যক্ত হয়েছেন, তা তাঁর অনুভূত হচ্ছিল না, কিন্তু মোহভঙ্গে সংজ্ঞা লাভে সেই দুঃখানলে তাঁর হৃদয় দগ্ধীভূত হতে থাকে।[১৯৪]

তবে, সীতার চরিত্রের সবচেয়ে মহৎ দিক হলো এই যে, তিনি তাঁর দুঃখের জন্য কখনই অপর ব্যক্তিকে দায়ী করেননি; বরং প্রতিক্ষেত্রেই তিনি নিজের অদৃষ্টকেই দোষারোপ করেছেন। নিজের অদৃষ্টকেই নির্বাসনের জন্য দায়ী করার প্রমাণ পাওয়া যায় সীতার বিলাপের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন, জন্মান্তরে হয়ত তিনি অনেক পাপ করেছিলেন, যায় দুঃসহ বিষময় পরিণাম হল তাঁর এই অবস্থা।[১৯৫]

নিজের পূর্বকৃত পাপকেই নিজের দুঃখভোগ করার জন্য দায়ী করার মাধ্যমে সীতার চরিত্র পাঠকের প্রতিও এই নির্দেশ এসেছে যে, আমরা নিজেরাই আমাদের বর্তমান কর্মের মাধ্যমে ভবিতব্যকে রচনা করি এবং আমাদের পূর্বকৃত কর্মই আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে তৈরী করেছে। অর্থাৎ আমাদের স্বসম্পাদিত কর্মই শুভাশুভ ফলপ্রদান করে কখনো সুখ দেয়, আবার কখনো দুঃখ দেয়। সীতার এই বোধ তাঁর উত্তরণেরই এক দিককে প্রকাশ করে। গর্ভিণী সীতার নির্বাসন ঘটলেও মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে তিনি নির্বিঘ্নে দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং ঐ আশ্রমেই দীর্ঘ বারো বছর ধরে সন্তান পালন করে একক মাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, রামচন্দ্র লোকরঞ্জনের জন্য সীতাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাসিত করলেও

---

[১৯৪] 'সা লুপ্ত-সংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং প্রত্যাগতাসুঃ সমতপ্যতান্তঃ।
তস্যাঃ সুমিত্রাত্মজ-যত্নলব্ধো মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধঃ।।' - রঘুবংশম্, চতুর্দশ সর্গ/৫৬।।

[১৯৫] 'কল্যাণ-বুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জ্জথুরপ্রসহ্যঃ।।' - রঘুবংশম্, চতুর্দশ সর্গ/৬২।।

পরোক্ষভাবে তিনি পৌরগণকে সীতার নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন অন্য দারগ্রহণ না করে, অশ্বমেধ যজ্ঞে সীতামূর্তি স্থাপন করে, যা পরোক্ষভাবে সতীত্বের প্রশ্নে সীতাকে উত্তীর্ণ করে। তিনি যে তাঁর পতির কাছে পবিত্রতম, নিষ্কলঙ্ক - এর থেকে বড় সাফল্য একজন পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে আর কী বা হতে পারে? আবার, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত মহর্ষি বাল্মীকির কাছে স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীরামের এইপ্রকার স্বীকারোক্তি সীতার সাফল্যের তুল্য। সর্বোপরি, বাল্মীকির আদেশে রামচন্দ্র পুনরায় প্রজাকুলের বিশ্বাস উৎপাদন পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেও গৈরিকবস্ত্রধারিণী সীতা তাঁর মা ধরিত্রীর বুকে ঠাঁই নিয়েছিলেন। মহাকবি কালিদাসও এই প্রসঙ্গে সীতার মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ‘মা ভূতধাত্রি পৃথিবী! যদি আমি বাক্য, মন কিংবা কর্মের দ্বারা জীবনে কখনো আমার পতির চরণে কোন প্রকার অপরাধ না করে থাকি, আমার চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, তাহলে তোমার অঙ্কে আমাকে স্থান দাও। এ চিরদুঃখিনীর দগ্ধ হৃদয় নির্বাপিত কর।’[১৯৬] বসুন্ধরার ক্রোড়ে সসম্মানে প্রবেশের মাধ্যমে সীতা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, সকল দুঃখের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিজয়িনী। তিনি জীবনে প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঈশোপনিষদ্-এর প্রথম শ্লোকে ত্যাগের মাধ্যমে জীবন-লক্ষ্যকে পালন করার কথা বলা হয়েছে।[১৯৭] সীতাও আজীবন তাই করেছেন। কঠোপনিষদ্ বলেছেন, ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, ধর্মের পথও তেমনই দুর্গম।[১৯৮] পতি কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে সন্ন্যাসীনীর মতো জীবন অতিবাহিত করার পর রাজসিংহাসনকে বরণ করে নেওয়াকে সীতা ধর্ম বলে মনে করেননি; তাই

---

[১৯৬] ‘ৰাঙ্‌মনঃ কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ৰ্যভিচারো যথা ন মে।
তথা ৰিশ্বম্ভরে দেৰি! মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি।।’ - রঘুবংশম্ পঞ্চদশ সর্গ।৮১।।

[১৯৭] ‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা’ - ঈশোপনিষদ্, শ্লোক - ১।

[১৯৮] ‘ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।’ - কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪।।

সুখ প্রাপ্তির পরম সুযোগ ত্যাগ করাকেই তিনি শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং, দুঃখ ভোগের মাধ্যমে সীতা ধর্মের এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে যথার্থই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলেই মাতৃক্রোড়ে তিনি ঠাঁই-ও পেয়েছিলেন। তাই যুগযুগান্তর ধরে জগদ্বাসী অন্তরে রেখে তাঁর পূজা করে চলেছেন। যে সতীত্বের প্রশ্নে সীতার সারাজীবন দগ্ধ হয়েছিল, সেই সতীত্বের জয় হয়েছিল। চরিত্রের মাহাত্মে সীতা জগদ্বাসীর হৃদয়ে চির আরাধ্যা দেবী রূপে বিরাজমান হয়ে রয়েছেন।

দিলীপ ও সুদক্ষিণা ঃ

আমরা মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশম্-এ দিলীপ নামে এক রাজাকে পেয়েছি, যিনি তাঁর পত্নীর সহযোগে পুত্রলাভ না করার চরম দুঃখকে সংযম এবং ত্যাগের দ্বারা অতিক্রম করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ পুত্রলাভ করে পুত্রহীন থাকার চরম দুঃখকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। রঘুবংশের অন্যান্য নৃপতিদের মতো দিলীপও ছিলেন ধর্মের পূজারী, সত্যবাদী, বিদ্বান, মিতভাষী, পরম দাতা এবং ক্ষমাশীল। তিনি পিতার মতোই প্রজাদের শিক্ষাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন। পুরুষার্থসমূহের মধ্যে অর্থ এবং কাম - এই দুটিই তাঁর কাছে ধর্মানুগত ছিল। তাঁর বহু পত্নী থাকলেও তিনি আত্মানুরূপিণী ও উদার-হৃদয়া মহিষী সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষ্মী - এই দু'জনের দ্বারাই নিজেকে ভার্য্যাবান্ বলে গর্ব করতেন। তবে, তিনি তাঁর আত্মানুরূপিণী পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্রলাভ না হওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। অবশেষে পুত্র-সন্তান জন্মের আশায় তিনি তাঁর পত্নী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে দৈবকার্যের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। সেখানে মহর্ষি বশিষ্ঠ ধ্যানযোগে রাজার পুত্রসন্তানহীনতার কারণ অবগত হয়ে বললেন যে, একদা রাজা দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের উপাসনা করে যখন পৃথিবীর দিকে রওনা হয়েছিলেন, তখন তাঁর এই

পত্নী সুদক্ষিণা ঋতুস্নান করে পবিত্র হয়েছিলেন এবং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ রাজা জানতেন যে, ঋতুস্নাত মহিষীর কাছে শীঘ্র উপস্থিত হতে না পারলে তাঁর ধর্মলোপ পাবে। সেই ব্যস্ততার সময় মহারাজ স্বর্গীয় কামধেনু অর্চনীয়া সুরভিকে অর্চনা না করায় তিনি অভিসম্পাত করেছিলেন যে, তাঁর সন্ততির আরাধনা ব্যতীত মহারাজের সন্তানোৎপাদন হবে না; কারণ, যাঁরা পূজনীয়, তাদের পূজার ব্যতিক্রম ঘটলে শ্রেয় বা মঙ্গল হয় না। এই অভিশাপের কারণেই রাজা পুত্রসন্তানহীন হয়ে দিন যাপন করছিলেন।

মহর্ষির এই বক্তব্য শুনে মহারাজ এই অভিশাপের কালো মেঘ দূর করার উপায় জানতে চাইলে মহর্ষি জানান যে, সুরভির কন্যা নন্দিনীকে প্রসন্ন করতে পারলে তবেই সেই অভিশাপের প্রতিপ্রসব সম্ভব। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক রঘুবংশীয় রাজাকে পত্নীর সাথে একত্রভাবে বাস করতে হবে, সারাদিন বনচরের মতো বনে বনে ঘুরতে হবে, নন্দিনী উঠলে রাজা উঠবে, বসলে বসবে, দাঁড়ালে দাঁড়াবে, নন্দিনীর জলগ্রহণের আগে জলস্পর্শ অবধি করতে পারবেন না। এভাবে নন্দিনী প্রসন্না হলেই মহারাজের অভিলাষ পূরণ সম্ভব হবে।[১৯৯]

সুরভি তনয়া নন্দিনীর প্রসন্নার্থে মহর্ষির উপদেশ অনুসারে একুশ দিন পর্যন্ত রাজা সপত্নীক কর্তব্য পালনের পর নন্দিনী রাজার মনোভাবের পরীক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। এই উদ্দেশ্যে নন্দিনী যখন তৃণাদি ভক্ষণার্থে হিমালয়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন, তখন রাজা হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদন করতে ব্যস্ত ছিলেন; কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, নন্দিনী দেব-ধেনু হওয়ায় সে হিংস্র শ্বাপদাদির আক্রমণের অতীত। কিন্তু তাঁর এই ধারণা ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হল যখন তিনি নন্দিনীর আর্তনাদ শুনলেন এবং দেখলেন যে, এক বিরাট সিংহ নন্দিনীর উপর উপবিষ্ট হয়েছে। তৎক্ষণাৎ রাজা নিজ পৃষ্ঠ সংলগ্ন বান গ্রহণের

[১৯৯] রঘুবংশ, প্রথম সর্গ, শ্লোক - ১২-৯৫, কালিদাস গ্রন্থাবলী, পৃ - ২-১৪।

জন্য তাঁর ডান হাত উত্তোলন করতে প্রবৃত্ত হলে তাঁর হাত অসাড় হয়ে আসে এবং সে ছবির মতো স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সিংহ বলতে থাকে যে, রাজার সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে; কারণ, সে কুম্ভোদর, সে নিকুম্ভের মিত্র এবং ভগবান শিবের কিঙ্কর, যার পিঠের উপর পাদবিন্যাসের মাধ্যমেই শিব তাঁর বৃষরাজ নন্দিশ্বরে আরোহণ করেন। স্বয়ং ত্রিপুরারির বিধানেই তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আপনিই তার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। সম্মুখস্থ এক দেবদারু বৃক্ষকে নির্দেশ করে সিংহরূপী কুম্ভোদর রাজাকে বললেন যে, এটি দেবী পার্বতীর পুত্রসম; কারণ, নিজ পুত্রকে মা যেমনভাবে স্তন্যপান করিয়ে থাকেন, তেমনি দেবী পার্বতী এই বৃক্ষটিকে জলসেক করে পরিবর্দ্ধিত করেছিলেন। একদা এক বন্য হস্তী এই বৃক্ষের গায়ে দেহ ঘর্ষণ করার ফলে এর ছাল উঠে যাওয়ায় দেবী খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই বন্য হস্তীদের ত্রাস উৎপাদনের জন্য শিব কর্তৃক তিনি অর্থাৎ কুম্ভোদর এখানে নিযুক্ত হয়েছেন এবং শিবের বিধানেই ঐ সিংহের ক্ষুধার খাদ্য তার সম্মুখে নিজে থেকেই এসে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিধির বিধানের জন্যই রাজা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাই এখানে রাজা আত্মগ্লানি এবং পরাজয়ের লজ্জা পরিত্যাগ করলেন এবং সিংহরূপী কুম্ভোদরের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাঁর গুরুর যজ্ঞের প্রধান উপকরণ এই নন্দিনীর পরিবর্তে তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দিলেন। তবে, রাজার এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করে কুম্ভোদর বললেন যে, যিনি রাজা তিনি প্রজাপুঞ্জের কাছে পিতার সমান; তাই তাঁকে হত্যা করলে তাঁর সাথে প্রজাগণকেও রক্ষা করার কেউ থাকবে না। তা ছাড়া, এই ধেনুকে হত্যা করলে একটিমাত্র প্রাণেরই বিনাশ হবে এবং রাজা ইচ্ছা করলে তাঁর গুরুদেবকে এরকম বহু পয়স্বিনী ধেনু দান করতে পারবেন। তবে, এতেও রাজা প্রতিনিবৃত্ত হলেন না এবং বললেন, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেই, যে বিপদকে ত্রাণ করতে পারে। তাই

রাজা হিসাবে ন্যায়তঃ এবং ধর্মত নিজ শরীর উৎসর্গ করেও এই ধেনুকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য এবং এর ফলে তাঁর গুরুদেবের যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডও অব্যাহত থাকবে।

অবশেষে কুম্ভোদর রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজার অসাড় হাতের জড়ত্ব দূর হলে পর রাজা নিজেকে কুম্ভোদরের কাছে সমর্পণ করেন। রাজা সিংহের আক্রমণের প্রতীক্ষায় রত; ঠিক সেই সময়ই তাঁর উপর অজস্র পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল। তিনি মাথা তুলে দেখলেন যে, সুরভি-তনয়া নন্দিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এবং সিংহের নাম-গন্ধও সেখানে নেই। নন্দিনী তাঁকে বললেন যে, সে মায়াবলে রাজার ভক্তির পরীক্ষা নিচ্ছিলেন এবং রাজার গুরুভক্তি ও তাঁর (নন্দিনীর) প্রতি অনুকম্পা দেখে রাজার প্রতি প্রীত হয়েছেন। প্রসন্ন হলে তিনি ভক্তের সকল বাসনাই পূরণ করতে সক্ষম। তাই তিনি রাজাকে বর প্রার্থনা করতে বললে রাজা রাজমহিষী সুদক্ষিণার গর্ভে পুত্র সন্তানের প্রার্থনা জানালেন। নন্দিনী আরো প্রীত হলেন যখন তিনি রাজাকে তাঁর দুধ পানের জন্য বললে রাজা মহর্ষির আদেশানুসারে বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং ঋষির হোমের জন্য প্রয়োজনীয় দুধের অবশিষ্ট অংশ পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[২০০]

যাই হোক, দিলীপ-সুদক্ষিণার উপাখ্যান পাঠের পর কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্ফূট হয়। প্রথমেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হেতু ব্যতিরেকে জীবের দুঃখভোগ হয় না; অর্থাৎ সংসারে জীবের দুঃখভোগ অহেতুক নয়, এবং সেই হেতু বা কারণ আর কিছুই নয়, বরং জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে জীবের পূর্বকৃত পাপকর্ম অথবা কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখতা। এরূপ ক্ষেত্রে দুঃখভোগের মাধ্যমেই জীবকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাছাড়া, জীবের কৃত পাপকর্ম বা কর্তব্যচ্যুতি তার অজ্ঞাতে সম্পাদিত হলেও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দুঃখভোগ কিন্তু সজ্ঞানেই ঘটে

---

[২০০] রঘুবংশম্‌, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক -১-৭৫, কালিদাস গ্রন্থাবলী, পৃ -১৫-২৮।

থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামায়ণে সীতা তাঁর যন্ত্রণার জন্য নিজ অদৃষ্টকেই বারবার দায়ী করেছেন। তাঁর দুঃখদায়ক অদৃষ্টের হেতুস্বরূপ পাপকর্মটি সম্পর্কে তিনি অবহিত হতে পারেননি। তবে, আলোচ্যক্ষেত্রে রাজা দিলীপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কুলগুরুর সহায়তায় তাঁর পুত্রহীনতার যন্ত্রণার কারণ সম্পর্কে অবগত হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ ও কাম যখন ধর্মনিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই তা মোক্ষোপযোগী হয়ে থাকে; অন্যথায় তা জীবের পীড়ার কারণ হয়ে থাকে। স্বর্গলোক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঋতুস্নাতা পত্নী সুদক্ষিণার কথা মনে পড়ায় ব্যস্ততার জন্য অজ্ঞাতেই রাজা স্বর্গীয় কামধেনু সুরভিকে অর্চনা না করে তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ যে স্ত্রীর মোহে রাজার মতিভ্রংশ ঘটেছিল, সেই স্ত্রীর সাথেই ব্রহ্মচারিভাবে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে রাজাকে বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করতে হয়েছিল। সুতরাং, মোহ জীবকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে দুঃখের কারণ হয়ে থাকে।

তা ছাড়া, পূজনীয়গণের পূজার ব্যতিক্রম হলেও রাজা-প্রজা-নির্বিশেষে সবাইকেই সমান প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আলোচ্যক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গোমাতা সর্বদেবতাস্বরূপ, যিনি ভক্তিসহ পূজা পাওয়ার যোগ্য। যদিও অজ্ঞাতেই রাজা কর্তৃক গোমাতা অবহেলিত হয়েছিলেন, তথাপি রাজা গোমাতার অভিসম্পাতে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাওয়ার আগে পুত্রসন্তান না থাকার জন্য রাজা যে মনঃপীড়া ভোগ করছিলেন, গুরুদেবের আশ্রমে উপনীত হওয়ার পর সেই মনঃপীড়ার সাথে দৈহিক পীড়াও যুক্ত হয়েছিল। স্বর্গীয় কামধেনু সুরভি-তনয়া নন্দিনীকে সবসময় অনুসরণ করতে হবে - এই ছিল গুরুদেবের আদেশ। নন্দিনীকে প্রসন্ন করার এটিই একমাত্র উপায়।

অবশেষে, নন্দিনী প্রসন্ন হওয়ার পরেও রাজার যন্ত্রণার অবসান হয় না; কারণ, নন্দিনী ভক্তের মনোভাব পরীক্ষার জন্য উৎসুক। অর্থাৎ গুরুর আদেশানুসারে নন্দিনীকে অনুসরণাদির মাধ্যমে তথা দৈহিক পীড়াদায়ক সকল কর্মানুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে রাজা নন্দিনীকে প্রীত করতে সমর্থ হলেও গুরর আদেশের প্রতি বা নন্দিনীর প্রতি রাজার প্রকৃত মনোভাব কী - তা বোঝার জন্যই নন্দিনী রাজার পরীক্ষা নিয়েছিলেন। এই সময়েও রাজার যন্ত্রণার শেষ নেই। সিংহরূপী কুম্ভোদরকে নন্দিনীর থেকে নিবৃত্ত করার সময় রাজা বান গ্রহণের জন্য প্রবৃত্ত হলেও তাঁর ডান হাত অসাড় হয়ে যায় এবং সে জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রবল পরাক্রমী সর্বজয়ী রাজার এটিই প্রথম পরাজয়। এ যে কম যন্ত্রণার নয় তা বোঝাই যায়।

তবে শত কষ্টের মধ্যেও রাজা আরো কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজা দিলীপের মহত্ব এখানেই। গুরুর যজ্ঞীয় সম্পত্তি নন্দিনীকে রক্ষা করতে এবং ক্ষাত্র ধর্ম পালন করতে রাজা সিংহরূপী কুম্ভোদরের কাছে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে বোঝা যায় যে, রাজকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ, যেখানে ধর্ম পালনই কর্তব্য। তা ছাড়া, দেবাদিদেব শিবের বিধানেই কুম্ভোদরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নন্দিনী তার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, বিধির বিধানের উপর সামান্য সীমিত মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তা মানুষের সাধ্যাতীত - এরূপ বিচার করে রাজা যদি প্রত্যাবৃত হতেন, তাহলে তাঁকে কেউই কোন দোষ দিতে পারত না। কিন্তু রাজার মনে এইপ্রকার বিচারের লেশমাত্রও স্থান পায়নি। অর্থাৎ তিনি এতটাই বলিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী যে, মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়ের সাধনেও তিনি পিছ পা নন। বরং কোন রকম অজুহাতের আশ্রয় না নিয়ে তিনি শিষ্যের কর্তব্য এবং ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর আমরা জানি যে, ধর্মের পালন জীবকে মোক্ষোপযোগী করে থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, রাজা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের

মাধ্যমে নন্দিনীকে যথার্থই প্রীত করে তাঁর পুত্র লাভের বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সেই বর ফলপ্রসূ হয়ে রাজার দুঃখ-মুক্তিও ঘটিয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ অপর একটি বিষয় এখানে আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। বেদে বলা হয়েছে যে, 'পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে'। কিন্তু পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পরেও পুত্রকাম ব্যক্তির পুত্র প্রাপ্তি ঘটেনি - এমন দৃষ্টান্তের অভাব না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়েছে যে, বেদবিহিত কর্মনুষ্ঠানের পরেও ফলাভাব ঘটায় বেদ অপ্রমাণ বা মিথ্যা।[২০১] কিন্তু উক্ত প্রকার পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হলেও ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলেছেন, বেদবাক্যে অনৃতদোষ ঘটেনি; অর্থাৎ বেদবাক্য মিথ্যা নয়, যেহেতু কর্ম, কর্তা ও সাধন বৈগুণ্যবশতঃই ঐ প্রকার ফলাভাব ঘটে থাকে।[২০২] কোন ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরেও পুত্রপ্রাপ্তি না ঘটলে তার থেকে 'পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে' - এই বেদবাক্যটি মিথ্যা প্রতিপাদিত হয় না; কারণ, একমাত্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞই পুত্র প্রাপ্তির বা পুত্রজন্মের কারণ নয়। পুত্রপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট উভয়প্রকার কারণই থাকে। পুত্রপ্রাপ্তির দৃষ্টকারণ স্বরূপ পিতা ও মাতার সংযোগ যেমন আবশ্যক, তেমনি তার সাথে পিতার বা মাতার পুত্র জন্মের প্রতিবন্ধক ব্যাধির অভাব থাকাও প্রয়োজন। এই দৃষ্ট কারণগুলির সাথে পুত্রেষ্টি যজ্ঞজন্য অদৃষ্ট যদি মিলিত হয়, তাহলেই ঐ পিতা-মাতার পুত্রলাভ ঘটবে। সুতরাং, দৃষ্টকারণকে বাদ দিয়ে মাত্র অদৃষ্টকারণই পুত্রলাভের হেতু হতে পারে না। সুতরাং, যদি কেউ 'পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবে' - এরূপ বেদবাক্যের আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করেন, তা হলে তার থেকে কখনই প্রমাণিত হয় না যে, বেদবাক্য মিথ্যা। তা ছাড়া, আরো বলা যায় যে, যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সমীহার অর্থাৎ অঙ্গযজ্ঞের

---

২০১ 'অনৃতদোষাৎ পুত্রকামেষ্টৌ।' - ব্যাৎসায়ন, গৌতমীয় ন্যায়দর্শন ভাষ্য, ২।১।৫৭ সূত্রভাষ্য, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ৯০, পং - ১১।

২০২ 'ন, কর্ম-কর্তৃ-সাধন-বৈগুণ্যাৎ।।' - ন্যায়সূত্র ২।১।৫৮।।

অনুষ্ঠান করা না হয়, তা হলে কর্ম-বৈগুণ্য ঘটে। আবার, যজ্ঞ-কর্তা বা প্রয়োক্তা যদি অবিদ্বান বা নিন্দিতাচারী হয়, তাহলে কর্তৃ-বৈগুণ্য ঘটে। যদি যজ্ঞে হবি বা হবনীয়দ্রব্য অপূত বা অপ্রেক্ষিত ও উপহিত হয় তথা কুকুর বা বিড়ালাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়, অথবা যজ্ঞের মন্ত্র যদি ন্যূন বা অধিক হয়, যদি স্বরহীন বা বর্ণহীন হয়, অথবা যদি যজ্ঞের দক্ষিণা দুরাগত তথা উৎকোচাদি দুষ্ট উপায়ে সংগৃহীত হয়, তা হলে সাধন-বৈগুণ্য ঘটে। এই কর্মবৈগুণ্য বা কর্তৃবৈগুণ্য বা সাধনবৈগুণ্য স্বতন্ত্রভাবে ঘটলে অথবা একত্রে ঘটলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ তার যথা উক্ত ফল প্রদান করবে না। কিন্তু তা থেকে বেদবাক্য মিথ্যারূপে প্রমাণিত হয় না।[২০৩]

উক্ত বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় একটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে, চিকিৎসা শাস্ত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট রোগের ওষুধ প্রস্তুত করার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতিতে কিছু বিশেষ উপকরণের বিশেষ পরিমাণের মিশ্রণের কথা বলা হয়, যা বিশেষ সময়ে সেবন করলে ঐ রোগের উপশম হয়। শুধু তাই নয়, রোগীকেও বিশেষ নিয়মে ঐ ওষুধ সেবনের উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কোন চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত বিধি-নিয়ম অনুসারে ঐ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উষুধ প্রস্তুত করতে অসমর্থ হন, অথবা রোগী যথাশাস্ত্র ঐ উষুধ সেবন না করেন, তাহলে রোগের নিরাময় হয় না; যদিও তার থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাক্যকে সেক্ষেত্রে মিথ্যা বা অপ্রামাণিকরূপে সিদ্ধান্ত করা হয় না।[২০৪]

---

[২০৩] ব্যাৎসায়ন, গৌতমীয় ন্যায়দর্শন ভাষ্য, ২।১।৫৮ সূত্রভাষ্য, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ৯১ - ৯২।

[২০৪] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ -৩১৪।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোৎকরের বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। পূর্বপক্ষ উত্থাপনপূর্বক তিনি ন্যায় মত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে, বেদবাক্য মিথ্যা নয়। পূর্বপক্ষী অবৈদিক সম্প্রদায় আপত্তি করতে পারেন যে, বৈদিক বাক্য মিথ্যা হওয়ায় পুত্রেষ্টি যজনের আনুষ্ঠানের পরেও ফলাভাব দেখা যায়; যেক্ষেত্রে ফললাভ হয়, সেক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় কাকতালীয় ন্যায়ে। কাজেই, পুত্রেষ্টি আদি যজ্ঞের ফলাভাব কর্ম-কর্তা-সাধন বৈগুণ্যবশতঃ, অথবা বিধিবাক্যের মিথ্যাত্ববশতঃ - তা বোঝা যায় না। এর উত্তরে বার্ত্তিককার বলেছেন যে, কেবল পুত্রেষ্টি যজ্ঞই পুত্রজন্মের কারণ নয়। যেসব ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরেও ফলাভাব থাকে অর্থাৎ পুত্রপ্রাপ্তি হয় না, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, পুত্রজন্মের কারণসমূহ বা কারণবিশেষের অভাবেই সেখানে পুত্রজন্ম হয়নি।[২০৫]

তা ছাড়া, অধিকারীভেদে যেমন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনি অধিকারীভেদে শাস্ত্রীয় কর্মও ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই ত্রিবিধ গুণের প্রাধান্যভেদে ব্যক্তিরও ভেদ সিদ্ধ হয়। এখন, শাস্ত্রে সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির জন্য যে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ আছে, তা যদি রজঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান ব্যক্তি সম্পাদন করেন, তাহলে শাস্ত্রবিহিত ফলপ্রাপ্তি ঘটবে না। কিন্তু সেই ফলাভাব থেকে শাস্ত্র অপ্রামাণিক - একথা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, কোন্ ব্যক্তি কোন্ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের অধিকারী - সেই জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। শুধু তাই নয়, যদি কু-উদ্দেশ্যবশতঃ বা নিন্দিত উপায়ে শাস্ত্রবিহিত কর্ম সম্পাদন করা হয়, তাহলেও শাস্ত্রবিহিত ফলপ্রাপ্তি যে ঘটবে না, তা বলাই যায়।

সুতরাং, এখানে উক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হল যে, পন্থা বেদ বিধি হোক বা গুরু নির্দেশিত পথই হোক - তাকে যথাযথভাবে পালন করা ফলপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

---

[২০৫] উদ্দ্যোতকর, গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্য বার্ত্তিক - অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ, নিউ দিল্লী, ১৯৯৭, পৃ - ২৫২ -২৫৩।

উভয়ক্ষেত্রেই কর্ম, কর্তৃ বা সাধন বৈগুণ্য ঘটলে ফলপ্রাপ্তির কোন আশা থাকে না। তা ছাড়া, কর্মানুষ্ঠাতার উদ্দেশ্য তথা মনোভাবও উভয় পন্থাতেই জরুরী। তা না হলে কর্তৃ বৈগুণ্য ঘটবে। প্রকৃতস্থলে রাজা দিলীপের এই মনোভাব বোঝার জন্যই নন্দিনী কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সেই পরীক্ষায় রাজা উত্তমভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ধ্রুবোপাখ্যান ঃ

মেঘমুক্ত আকাশে স্থির ধ্রুবতারা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই পরিচিত একটি নক্ষত্র। কঠিন তপস্যার বলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় বালক ধ্রুব তাঁর এই স্থান অর্জন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভগবৎপুরাণে আমরা ধ্রুব সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে থাকি। উভয় পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানের মধ্যে যদ্‌কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ের মধ্যে কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

স্বয়ম্ভূব মনুর পুত্র উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই পত্নী ছিল। সুরুচি উত্তানপাদের প্রিয় পাত্রী হলেও সুনীতি পতির প্রীতিভাজন ছিলেন না। উত্তানপাদের প্রেয়সী পত্নী সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তম। অপরদিকে, সুনীতির গর্ভজাত পুত্রই ছিলেন ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির গর্ভজাত পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে বসিয়ে আদর করছিলেন। সেইসময় বালক ধ্রুব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেও পিতার কোলে উঠার জন্য উৎকণ্ঠিত হলেও প্রেয়সী সুরুচির উপস্থিতিতে তার প্রীতি-ভঙ্গের ভয়ে রাজা ধ্রুবকে আদর করলেন না। পিতার কোলে ওঠার জন্য উৎসুক ধ্রুবকে অতিগর্বিতা সুরুচি ভৎসনা করে বলেছিলেন যে, ধ্রুব তাঁর গর্ভজাত না হয়ে যে চেষ্টা করছে তা বৃথা। অর্থাৎ

সুনীতির গর্ভে জন্মানোর কারণে অবিবেচক বালক ধ্রুব রাজার কোলে বা রাজাসনে ওঠার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করছে তা তার দুর্লভ।[২০৬]

বালক ধ্রুবর কাছে বিমাতার এই প্রকার কঠোর বাক্য কম কষ্টের নয়। তা ছাড়া, এই বাক্য বিমাতার থেকে শোনার সময় তাঁর পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তবুও তিনি কোনরকম প্রতিবাদ করেননি, যা বালক মনে দুঃখের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। সেই সময় বালক ধ্রুব তাঁর মা সুনীতিকে সব কথা জানালে তিনি বালকের চিত্তকে শীতল করতে যা উপদেশ করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন যে, কোন ব্যক্তি মন্দভাগ্য না হলে কোন বিপক্ষের মানুষ পুণ্যবান ব্যক্তিদের এমন কথা বলতে পারে না।[২০৭] সে পূর্বজন্মে যা করেছে, তা কেউ দূর করতে পারবে না; আর যা করেনি, কেউ দিতে পারবে না। সুতরাং, অন্যের কথায় দুঃখ করা উচিৎ নয়।[২০৮] সুনীতির ধ্রুবর প্রতি উক্ত বাক্য থেকে একথাই বোঝা যায় যে, স্বতঃই কোন ব্যক্তি দুঃখ-যাতনা ভোগ করেনা। পরের প্রদত্ত দুঃখে পরের অপরাধ মনে করার কোন কারণ নেই। যে ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেয়, সে নিজের প্রদত্ত সেই দুঃখই ভোগ করে থাকে। সুনীতির এই উক্ত প্রকার সান্ত্বনা বাক্য ভারতীয় নীতিদর্শনের অন্যতম নিয়ম কর্মবাদের স্মরণ করায়। আমরা আগেই দেখেছি, কর্মবাদের মূল কথা হল - 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'। অর্থাৎ কর্মের সম্পাদন এবং ফলভোগ হল একপ্রকার কার্যকারণ নিয়ম। এই মতবাদকে ভিত্তি

---

[২০৬] বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ৯-১০।

[২০৭] 'সুরুচিঃ সত্যমাহেদং মন্দভাগ্যোঽসি পুত্রক।
ন হি পুণ্যৱতাং ৰৎস সপত্নৈরেৰমুচ্যতে।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ১৬।

[২০৮] 'নোদ্বেগস্তাত কর্তব্যঃ কৃতং যত্তৱতা পুরা।
তৎ কোঽপহর্তুং শক্নোতি দাতুং কষচাকৃতং ত্বয়া।।
তত্ত্বয়া নাত্র কর্তৱ্যং দুঃখং তদ্বাক্যসম্ভৱম্।।'- তদেব, শ্লোক - ১৭, ১৮।

করে ভারতীয় দর্শনে অপর যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, তা হল জন্মান্তরবাদ। পুণ্যকর্মের দ্বারা শুভ ফল লাভ হয়, এবং পাপকর্মের দ্বারা অশুভ ফল লাভ হয় - এই কথার সপক্ষে শ্রুতি প্রমাণ আছে। কিন্তু, পুণ্যকর্ম সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই শুভ ফলপ্রাপ্তি ঘটবে, অথবা বিপরীতক্রমে পাপ কর্মের সম্পাদনের পরক্ষণেই অশুভ ফলপ্রাপ্তি হবে - এটি আমাদের অনুভববিরুদ্ধ। বস্তুতঃ এটিই কর্মবাদের রহস্য। তা ছাড়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সম্পাদিত কর্মের ফল ভোগের জন্য জন্মান্তর অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তবে, জন্মান্তর স্বীকারের ক্ষেত্রে অন্য যুক্তিও আছে। জন্মান্তর আবার কৃতনাশ বা কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম - এই দু'টি নৈতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কৃতকর্মের ফলভোগ না করা হল কৃতনাশ; আর, অকৃতাভ্যাগম হল অকৃতকর্মের ফলভোগ করা। কৃতের নাশ হয় না; আর অকৃতের ভোগ হয় না। ন্যায়দর্শনেও এই নিয়ম দু'টি স্বীকৃত।[২০৯]

সুতরাং, শুভাশুভ কর্মজনিত অদৃষ্টই জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু। অর্থাৎ জীব নিজেই নিজের অদৃষ্ট রচয়িতা। কাজেই, ব্যক্তি চরম দুঃখ পেয়ে থাকলেও নিজ চেষ্টায় সে সেই দুঃখকে দূর করে সর্বফলদায়ক পুণ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে পারে।[২১০] শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, ধ্রুবর মা সুনীতিই তাঁকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য মাৎসর্য্য ত্যাগ পূর্বক ভগবান শ্রীহরির আরাধনা বা ভজনা করতে উপদেশ দেন।

মায়ের এই প্রকার উদ্দেশ্যসাধক বাক্য শুনে ধ্রুব মনকে শান্ত ও সংযত করে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে নিজের চেষ্টায় জগতে সম্মানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে।[২১১] কাজেই এইপ্রকার

---

[২০৯] 'তদেৰং সত্ত্বভেদে কৃতহানমকৃতাভ্যাগমশ্চ প্রসজ্যতে।' - বাৎস্যায়ন, পৃ - ১৩৮, পং - ৬।

[২১০] 'তথাপি দুঃখং ন ভৰান্ কর্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাৰৎ স তেনৈৰ স্বেন তুষ্যতি মানৰঃ।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক -২২।

[২১১] 'সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্বোত্তমোত্তমম্।

বক্তব্য থেকে এটি বোঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি চেষ্টা করে, তাহলে সে তার চেষ্টার দ্বারা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। সুতরাং, ব্যক্তি নিজেই তার সকল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জন্য দায়ী।

যাই হোক, নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বালক পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। ধ্রুব এক উপবনে উপস্থিত হলে সাতজন ঋষির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।[২১২] এই সাতজন ঋষি হলেন মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। ধ্রুব যে আত্মগ্লানির জন্য তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, একথা জানালে ঋষিগণ চার-পাঁচ বছরের বালকের সংসার-বিরাগের কারণ জানতে চাইলেন।[২১৩] ঋষিগণের এই বক্তব্য থেকে একটি বিষয়ে আমরা জ্ঞাত হতে পারি যে, মুমুক্ষু বিষয়-বিরাগ অপরিহার্য। তবে, এই বৈরাগ্যের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। জীব যেকোন বয়সেই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হতে পারে।

ঋষিগণকে বালক ধ্রুব তার সংসার বিরাগের কারণ জানালে ঋষিগণ তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করার উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুপুরাণে সপ্ত ঋষির উল্লেখ থাকলেও শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সেখানে সপ্তর্ষির পরিবর্তে নারদের উল্লেখ পেয়ে থাকি। ধ্রুব নারদ কর্তৃক শ্রীবিষ্ণুর তপস্যার জন্যই উপদিষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ উভয় পুরাণেই দেখা যায় যে, সাকারোপাসনায় ধ্রুবকে প্রবৃত্ত করা হয়।

ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হয়ে ভগবান পুরুষোত্তম হরির কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। ভাগবত পুরাণে এই দুষ্কর তপস্যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেবর্ষির উপদেশানুসারে, প্রতি ত্রিরাত্রির অবসানে ধ্রুব কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্য কপিত্থ ও বদরী ফল মাত্র আহার করে ভগবানের

স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামভিপূজিতম্।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ২৬।।

[২১২] 'স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্।।' - তদেব, শ্লোক - ৩১।।

[২১৩] ''চতুষ্পঞ্চাব্দসম্ভূতো বালস্ত্বং নৃপনন্দন।
নির্বেদকারণং কিঞ্চিত্তব নাদ্যাপি বর্ততে।।' - তদেব, শ্লোক - ৩৪।।

সাকার আরাধনায় প্রথম মাস অতিবাহিত করলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয়মাসে প্রতি ষষ্ঠ দিবসে শুষ্ক তৃণ-পত্রাদির আহার করতেন। তারপর প্রতি নবম দিবসে কেবলমাত্র জল গ্রহণ করে সমাধি তথা তদ্গতচিত্ত হয়ে ভগবানের আরাধনায় তৃতীয় মাস অতিবাহিত করলেন। তারপর প্রতি দ্বাদশ দিবসে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে এবং প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাসজয় করে ভগবানের ধ্যান করতে করতে চতুর্থ মাস অতিবাহিত করলেন। এরপর শ্বাসজয় করে পরব্রহ্মের চিন্তা করতে করতে একপায়ে দণ্ডায়মান হয়ে স্থাণুর মতো অচল হয়ে তাঁর পঞ্চম মাস অতিক্রান্ত হল।

এরপর মন, যা শব্দাদি বিষয় এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সবার আশ্রয়, তাকে সকল বিষয় থেকে আকর্ষণ করে হৃদয়ে কেবল ভগবানের রূপ চিন্তা করতে লাগলেন। তখন অন্য কোন পদার্থ ধ্রুবর দৃষ্টিগোচর হয়নি। এইভাবে বালক মহদাদির আধারস্বরূপ এবং প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর ভগবানকে ধ্যান করলেন। তাঁর তপস্যার তেজ সহ্য করতে না পেরে ত্রিভুবন কম্পিত হতে লাগল। তিনি যখন একপায়ে দণ্ডায়মান হয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন পৃথিবী তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের ভারে নত হয়ে পড়ল। ধ্রুব তাঁর প্রাণ ও দ্বার নিরোধ করে নিজের সাথে অভেদ দর্শন করে পরব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হলে লোকপালগণের সাথে সকল লোকের শ্বাসরোধ হয়ে যায়; ফলতঃ তাঁরা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করে ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন, এই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের কুষ্মণ্ড নামক উপদেবতাগণ নানরূপ ধারণ করে ধ্রুবর তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করেন।[২১৪] তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পর তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।[২১৫]

---

২১৪ 'কুষ্মাণ্ডা ৰিৰিধৈ রূপৈর্মহেন্দ্রেণ মহামুনে।
সমাধিভঙ্গমত্যন্তমারব্ধাঃ কর্তুমাতুরাঃ।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ১৩।

২১৫ 'তে সমেত্য জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিম্।
শরণ্যং শরণং যাতাস্তপসা তস্য তাপিতাঃ।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ৩২।।

যাই হোক, উভয় পুরাণে উক্ত ভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে কোন তারতম্য নেই। এরপর শ্রীহরি তাঁর ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে চতুর্ভুজরূপে প্রকট হলেন এবং ধ্রুব যে মনোবাঞ্ছা নিয়ে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তদনুসারে উপযুক্ত বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বিমাতা সুরুচির গর্ভজাত না হওয়ায় সে রাজাসনের যোগ্য নয় - এইপ্রকার ভর্ৎসনা বাক্য শুনে ধ্রুব চেয়েছিলেন এমন এক সর্বোত্তম এবং অব্যয় স্থান লাভ করতে যা সমগ্র জগতের আধারভূত।[২১৬] শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় বালক ধ্রুব তাঁর ইচ্ছানুসারী স্থান প্রাপ্ত করেছিলেন, যা নিঃসন্দেহে ত্রিজগতে সর্বোৎকৃষ্ট, যা সম্পূর্ণ গ্রহ ও তারামণ্ডলের আশ্রয়স্বরূপ, এ হল এমন ধ্রুব তথা নিশ্চল পদ যা সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি আদি সকল গ্রহ, নক্ষত্র, সপ্তর্ষিগণ এবং সকল আকাশচারী দেবতাগণের ঊর্দ্ধে অবস্থিত।[২১৭] শুধু তাই নয়, ধ্রুবর এই পদের স্থায়িত্ব এক কল্প পর্যন্ত যেখানে অপরাপর দেবতাদের মধ্যে কেউ কেবল চার যুগ, কেউ বা এক মন্বন্তর পর্যন্তই থাকেন।[২১৮]

সুতরাং, ধ্রুবের উপাখ্যান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্যক্তির অদৃষ্টে যে পরিমাণ দুঃখ ভোগের থাকে, তা ভোগ না করে পালাবার পথ নেই। অর্থাৎ প্রারব্ধের হাত থেকে

---

[২১৬] 'আধারভূতং জগতঃ সর্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানং ত্বৎ প্রসাদাদতোঽব্যয়ম্।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ৮১।।

[২১৭] 'ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ প্রসাদাদ্ভবান্ ধ্রুব।।৯০।।
সূর্যাৎ সোমাত্তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্বৃহস্পতেঃ।
সিতর্কতনয়াদীনাং সর্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুব।।৯১।।
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে চ বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব।।'৯২ -বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়।

[২১৮] 'কেচিচ্চর্তুযুগং যাবৎ কেচিন্মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক -৯৩।

কারোর নিষ্কৃতি নেই। তবে, সেই দুঃখের জন্য অপর ব্যক্তিকে দোষারোপ করা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলেও বিদ্বান বা জ্ঞানীজন তা মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁরা জানেন যে, পূর্বকৃতকর্মের ফলেই (সুখ বা) দুঃখের ভোগ করতে হয়। জীবন পথে দুঃখের কোন চিহ্ন পায়নি - এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব; কারণ, অবিচ্ছেদ্য সুখ কোন ব্যক্তিই ভোগ করেন না। অর্থাৎ দুঃখের ভোগ অনিবার্য। আর এই দুঃখকে ভোগ করার মাধ্যমেই ব্যক্তির উত্তরণ সম্ভব। ব্যধি হলে তবেই আমরা ব্যধি দূরীকরণের জন্য পথ্যের সন্ধান করি। ঠিক তেমনই দুঃখের আগুনে দগ্ধ হলেই মানুষ সেই পীড়ামুক্তির পথের সন্ধান করে থাকে। আর ধ্রুবর উপাখ্যান আমাদের দেখায় যে, জীব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তার দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করলে সে তার চেষ্টায় কোনদিন ঠিকই উত্তীর্ণ হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুপুরাণ ধ্রুবর উপাখ্যানের মাধ্যমে মুক্তির একটি সহজ পন্থার সন্ধান দিয়ে থাকে এবং তা হল শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা।[২১৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ধ্রুব সাকারোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সাকারোপাসনাকেই গীতায় ভক্তিযোগরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গীতায় ভগবান নিজেকে সাকার এবং নিরাকার উভয়রূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। উভয় প্রকার আরাধনাই জীবকে মোক্ষরূপ লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্যকরলেও অধিকারীভেদেই এইপ্রকার নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ অধিকারী ভিন্ন হলে তার সাধনের মধ্যেও তারতম্য থাকবে।[২২০] তবে, ভগবান কর্তৃক উভয় প্রকার উপাসনার মাধ্যে সাকারোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হয়েছে।[২২১] এই সাকারোপাসনার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু প্রদর্শনের জন্য টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন যে, একই ফলপ্রদানকারী তথা

---

[২১৯] 'মামারাধ্য নরো মুক্তিমবাপ্নোত্যবিলম্বিতাম্।।' - বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ৮৮।।

[২২০] '.... যথাধিকারং তারতম্যোপেতানি চ সাধনানি।' - গীতা, মধুসূদন সরস্বতী টীকা, অনুবাদক পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, সম্পাদক নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, নবভারত পাবলিশার্স, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক - ২ এর টীকা ১, পৃ - ৮৫৪।

[২২১] 'অতঃ প্রথমং সাকারব্রহ্মবিদ্যাং প্ররোচয়িতুং স্তুবন্ প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ।' - তদেব, শ্লোক - ২ এর টীকা ২, পৃ - ৮৫৪।

মোক্ষপ্রদানকারী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সগুন ব্রহ্মোপাসনার তুলনায় অধিকতর ক্লেশকর হলেও দুষ্কর উপায় অবলম্বন করে যাঁরা তা প্রাপ্ত হন, তাঁদের তুলনায় যাঁরা সুকর সহজসাধ্য উপায়ে তা প্রাপ্ত হন, তাঁদেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়ে থাকে।[২২২] তবে, ক্লেশের অল্পতা থাকলেও অধিক ক্লেশের মাধ্যমে তথা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলের ন্যূনতা বা অপকর্ষ সাধিত হয় না; কারণ, গুরুপদেশ অথবা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির বারবার অনুষ্ঠানের ক্লেশ ছাড়াই ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলে সগুন ব্রহ্মের উপাসকের চিত্তে স্বতঃই বেদান্ত বাক্যের আবির্ভাব হয় এবং তার ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্যের নিবৃত্তি হয়ে থাকে।[২২৩] গীতায় ভগবান ভক্তিযোগের সাধ্যসাধকতা বিষয়ে বলেছেন, যাঁরা ভগবানে সকল কর্ম অর্পণ করে ভগবৎ-পরায়ণ হয়ে একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে তাঁর ধ্যান করতে করতে উপাসনা করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ভগবান অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন।[২২৪] আসলে সংসারকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে; কারণ, সমুদ্রকে পার করা যেমন অত্যন্ত কষ্টকর, তেমনি জগৎ-সংসারকেও অতি কষ্টে উত্তীর্ণ করা যায়।[২২৫] সংসারেরে প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জীবকে ক্লেশ বা দুঃখ তো ভোগ করতে হয়ই। শুধু তাই নয়,

---

২২২ 'যদ্যপ্যেকমেৰ ফলং তথাপি যে দুষ্করেণোপায়েন প্রাপ্নুৰন্তি তদপেক্ষয়া সুকরেণোপায়েন প্রাপ্নুৰন্তো ভৰন্তি শ্রেষ্ঠা ইত্যভিপ্রায়ঃ।।' - তদেব, শ্লোক - ৫ এর ৪ নং টীকা, পৃ - ৮৬৬।

২২৩ ''অতঃ ফলাধিক্যার্থমায়াসাধিক্যং ন ন্যূনতামাপাদয়তীতি চেৎ, ন,
সগুণোপাসনয়া নিরস্তসর্ব্বপ্রতিৰন্ধানাং ৰিনা গুরুপদেশম্ ৰিনা চ শ্রৰণমননিদিধ্যাসনাদ্যাবৃত্তিক্লেশং স্বয়মাৰিভূতেন ৰেদান্তৰাক্যেনেশ্বরশ্বরপ্রসাদসহকৃতেন তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদৰিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মলোক ঐশ্বর্য্যভোগান্তে নির্গুণৰিদ্যাফলপরমকৈৰল্যোপপত্তেঃ ''স এতস্মাৎ জীৰঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ম্ পুরুষমীক্ষতে'' (প্র:উ:৫/৫) ইতি শ্রুতেঃ।'' - তদেব, শ্লোক - ৬ এর ২ নং টীকা, পৃ - ৮৬৭।

২২৪ 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভৰামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাৰেশিতচেতসাম্।।' - তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক -৭।

২২৫ 'স এৰ সাগর ইৰ দুরুত্তরস্তস্মাৎ.....।' - তদেব, শ্লোক - ৭ এর টীকা, পৃ - ৮৬৯।

মোক্ষমার্গগুলিও ক্লেশকর। তবে, এই দুরুত্তর সংসার-সাগরকে ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবৎ-কৃপায় অতি অনায়াসেই অন্যান্য মোক্ষমার্গের তুলনায় স্বল্প ক্লেশ ভোগের মাধ্যমে পার করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই বক্তব্যের পূর্ণ প্রমাণ আমরা ধ্রুবোপাখ্যানে পেয়ে থাকি। বস্তুতঃ ভক্তিযোগের মাধ্যমেই ভগবদ্ প্রসাদে বালক ধ্রুব তাঁর কাঙ্ক্ষিত পদ লাভ করেছিলেন।

ভক্ত প্রহ্লাদের উপাখ্যান ঃ

ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে ভগবৎ পুরাণে উল্লিখিত অপর একটি উপাখ্যানে আমরা চরম ক্লেশের বর্ণনা পেয়ে থাকি। তা হল প্রহ্লাদের উপাখ্যান। এই উপাখ্যান আমাদের শুধুমাত্র ক্লেশের কথাই বলে না, তার সাথে ভক্তিযোগের মাধ্যমে ক্লেশমুক্তির উপায়েরও সন্ধান দিয়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণানুসারে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রহ্লাদ। এই প্রহ্লাদ অসুর পুত্র হলেও তাঁর মধ্যে যে স্বয়ং বিষ্ণু বিরাজমান ছিলেন, তার প্রমাণ আমরা গীতোক্ত শ্লোকেও পেয়ে থাকি। গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন যে, ''আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ......।''[২২৬] যিনি পরম সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ হওয়ায় সবাইকে প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদিত বা আনন্দিত করেন, তিনিই প্রহ্লাদ।[২২৭] গীতোক্ত উক্তি থেকেই পরিস্ফূট হয় যে, প্রহ্লাদ গুণবত্তায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই খেলাধূলা ত্যাগ করে ভগবানের ধ্যানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করতেন। শ্রীকৃষ্ণের

---

২২৬ 'প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রেঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিতাম্।।' - গীতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক - ৩০।

২২৭ 'দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে প্রকর্ষেণ হ্লাদয়ত্যানন্দয়তি পরমসাত্ত্বিকত্বেন সর্ব্বানিতি প্রহ্লাদশ্চাস্মি।' - গীতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক - ৩০-এর মধুসূদন সরস্বতীকৃত ১ নং টীকা, পৃ - ৭৯৬।

অনুগ্রহ তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, জাগতিক সুখ-দুঃখের কোন অনুভবই তাঁর থাকত না।[২২৮]

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়েই দেবর্ষি নারদ কর্তৃক ভাগবতধর্মের রহস্য এবং পরমজ্ঞান - এই দুই বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন এবং দেবর্ষির বিশেষ কৃপায় তিনি তা বিস্মৃত হননি।[২২৯] কিন্তু তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু শ্রীবিষ্ণুকে তাঁর শত্রু বলে মনে করতেন। সে ব্রহ্মার তপস্যা করে তার অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রহ্মা প্রদত্ত বর অনুসারে, ব্রহ্মার সৃষ্ট কোনকিছুই, তা সে মানুষ হোক বা পশু, প্রাণী বা অপ্রাণী, দেবতা বা দৈত্য বা নাগাদি - কারোর দ্বারাইমৃত্যু হিরণ্যকশিপুকে স্পর্শ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মা সৃষ্ট অস্ত্রাদির দ্বারা পৃথিবীর বুকে বা আকাশে কোথাও তার মৃত্যু হবে না । যুদ্ধের সময় কেউ যেন তার সামনে দাঁড়াতেও না পারে। আর সে সমস্ত প্রাণীকুলের একচ্ছত্র সম্রাট হবে।[২৩০] এই প্রকার দুর্লভ বরপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা গর্বে গর্বিত, শাস্ত্র লঙ্ঘনকারী হিরণ্যকশিপুর কঠোর শাসনে লোকপালগণ সহ সকল লোক ভীত ও অতীষ্ট হয়ে পড়েছিল। তখন সবাই বিষ্ণুর

[২২৮] 'ন্যস্তক্রীড়নকো ৰালো জড়ৰত্তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন ৰেদ জগদীদৃশম্।।' - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক - ৩৭।

[২২৯] ঋষি কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ।
ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্মলম্।।১৫।।
তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বন্মাতুস্তিরোদধে।
ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ।।১৬।। - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়।

[২৩০] যদি দাস্যস্যভিমতান্ ৰরান্মে ৰরদোত্তম্।
ভূতেভ্যস্ত্বদ্বিসৃষ্টেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো।।৩৫।।
নান্তৰ্বহির্দিৰা নক্তমন্যস্মাদপি চায়ুধৈঃ।
ন ভূমৌ নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগৈরপি ।।৩৬।।
ৰ্যসুভির্ৰাসুমদ্ভির্ৰা সুরাসুরমহোরগৈঃ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যং চ দেহিনাম্।।৩৭।। - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়।

শরণাপন্ন হলে তিনি বলেন যে, হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে দ্বেষবশতঃ তাঁর অনিষ্ট করতে চাইবে, তখন বরপ্রাপ্ত সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ভগবান তাকে অবশ্যই হত্যা করবেন।

বিধাতার বিধানানুসারে তা-ই হয়েছে। বালক প্রহ্লাদ যখনই দানববৈরী শ্রী বিষ্ণুর প্রশংসা করেছেন, সংসারের ভেদবুদ্ধির অন্ধকূপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসাবে শ্রীহরির শরণাপন্ন হওয়ার কথা বলেছেন, তখনই হিরণ্যকশিপু তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। কখনো সে ভয়ঙ্কর দৈত্যদের দ্বারা প্রহ্লাদকে প্রহার করিয়েছে, কখনো মত্তহাতির পায়ের তলায় পিশে মারার চেষ্টা করেছে, কখনো বিষধর সাপের দ্বারা দংশন করিয়েছে, কখনো পুরোহিতদের দ্বারা কৃত্যা রাক্ষসী উৎপন্ন করিয়ে তাঁকে মারার চেষ্টা করেছে; তা ছাড়া অন্ধকার কুঠুরিতে বন্ধ রেখে, বিষ পান করিয়ে, খাদ্যপানীয় বন্ধ করে ইত্যাদি নতুন নুতন উপায় উদ্ভাবন করে প্রহ্লাদকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে দানব পিতা। তুষারাবৃত স্থানে, অগ্নির লেলীহান শিখায়, উত্তাল সমুদ্রে বারবার নিক্ষেপ করে, ভয়ংকর তুফানের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে, পর্বতের নীচে পুঁতে দিয়ে ইত্যাদি এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিষ্পাপ পুত্রের একটুও অনিষ্ট সে সাধন করতে পারেনি।

বরং আমরা দেখেছি যে, হিরণ্যকশিপু কর্তৃক আনীত বহু ধরনের ক্লেশ প্রহ্লাদ জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্লেশবাণে জর্জরিত হয়েও তিনি অচলা হরিভক্তিতে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। প্রহ্লাদই ভগবানের প্রতি নবধা ভক্তির কথা বলেছেন। অর্থাৎ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাবের ন'টি ভেদ আছে; যথা, ১) ভগবানের গুণ, লীলা, নাম প্রভৃতির শ্রবণ, ২) কীর্তন, ৩) নাম-রূপাদির স্মরণ, ৪) চরণসেবা, ৫) পূজার্চনা, ৬) বন্দনা, ৭) দাস্যভাব, ৮) সখ্যভাব এবং ৯) আত্মনিবেদন। ভগবানের প্রতি সমর্পণের ভাব নিয়ে এই নয় প্রকার ভক্তির অনুশীলন

করাকেই প্রহ্লাদ যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করেছেন।[২৩১] তবে, সব ব্যক্তি ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না বলে প্রহ্লাদ মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, সংসারী জীব পিষ্ট পেষণ এবং চর্বিত চর্বণ করেই চলেছে। ইন্দ্রিয়-সংযম না থাকার ফলে ভুক্ত বিষয়কেই বারবার ভোগ করার জন্য সংসার নামক ঘোর নরকের প্রতি তারা নিরন্তর ধাবিত হয়। এই প্রকার বিষয়াসক্ত পুরুষের বুদ্ধি ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না।[২৩২]

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মন থেকে ভগবদ্‌ভক্তিকে নির্মুল করার জন্য আচার্যের আশ্রমে নৃপতির পালনীয় ধর্ম শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানেও আচার্যদেবের অনুপস্থিতিতে অপরাপর অসুর বালকদের প্রহ্লাদ সংসার-দুঃখ এবং সেই দুঃখ-সাগরে থেকে মনুষ্য জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী - তা উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জীবের যে গর্ভেই জন্ম হোক না কেন প্রারব্ধ অনুসারেই তার সুখভোগ হয়; অদৃষ্টে দুঃখভোগ থাকলে শত প্রচেষ্টা করেও সেই দুঃখকে নিবারণ করা যায় না।[২৩৩] প্রহ্লাদ অসুর বালকদের প্রতি আরো বলেছেন যে, মনুষ্যজন্মের শিশু অবস্থায় তার ভালোমন্দের বোধ থাকে না, কৈশোরে খেলাধূলার মধ্যেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এইভাবে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সময় কীভাবে অতিক্রান্ত হয়ে যায় বোঝাই যায় না। আবার যখন জরা শরীরকে গ্রাস করে সেই শেষের কুড়ি বছর মানুষের কর্মক্ষমতা থাকে না। সুতরাং, বাল্যকাল, কৈশোর এবং বার্ধক্যের সময়কে বাদ দিলে মনুষ্যজীবনে মাঝের

---

[২৩১] 'শ্রৱণং কীর্তনং ৱিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেৱনম্।
অর্চনং ৱন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিৱেদনম্।।২৩।।
ইতি পুংসার্পিতা ৱিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নৱলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগৱত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।২৪।।' - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়।

[২৩২] 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহৱ্রতানাম্।
অদান্তগোভির্ৱিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ৱিতচর্ৱণানাম্।।'৩০।। - তদেব।

[২৩৩] 'সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ৱত্র লভ্যতে দৈৱাদ্যথা দুঃখমযত্নতঃ।।' - ৩।। - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

যে কিছু বছর থাকে, সেই সময় মানুষ এমন সব বহু বাসনার পিছনে প্রাণপণে ধাবিত হয়, যা কখনো পূর্ণ হওয়ার নয়। অর্থাৎ মোহের জালে জড়িয়ে পড়ে মানুষ সাংসারিক বিষয়ের প্রতি এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যায় যে, সে তার করণীয় কী আর অকরণীয় কী - সেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কাজেই, বাল্যকাল, কৈশোর এবং বার্ধক্যের সময় বাদ দিয়ে যে বাকী সময় মানুষ পায়, সেই সময়টাও সাংসারিক বিষয়ভোগে বৃথা যায়।[২৩৪] অর্থাৎ জীবনের অমূল্য তথা মহামূল্যবান সময়কে মানুষ সংসারের মোহে আবদ্ধ হয়ে অতিবাহিত করে দেয় এবং কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক তাপত্রয় মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তবুও তাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না।[২৩৫] তাছাড়া সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার - এই কামনাই জীবকে যেকোন কর্মে প্রবৃত্ত করে। তবে, কামনা মাত্রই দুঃখের জনক। ফলতঃ সুখের কামনায় নিরন্তর ধাবিত হয়ে জীব কামনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দুঃখকেই সর্বদা ভোগ করে।[২৩৬] তবে, মোক্ষকে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা তথা পরম পুরুষার্থ বলে আমরা জানলেও প্রহ্লাদ কিন্তু ভগবানের চরণসেবা এবং নাম ও গুণকীর্তনে ব্যাপৃত থাকাকে মোক্ষলাভের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেছেন।[২৩৭]

---

[২৩৪] 'মুগ্ধস্য ৰাল্যে কৌমারে ক্রীড়তো যাতি ৰিংশতিঃ।
জরয়াগ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য ৰিংশতিঃ।।৭।।
দুরাপূরণে কামেন মোহেন চ ৰলীয়সা।
শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপয়াতি হি।।৮।।' - তদেব।

[২৩৫] 'কুটুম্বপোষায় ৰিয়ন্ নিজায়ুর্ন ৰুধ্যতেঽর্থং ৰিহতং প্রমত্তঃ।
সর্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নির্ৰিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ।।১৪।।' - তদেব।

[২৩৬] 'সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্মিণঃ।
সদাঽপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাৰৃতঃ।।৪২।।' - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়।

[২৩৭] 'তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।

সুতরাং, প্রহ্লাদের উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনের পথে যত ধরনের ক্লেশই আসুক না কেন, ইষ্ট দেবতার প্রতি আচলা ভক্তিভাব বজায় রেখে তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন বা আত্ম-সমর্পণ করলে ঐ ক্লেশ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। আমাদের এই সংসার সাগর যা ক্লেশের নামান্তর মাত্র। অতএব, এই সংসাররূপ নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইষ্ট দেবতার প্রতি ভক্তিই প্রধান। সেই ভক্তি বজায় রাখলে তৎকালিক মোক্ষলাভ না হলেও ধীরে ধীরে তা ক্লেশের নাশক হয়ে থাকে। প্রহ্লাদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, শ্রীহরির প্রতি প্রেমময় নিষ্কাম ভক্তি থাকায় পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক বহুবার বহুভাবে ক্লেশের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই সবকিছুকে জয় করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর আঘাত হানার ফলশ্রুতি হিসাবে স্বয়ং ভগবান নৃসিংহ অবতারে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুর বধ করেছিলেন। কাজেই, যে ব্যক্তি ক্লেশ প্রদায়ক হয়, ভগবানের প্রভাবে সে নিজেই ক্লেশের শিকার হয়ে থাকে।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যান ঃ

কথায় আছে ‘যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে’, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই একদিকে যেমন মহাভারতের প্রভাব আছে, তেমনই মহাভারত হল ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির খনি। মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্যে দর্শন, আধ্যাত্মিকতা নিহিত আছে। বস্তুতঃ মহাভারত হল দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বিশাল সম্ভার। যাই হোক, এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য, দুঃখই মুক্তইর সোপান

ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারংজুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ।।২৫।।’ - শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ, সপ্তম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

তথা দুঃখই উত্তরণের পথের দিশারি। তাই এই উদ্দেশ্যে মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উপাখ্যানটির জুরি মেলা ভার। মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রকেই মহাকবি কালিদাস তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নামক সপ্তমাঙ্কের নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকে তাঁর অসাধরণ চমৎকারী কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। কালিদাসের অঙ্কিত শকুন্তলা-চরিত্রের বর্ণনা করলে আমাদের প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। তাই এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি কালিদাস বিরচিত এই 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শরণাপন্ন হয়েছি।[২৩৮] কালিদাস শকুন্তলা-চরিত্রের পরতে পরতে দুঃখকে চিত্রিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এও দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যা সুখ তা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই নামান্তর এবং যে সুখ সহজলব্ধ তা আসলে দুঃখেরই বাহক। দুষ্মন্ত ছিলেন পুরুবংশীয় রাজা। একদা রাজা মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এক অতিবেগবান কৃষ্ণসার হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মালিনী নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। মহর্ষির তপোবনে হিংসার কোন স্থান নেই; এই কারণে হরিণগুলি রাজার রথের শব্দ শুনেও এদিকে ওদিকে পালিয়ে যাচ্ছে না। যাই হোক, রাজা কণ্বের আশ্রমে এসে উপনীত হলেও তখন মহর্ষি আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আশ্রমের অতিথি সৎকারের ভার কন্যা শকুন্তলার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় অতিথিরূপ রাজা দুষ্মন্তের সাথে শকুন্তলার সাক্ষাৎ। শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁরা গান্ধর্ব বিবাহ সম্পাদন করেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। শকুন্তলা কণ্বের দুহিতা হয়ে ক্ষত্রিয় কীভাবে হলেন? শকুন্তলার বান্ধবী অনসূয়ার মুখে রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানতে পারেন। তাঁর জন্মবৃত্তান্তটি এরূপ ঃ পূর্বে এক সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর তপস্যায় স্বর্গের দেবতারা ভীত হয়ে তাঁর তপস্যাভঙ্গের

[২৩৮] কালিদাস গ্রন্থাবলী, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, তৃতীয় ভাগ, পৃ - ১-২১২, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রণ।

উদ্দেশ্যে স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণা করেন। এরপর মহাভারত থেকে জানা যায় যে, বিবস্ত্রা মেনকার রূপ দেখে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। মেনকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং পরে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে তিনি ইন্দ্রসভায় গমন করেন। ঐ কন্যাসন্তানটিই শকুন্তলা। মহাভারতে আমরা মহর্ষি কন্বের মুখে শুনেছি যে, নির্জনে বনের মধ্যে যেহেতু এই শিশুকন্যাটিকে শকুন্ত অর্থাৎ পাখিরা লালন-পালন করেছিল, সেই কারণে মহর্ষি ঐ শিশুর নাম রেখেছিলেন 'শকুন্তলা'। শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনেই তাঁর কষ্টের কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কেমন সেই পিতা, যিনি তাঁর নিজের ঔরসজাত নবজাতিকাটিকে প্রেমালিঙ্গন করেন না? কেমন সেই মাতা যিনি নিজের গর্ভের সন্তানকে নদীর তীরে ফেলে রেখে যায়? অর্থাৎ শুধুমাত্র কামের বশেই তাঁরা পিতা-মাতা হয়েছেন। পিতা-মাতা হওয়ায় সন্তানের প্রতি বিবেকের তাড়না বা নৈতিকতা কিছুই নেই। সেই কন্যাসন্তান যখন বড় হয়ে এই বৃত্তান্ত জানতে পারে এবং যখন এই সবকিছু বোঝার ক্ষমতা তার থাকে, তখন তার মনের অবস্থা যে কী হতে পারে, তা আন্দাজ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে, কোন ব্যক্তি চরিত্রের সমালোচনা বা মূল্যায়ণ করা আমার নিবন্ধের লক্ষ্য না হলেও সন্তানের দিক থেকে সেই জ্বালা কতটা, তা বোঝানোর জন্যই উক্ত কথা বলা হয়েছে।

যাই হোক, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের পর কালিদাস দেখিয়েছেন যে, মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানা প্রকার উৎপাত করছিল। রাজা নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য সব বিপদ নিবারণ করেছেন। তাই আশ্রমে থাকার জন্য রাজার আর কোন অজুহাত বাকি নেই। তিনি নিজ রাজধানীতে চলে গেছেন। এদিকে শকুন্তলা আশ্রমে রাজার চিন্তায় মগ্ন, এক কথায় সে আত্মবিস্মৃত। এমতাবস্থায় সুলভকোপ দুর্বাসা আশ্রমে উপস্থিত হন এবং আত্মগত

শকুন্তলার কোন সাড়া না পেয়ে শকুন্তলাকে অভিসম্পাত করেন যে, শকুন্তলা যার চিন্তায় আত্মহারা হয়ে মুণিকে চিনতে পারল না, সেই ব্যক্তিকে হাজার মনে করিয়ে দিলেও সে শকুন্তলাকে মনে করতে পারবে না। তবে, ঠিক সেই সময় শকুন্তলার সখীদ্বয়ের (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) অনুনয়-বিনয়ের ফলে মুণি বলেন, যদি কোন অভিজ্ঞান তথা চিহ্ন শকুন্তলা দেখাতে পারে, তাহলেই রাজার তাকে মনে পড়বে। আশার আলো এই যে, এই চিহ্ন শকুন্তলার হাতেই আছে এবং তা হল রাজার নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ আংটি। উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, যে বস্তু ক্ষণকালের মধ্যেই সুখ উৎপন্ন করে, তা প্রকৃতপক্ষে দুঃখেরই কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শকুন্তলার জীবনে রাজা অল্প সময়ের মধ্যেই সুখ বহন করে নিয়ে আসলেও সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়না; কারণ, রাজার সঙ্গসুখ থেকে শকুন্তলা ক্ষণিকের মধ্যেই বঞ্চিত হয়। ফলতঃ যা আপাতদৃষ্টিতে সুখ বলে মনে হয়েছিল তা যথার্থই দুঃখের বাহক। মহাকবির বর্ণনায় এই দুঃখ আরো স্পষ্ট আকার ধারণ করেছে; কারণ, রাজার বিরহে আত্মগত শকুন্তলার উপর দুর্বাসার অভিশাপ যেন গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত। সুতরাং, সুখ মাত্রই দুঃখের বাহক। অজ্ঞ জীব বোঝে না যে সুখের আশায় আমরা যা পাওয়ার ইচ্ছা করি তার পরিণামে আমাদের দুঃখ-প্রাপ্তিই ঘটে। শকুন্তলা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটি হল এই যে, আমরা যদি কর্তব্যচ্যুত হই তাহলে আমাদের কোন না কোন শাস্তি ভোগ করতেই হয়। শাস্তি মাত্রই দুঃখদায়ক। শকুন্তলার উপর মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের অতিথি সৎকারের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শকুন্তলা রাজার চিন্তায় আত্মগত হয়ে আশ্রমের অতিথি দুর্বাসার ঠিকমতো অর্চনা করল না। অর্থাৎ শকুন্তলার দায়িত্ব বা কর্তব্যচ্যুতি ঘটল। শকুন্তলা জগতকে ভুলে গিয়েছিল। কণ্ব, কণ্বের আশ্রম, আশ্রমের তরু, মৃগ সবকিছু সম্পর্কেই সে বিস্মৃত। এমন কি অতিথি সেবা আশ্রমীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

শকুন্তলা নিজের জন্য অন্ধ হয়ে সেই কর্তব্যও বিস্মৃত হয়েছিল। তাই এইপ্রকার কর্তব্যের অবহেলার জন্য শকুন্তলাকে শাস্তি পেতে হল। তবে শাস্তির সার্থকতা সংশোধনে। এই কারণে দুর্বাসার অভীশাপে সে ভস্মীভূত হল না। এর থেকে আরো বোঝা গেল যে, আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, আগুনের তাপে দুধ মরে যেমন ক্ষীর হয়, তেমনি জীব দুঃখের অনলে পুড়ে খাঁটি হয় অর্থাৎ নিজেকে সংশোধন করে এবং ফলতঃ তার সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং, দুঃখই আমাদের দুঃখকে এড়াবার তথা দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখায়।

যাই হোক, শকুন্তলার দুঃখ সীমা ছাড়ায় যখন তার একমাত্র অভিজ্ঞান তথা রাজার নামাঙ্কিত আংটি নদীর জলে তলিয়ে যায়। ফলতঃ রাজপ্রাঙ্গনে রাজা যখন শকুন্তলাকে চিনতে অসমর্থ হন তখন শকুন্তলা ঐ আংটি-টি প্রদর্শন করতে পারে না এবং রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে শকুন্তলার দুঃখের আগুনে ঘি পড়ে। পরে অবশ্য এক জেলে রুই মাছ কাটতে গিয়ে মাছের পেটের ভিতর থেকে ঐ আংটি-টি পায় এবং ঘটনাচক্রে সেই আংটি-টি রাজার কাছে আসে। পরবর্তীতে আমরা দেখি যে, শিশু ভরতের মা শকুন্তলার সাথে রাজার মিলন হয়। রাজার রাজমহল থেকে প্রত্যাখ্যান এবং রাজার সাথে পুনর্মিলন - এই মধ্যবর্তী সময়ে শকুন্তলা আনেক কৃচ্ছ্রসাধনা করেছেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে শকুন্তলা বিচ্ছেদবিরহকে অতিক্রম করে একরবারে ভারতেশ্বর দুষ্মন্তের রাণী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শকুন্তলার প্রতি অবিচার করে রাজা অনুতপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি কোন দোষ করার পর তার নিজের বিবেক যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে, তা হলে তার থেকে বড় শাস্তি বোধ হয় আর কিছু হয় না। শকুন্তলা এত

দুঃখ সহ্য করার পরও সৌভাগ্যবতী; কারণ, দুষ্মন্ত বিবেকের দহনে জ্বলে পুড়ে রীতিমতো অর্ধমৃত।[২৩৯]

তবে, দুঃখের আগুনে পুড়লেও শকুন্তলা তার এই দুঃখের জন্য নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করেছেন। রাজা তাঁর রাজলক্ষ্মীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে[২৪০] যখন নিজের দোষের জন্য অনুশোচনা করেছেন, শকুন্তলা তখন রাজাকে পদতল থেকে উঠিয়ে সান্ত্বনার জন্য বলেছেন যে, তার সব পুণ্যকে বাধা দিয়ে পূর্বজন্মকৃত পাপই তাকে সেই বিপদে ফেলেছিল।[২৪১] রাজা কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর রাজমহিষীর সিংহাসন প্রাপ্তি, তাও আবার সম্মানের সাথে এ যেন দাবদগ্ধ বনে হঠাৎ বৃষ্টির ধারা।

সুতরাং, কালিদাস বিরচিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকটি থেকে আমরা বুঝি যে, মানস সরোবর, যা চিরশান্ত, চিরশীতল, সেই স্বপ্নময় স্থানে পৌঁছাতে হলে অনেক দুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করতে হয়। সেই রকমই দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা না দিয়ে কখনো জীবের সামগ্রিক উন্নতি বা উত্তরণ সম্ভব হয় না। নাটকটির মাধ্যমে কবিকুলোত্তম কালিদাস পার্থিব প্রেম এবং স্বর্গীয় প্রেম - এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। পার্থিব প্রেম কামভাব দুষ্ট। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার হৃদয়ে ভোগলিপ্সা যতদিন ছিল ততদিন হাতে চাঁদ পেয়েও যেন তা ধরা দেয়নি, অর্থাৎ তাদের মিলন ঘটেনি। কিন্তু স্বর্গীয় প্রেম অমূল্যরত্নের মতো, যা পার্থিব রঙ্গস্থল থেকে অনেক উর্ধ্বে, যা কামগন্ধশূন্য। তাই অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে, বিচ্ছিন্ন-লালস হয়ে, শুধুমাত্র পরস্পরের মিলিত

---

[২৩৯] 'প্রিয়ে! ক্রৌর্য্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তম্ অনুকূলপরিণামং সংবৃত্তং যদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানং পশ্যামি।।৮৯।।' - সপ্তমাঙ্ক

[২৪০] 'শকুন্তলায়াঃ পাদয়োঃ প্রণিপত্য......।।৯৫।।' - সপ্তমাঙ্ক।

[২৪১] 'উঠ্ঠেউ অজ্জউত্তো! ণূণং সে সুঅরিঅপ্পড়িৰন্ধঅং পুরাকিঅং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসি জেণ সানুক্কোসো ৰি অজ্জউত্ত মি ৰিরসো সংৰুত্তো।।৯৭।।' - সপ্তমাঙ্ক।

হওয়ার প্রবল আকুতি, আকুলতার জন্যই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পার্থিব প্রেম থেকে স্বর্গীয় প্রেমে উত্তরণ ঘটে। কাজেই, দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উত্তরণ ঘটে না। দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়েই জীবের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

উপসংহার

মোক্ষকে মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে দেখানো ভারতীয় দর্শনের এক বিশেষ শৈলী। ন্যায়দর্শনে মোক্ষকেই অপবর্গ বলা হয়েছে। শুধু ন্যায়দর্শন নয়, অন্যান্য ভারতীয় দর্শন যেমন, সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত - এইসব আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়, এমনকি বৌদ্ধ, জৈন - এই নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়েও মোক্ষকেই জীবের পরম প্রয়োজন বলা হয়েছে এবং এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উক্ত সকল দর্শনের যাবতীয় আলোচনা প্রসার লাভ করেছে।

কিন্তু মানুষ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক - এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা মানুষের জীবন জর্জরিত। মানুষের জীবন দুঃখময় বলেই মানুষকে দুঃখত্রয়ের অভিঘাত থেকে মুক্ত করা ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। মুক্তি বলতে এই দুঃখত্রয়ের অভিঘাত থেকে মুক্তির কথাই এখানে বলা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বা অপবর্গ বলা হয়েছে। মুক্তিতে জন্মপ্রবাহের অত্যন্ত উচ্ছেদ হওয়ায় তাতে সব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে থাকে। দুঃখ আছে বলেই তা থেকে মুক্তি জীব মাত্রেরই কাম্য। সব দর্শনেই দুঃখকে হেয় বা পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সব দর্শন সম্প্রদায়ই মুক্তি বিষয়ক আলোচনার আগে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ, দুঃখের অস্তিত্ব ছাড়া মুক্তির প্রসঙ্গ অর্থহীন।

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায় যে, দুঃখের অস্তিত্বকে আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের পার্থিব আনন্দের সঙ্গে কোন না কোন দুঃখানুভূতি সম্পৃক্ত থাকবেই। আসলে দুঃখ না থাকলে সুখেরও কোন কদর থাকত না। সত্য হল এই যে, জাগতিক সকল সুখের সঙ্গে দুঃখানুভূতি জড়িত রয়েছে। পার্থিব সুখ মাত্রই দুঃখসম্পৃক্ত। রাতের আকাশে বিদ্যুতের চমকের

মতোই জগতে সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের স্থায়িত্ব সুখের তুলনায় অনেক বেশী। জাগতিক সুখের তুলনায় স্বর্গসুখের স্থায়িত্ব অধিক হলেও স্বর্গসুখও দুঃখবিমিশ্রিত; কারণ, স্বর্গসুখভোগকাল অতিক্রান্ত হলে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসার ভয়ে স্বর্গবাসীগণ কখনো কখনো দুঃখিত হয়ে পড়েন। সুতরাং, আসল কথা হল, কোনো সুখই চিরস্থায়ী হয় না।

বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলে যে ভ্রম বদ্ধ জীবের হয়, তার ফলেই তাকে যত দুঃখ ভোগ করতে হয়। মূঢ়, অবিবেকী ব্যক্তিগণ তীব্র আসক্তির বশে জাগতিক বিষয়ভোগে মত্ত থাকে, এবং তারা নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা চালিত হয়ে কখনো পশু, তির্যক প্রভৃতি জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনো স্বর্গাদি লোকের সুখভোগও করে। কাজেই, এইভাবে তারা বারবার জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা সংসারদুঃখ ভোগ করতে থাকে। দুঃখ হল জীবের পূর্বজন্ম অথবা ইহ জন্মের অধর্মরূপ কর্মের ফল। আমরাই আমাদের কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দুঃখের কারণ হই। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'। অর্থাৎ সুখ হোক বা দুঃখ, কেউই তা আমাদের দান করেন না; বরং তা হল আমাদেরই স্বকৃত পূর্বকর্মের ফল। এই বিষয়ে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার কৃত বা সম্পাদিত সেই কর্মের ফল তাকে ইহজন্মে বা পরজন্মে ভোগ করতেই হবে। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, কৃতের নাশ যেমন হয় না, তেমনি অকৃতের ভোগও হয় না। যেমন কর্ম, তেমন ফল - এটিই নৈতিক জগতের কার্য-কারণ নিয়ম। এই নিয়মকেই বেদে ঋত বলা হয়েছে। ঋতই সমগ্র জগতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। এটিকেই আবার ধর্মও বলা হয়েছে; কারণ, যা ধারণ করে, তাই ধর্ম। যাঁরা ঈশ্বরবাদী তাঁরাও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন যে, ঈশ্বর তো দয়াময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়। তাহলে তাঁর সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত অমঙ্গল কেন ? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরাও ঐ একই উত্তর প্রদান করে থাকেন। ঈশ্বরবাদীগণ আরো বলেন যে, মা যেমন সন্তানকে শাসন বা ভর্ৎসনা

করেন সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তেমনই দুঃখ হল ঈশ্বরের দান। আগুনে পুড়ে যেমন সোনা খাঁটি হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়ে ঈশ্বর মানুষকে ভগবৎমুখী করান। সুতরাং, দুঃখ হল জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। অধর্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখভোগ আমাদের হয়, তা দুঃখের মোড়কে বিধাতার পুরস্কার। আমরা দেখেছি যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের সখা হলেও তাঁরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নিদারণ কষ্টভোগ করেছেন, রামায়ণে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে এবং রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করেছেন। পুরাণে দেখেছি যে, ধ্রুব বিমাতার কঠোর বাক্যে যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তা অতিক্রম করার জন্য সে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং ভগবদ্ কৃপায় সে তাঁর ইচ্ছানুসারী যথাযথ স্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে ত্রিজগতে সর্বোৎকৃষ্ট। ধ্রুবের উপাখ্যান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্যক্তির অদৃষ্টে যে পরিমাণ দুঃখ ভোগের থাকে, তা থেকে পালাবার পথ নেই। সুতরাং, দুঃখের জন্য অপর ব্যক্তিকে দোষারোপ করা বদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলেও জ্ঞানীজন তা মনে করেন না। আবার, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু কর্তৃক আনিত বহু ধরনের ক্লেশ জয় করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর অচলা হরিভক্তির মাধ্যমে।

বস্তুতঃ দুঃখ সবসময়ই কাম্য, যখন তা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অন্নগ্রহণ করলে মানুষের যে সুখলাভ হয়, তার জন্যও রন্ধনরূপ দুঃখ মানুষকে পোহাতে হয়। আসলে উদ্দেশ্যের ভিন্নতার জন্যই সুখ দুঃখে, আবার দুঃখ সুখে পরিণত হয়। দুঃখ যে সর্বথা হেয় নয়, তা বোঝাতে কবিও বলেছেন, 'এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো'; অর্থাৎ দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণার অভিঘাত এসে উপস্থিত হলে আমরা সাধারণ বদ্ধ জীব সব সময় ঈশ্বরকেই দায়ী করে থাকি এবং আমাদের মতো ভোগবাদী মানুষ তাঁকে নিষ্ঠুর বলি। কাজেই এটা আমদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবি এই দুঃখের হানাহানিকে ভালো

বলেছেন। সুতরাং, এটাই স্পষ্ট যে, আপাতভাবে দুঃখ যতই হেয় হোক না কেন তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম যে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশ করেছেন, তন্মধ্যে আত্মাই প্রথমোদ্দিষ্ট প্রমেয় পদার্থ। অর্থাৎ আত্মাই হল প্রধান। আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিই হল সংসারের নিদান। সাধারণ মায়াগ্রস্ত মানুষ শরীর, মন, বুদ্ধ ইত্যাদি অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলে মনে করে। এই মিথ্যাজ্ঞানের জন্যই জীব বারবার শরীর গ্রহণ করে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হয়। কাজেই, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের ফলেই জীব বারবার শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান থেকেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি ঘটে। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বাত্মযোগ সম্ভব হয় না বলে আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরও সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানই প্রথমে মুমুক্ষুর আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করে এবং তারপরে তা মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। বস্তুতঃ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কর্মফলদাতৃরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবশ্যস্বীকার্য বলা হয়েছে। জীবের অনুষ্ঠিত সব শুভাশুভ কর্ম দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়। সুতরাং, স্বর্গাদিসুখলাভের জন্য বা নরকাদি দুঃখের জন্য যথাক্রমে শুভ ও অশুভ কর্ম নিজে ফল পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। অনুষ্ঠিত কর্ম এবং সেই কর্মজনিত ফলের মধ্যবর্তী একটি ব্যাপারকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এই ব্যাপারটিকেই অদৃষ্ট বলা হয়েছে। একে ধর্ম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। আসলে কার্যের ফল দ্বিবিধ - দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আমাদের ভোজনরূপ কার্যের ফল ক্ষুন্নিবৃত্তি, যা দৃষ্ট। কিন্তু, যাগাদির ফল এরূপ দৃষ্ট নয়; কারণ, যাগাদি স্বর্গাদির অব্যবহিত পূর্বে না থাকায় যাগাদিই যে স্বর্গজনক - এটি উপপন্ন হয় না। তাই যাগাদি কার্য ও স্বর্গাদি ফলের

মধ্যবর্তী অদৃষ্টরূপ ব্যাপার অবশ্যস্বীকার্য। এই অদৃষ্ট আত্মনিষ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ বলেই জীবের যার যেরূপ ভোগ অদৃষ্টাধীন তার সেইরূপ ভোগই হয়ে থাকে, তদতিরিক্ত বা তদন্যূন হয় না। অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মজনিত ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের ফল ভোগ করে জীব। আর, জীব নিজে কর্মফলভোক্তা হওয়ায় সে নিজে অদৃষ্টের পরিচালক হতে পারে না। বস্তুতঃ জীব অসর্বজ্ঞ হওয়ায় তার নিজের অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত অদৃষ্টের অর্থাৎ ধর্মাধর্মের দ্রষ্টা হতে পারে না। এই কারণে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে স্বীকার করতেই হয়, যিনি জীবগণের অদৃষ্টকে সহকারী করে শুভাশুভ কর্মানুসারী শুভাশুভ ফল বিধান করেন।

ঈশ্বরই হলেন জীবের কর্মের প্রযোজক কর্তা; তিনিই সমস্ত কর্মের কারয়িতা। জীবের কর্মজন্য অদৃষ্টই তার সুখ-দুঃখের কারণ। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। অর্থাৎ জীব যে সুখভোগ করে, তা তার পূর্ব সম্পাদিত শুভকর্ম বা ধর্মজন্য; অপরদিকে, জীবের দুঃখ অশুভকর্ম বা অধর্মজন্য। তবে, কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত না হলে তার কর্মের মূল্যায়ণ করা যায় না। তাই ঈশ্বরকে জীবের কর্মের প্রযোজক বা ঐ কর্মের কারয়িতা বললে জীবকে কর্মের কর্তারূপে কীভাবে স্বীকার করা যায়? আর কর্মে জীবের কর্তৃত্ব স্বীকৃত না হলে কর্মফলের ভোক্তাও জীব হতে পারে না। উত্তরে বলা যায় যে, ঈশ্বর জীবকে কর্মে প্রযুক্ত করালেও জীবের কোন কর্তৃত্ব নেই - একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ জীবের প্রযোজ্যকর্তৃত্ব স্বীকরত হয়েছে। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হলেও, তা ঈশ্বরাধীন হলেও জীবই কর্মসম্পাদন করে। ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন ও ধর্মাধর্মকে অপেক্ষা করে তদনুসারে জীবকে নান কর্মে প্রবৃত্ত করান। কিন্তু তাহলে কেন জীবকেই সেই সব সাধু ও অসাধু কর্মের ফলভোগ করতে হয়? বস্তুতঃ ঈশ্বর জীবকে দিয়ে নানা কর্ম করালেও তাঁর মিথ্যাজ্ঞান না থাকয় তিনি রাগ-দ্বেষাদির উর্দ্ধে; কিন্তু জীব কর্ম করে রাগ-দ্বেষাদির অধীন হয়ে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবকে বাধ্যতাপূর্বক কর্মে

প্রবৃত্ত করান না; বরং তিনি জীবের মধ্যে রাগাদি উৎপন্ন করে তার দ্বারাই জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করান। ফলতঃ জীবের কর্তৃত্ববোধও জন্মায়। এইভাবে জীবের কর্তৃত্ব থাকায় শাস্ত্রনির্দেশিত বিধি ও নিষেধের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জীবকে কর্মের কর্তা ও ভোক্তারূপে স্বীকার না করলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কোন সার্থকতা থাকে না। কাজেই, ঈশ্বর জীবের সব কর্মের কারয়িতা হলেও ফলের ভোক্তা হন না, ফলবিধাতাই হন।

ঈশ্বরই যখন জীবকে কর্মে প্রযুক্ত করিয়ে থাকেন, তা হলে কেন তিনি জীবকে দুঃখজনক অশুভ কর্মে নিযুক্ত করান? আসলে ঈশ্বর জীবকে তার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের অভ্যাসানুসারেই উত্তর উত্তর জন্মে কর্ম করান। জীব অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই কর্ম করে; কর্মের অভ্যাস ব্যতিরেকে কোন জীবই কোন কর্ম করতে পারে না। পূর্ব পূর্ব জন্মে জীব যেমন কর্ম অভ্যাস করেছে, এই জন্মেও পূর্ব কর্মের অভ্যাসবশতঃ তেমন কর্ম করতেই বাধ্য হয়। এই কারণেই আমরা দেখি যে, কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ কর্মে বা বিষয়ে অধিক অনুরক্ত বা বিশেষ কোন বিষয়ে অধিক পারদর্শী। যেমন, কেউ দর্শনে অনুরক্ত, কেউ ইতিহাসে, আবার কেউ রসায়নে, কেউ বা আবার সঙ্গীত চর্চায় একাগ্রচিত্ত। এই ধরনের অনুরাগের কারণ হল পূর্ব পূর্ব জন্মে সেই বিষয় বিশেষে অভ্যাসজনিত সংস্কার। এই সংস্কারবশতঃই অনেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বভাবতঃ শুভ কর্ম করেন। সুতরাং, পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃই জীব তার পরবর্তী জন্মে বিশেষ বিশেষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তদনুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকে।

এরকম বললে মনে হতে পারে যে, যে ব্যক্তি অশুভ কর্মানুষ্ঠান করে, তা-ও তার পূর্ব পূর্ব জন্মের অভ্যাস বা সংস্কারবশতঃ এবং ফলতঃ সেই ব্যক্তি উত্তর উত্তর জন্মেও অশুভ কর্মই করতে থাকবে এবং ফলস্বরূপ দুঃখভোগ করতেই থাকবে। অপরদিকে, শুভকর্ম সম্পাদনকারী শুভকর্ম করতেই অভ্যস্ত হওয়ায় সে জন্মজন্মান্তরে শুভকর্মের অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ

সুখভোগ করতেই থাকবে। সুতরাং, একথা বললে একদিকে যেমন সুখীর দুঃখপ্রাপ্তি অথবা দুঃখীর সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি অন্যদিকে জীবের মুক্তির প্রসঙ্গও সুদূর পরাহত হয়, যেহেতু সুখ-দুঃখের ভোগই হল সংসাররূপ বন্ধন, আর কর্মফলমাত্রই সুখ-দুঃখের ভোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, সংসার-বন্ধনের কারণ জীবের কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান, কর্ম নয়। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান ক'রে এবং কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে জীব কর্ম করতে পারলেই অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের সাধন করতে পারলেই জীবকে কর্মফলভাগী হতে হবে না। যেসব কর্ম রাগাদ্বেষাদিবশতঃ কামনার দ্বারা কলুষিত, সেইসব কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। কোটি কোটি কল্পেও ভোগ ব্যতীত এই ধরনের কর্মের ক্ষয় হয় না। অদৃষ্টবশতঃ বা পূর্ব জন্মের অভ্যাসবশতঃ জীব কর্ম করতেবাধ্য হলেও সেই কর্মকে রাগদ্বেষাদিবশতঃ কামনার দ্বারা সম্পাদনপূর্বক বন্ধনের কারণ না করে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জনপূর্বক নিষ্কাম কর্মের সম্পাদন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা জীবের থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও তিনি জীবের শুভাশুভ কর্মের সামর্থ্যকে লোপ করতে পারেন না ; কারণ, ফলপ্রসব না করে জীবের কর্মক্ষয় একেবারে অসম্ভব। প্রলয়কালেও জীবের শরীর না থাকায় দুঃখের ভোগ সম্ভব না হলেও জীবের অদৃষ্ট তখনও থাকে এবং ফল উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেই অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না বলে জীবগণের মুক্তি হয় না। তাই ঈশ্বর জীবগণের দুঃখনিবৃত্তির জন্যই করুণার বশে পুনঃসৃষ্টি করেন। ঈশ্বর করুণাময় বলেই জীবকে দুঃখদান করে তার অশুভকর্ম নাশ করেন। সুতরাং, জীবের দুঃখের সাক্ষাৎকার ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই কারণেই আমরা দেখি যে, কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুঃখের প্রার্থনা করেছেন। এই কারণেই দুঃখকে মুক্তির সোপানরূপে গণ্য করা যায়।

জীব কর্মানুসারে যখন যে দেহ লাভ করে, তখন তার পূর্বকালীন সেইপ্রকার দেহরূপ জন্মের সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ জীব অনাদিকাল থেকে অনন্ত জীবযোনি প্রাপ্ত হয়ে বিচিত্রসংস্কার লাভ করলেও জীবের সমস্ত জন্মে সমস্ত পূর্ব-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় না। কোন জীবের মনুষ্যযোনি প্রাপ্তির পর যদি সে নিজ কর্মানুসারে হস্তীদেহ লাভ করে, তাহলে তখন তার পূর্বকালীন হস্তীজন্মের সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য জন্মের সংস্কারসমূহ অভিভূত থাকে। পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃই হাঁস জন্মানোর অব্যবহিত পরেই জলে সাঁতার কাটতে পারে; বানর শিশু জন্মমাত্রই গাছে আরোহণ করতে পারে; গণ্ডারশিশু মাতাকর্তৃক গাত্র-লেহনের ভয়ে জন্মমাত্রই মাতৃসঙ্গ ত্যাগ করে।[২৪২] সুতরাং, জীবের জন্মান্তর অবশ্যস্বীকার্য।

আবার জীবের জন্মান্তর স্বীকার করলেই আমরা নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোকের প্রাপ্তির ব্যাখ্যা দিতে পারি। শিশুর হাসি দেখে হর্ষের, শিশুর শরীরে কম্প দেখে ভয়ের এবং শিশুর কান্না শুনে তার শোকের অনুমান আমরা করে থাকি। হর্ষ হল একপ্রকারের সুখ, যা অভিলষিতবিষয়ের প্রাপ্তি থেকে উৎপন্ন হয়। আবার, অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি থেকে শোক বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জাতমাত্র শিশুর ইষ্ট-অনিষ্টের জ্ঞান না থাকায় ইষ্টজনক বস্তুতে অভিলাষ এবং তদ্প্রাপ্তিতে হর্ষ ও অপ্রাপ্তিতে শোক উৎপন্ন হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং, শিশুর পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশতঃ যে বিষয়ে ইষ্টজনকত্বের স্মৃতি জন্মায়, সেই বিষয়টিই শিশুর অভিলষিত হয়। যেমন, জাতমাত্র শিশুর মাতৃদুগ্ধপানের যে ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছার কারণ হল 'মাতৃদুগ্ধ আমার ইষ্টজনক' - এইপ্রকার ইষ্টজনকতার জ্ঞান; এইপ্রকার ইষ্টজনকতার জ্ঞানের কারণ হল

---

[২৪২] গণ্ডার মাতার জিভ তীক্ষ্ণধার ও কাঁটাবিশিষ্ট হয়। ফলতঃ গণ্ডারশাবক জন্মের পর মা যদি আদর করে সদ্যজাতের গাত্রলেহন করে, তাহলে সদ্যজাত গণ্ডারশাবকের নরম ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তার মৃত্যু অবধারিত হয়। এই কারণে গণ্ডার শিশুর পূর্বকালীন গণ্ডার জন্মের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং মা-কর্তৃক গাত্রলেহনের কষ্ট স্মরণে আসে; ফলতঃ সে জন্মমাত্রই মাতৃসঙ্গ ত্যাগ করে। যদিও পরে গাত্রচর্ম কঠিন হলে সে মায়ের কাছে ফিরে আসে।

পূর্বের জন্মের অনুরূপ ইষ্টজনকত্বের অনুভবের স্মৃতি। সুতরাং, জীবের জন্মান্তর স্বীকার করতেই হয়।

অনেকসময় আমরা দেখি যে, নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য তাকে নানা ধরনের আধুনিক চিকিৎসা-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ও জটিল যন্ত্র তার অঙ্গে স্থাপন করা থাকে। এ তো একধরনের শারীরিক দুঃখ। তাহলে নবজাত শিশু, যার কোন কর্মই নেই, ফলতঃ তার শুভাশুভ কোন ফলপ্রাপ্তিও হতে পারে না। তাহলে কেন তাকে এই ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়? একমাত্র জন্মান্তর স্বীকার করলেই এর সদুত্তর মেলে। পূর্ব পূর্ব জন্মের প্রারব্ধের ফলই ঐ শিশুকে ভোগ করতে হচ্ছে। সুতরাং, কর্মবাদ স্বীকার করলে তার সাথে সমান্তরালভাবে জন্মান্তরবাদও স্বীকার করতে হয়।

বস্তুতঃ জগতে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি কর্মপথ রয়েছে। একটি হল শ্রেয়মার্গ এবং অপরটি হল প্রেয়মার্গ। যিনি প্রেয়মার্গকে বরণ করেন, তিনি ক্ষণস্থায়ী সুখকে প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হন এবং ফলতঃ তার হীনতা প্রাপ্তি হয়; কারণ, সুখমাত্রই আপাত মধুর ও চিত্তাকর্ষক। জাগতিক সুখ মাত্রই তা দুঃখযন্ত্রণার মাধ্যমে লব্ধ। অপরদিকে, শ্রেয়মার্গ ব্যক্তিকে সত্য বা মঙ্গলের দিশা দেখায়। এই কারণে জ্ঞানগিণ এবং অধ্যাত্মমাগী মনীষিগণ, যাঁরা এই পথের পথিক, তাঁরা ইন্দ্রিয়ের জগতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের তুলনায় শাশ্বত আনন্দকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থাপন করেছেন। আসলে এই কর্মপথ দু'টির একটি হল জ্ঞানের পথ এবং অপরটি হল অজ্ঞানের, যাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অজ্ঞান অর্থাৎ প্রেয়মার্গ আমাদের সুখের দিকে অর্থাৎ চির অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সাধারণ বদ্ধ মানুষ ভোগে লিপ্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় এবং এইভাবে জীবন অতিবাহিত করাকেই সুখকর বলে মনে করে। কিন্তু জ্ঞানের অর্থাৎ শ্রেয়মার্গে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই বিচরণ করতে পারেন, যাঁরা

জাগতিক সুখভোগের উন্মত্ততা দেখে ভীত এবং বিতৃষ্ণ হন। জাগতিক প্রাচুর্যে আমরা যতই আত্মহারা হই না কেন, আমাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক মুমুক্ষুত্ব থাকে, যা কখনো কখনো আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। কিন্তু মানুষের মন যখন দুঃখ-যন্ত্রণার মুহূর্তে অন্তর্মুখী হয়, তখন আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার জাগরণ হয়। সুতরাং, অদৃষ্টের বিড়ম্বনাই শিক্ষকের কাজ করে থাকে। সাংসারিক ঘটনাপ্রবাহ অধ্যাত্ম চিন্তন থেকে আমাদের দূরে রাখলেও দুঃখ-দুর্ভাগ্যই আমাদের মনকে ভগবৎমুখী করে তোলে, আমাদের চোখ খুলে দেয়। পুরাণ, উপনিষদ্ সর্বত্র বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞানের জন্য মুমুক্ষু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হবেন। সংসাররূপ দুঃখ-সাগরে যে ক্লেশই আসুক না কেন, ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিভাব বজায় রেখে আত্মনিবেদন করলে ঐ ক্লেশ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। ন্যায়সূত্রকার গৌতমও ব্যক্ত করেছেন যে, জগৎকর্তা পরমেশ্বরই জীবের ধর্মাধর্মরূপ সব কর্মের কারয়িতা ও ফলদাতা। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো ব্যক্তির কোনো কর্মই সফল হয় না; সুতরাং, মুক্তিও হতে পারে না।

দুঃখ থেকে উত্তরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের উল্লেখ না করলে দুঃখ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ জগতে অমঙ্গলের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। জীবনে নানাভাবে দুঃখ যে আসে, তা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। অমঙ্গল যে বাস্তবে ঘটে, তার সাক্ষ্য বহন করে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। তবে, কবি মনে করেছেন, দুঃখ জীবনের কোন চরম বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং তা জীবনের একটা পর্যায়। অর্থাৎ অমঙ্গলকে মঙ্গলের বিরুদ্ধ তত্ত্বরূপে অথবা অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতার বিরোধীরূপে দেখা আমাদের উচিৎ নয়। আমরা এইভাবে দেখি বলেই দুঃখ আমাদের কাছে চরমরূপে বা জীবনের অন্যান্য দিক থেকে বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিপন্ন হয়। কাজেই, সত্যকে আমরা আংশিক বা খণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি, যা আমাদের একেবারেই অনুচিৎ। সত্যকে আমাদের সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত

করে দেখার কথা বলেছেন বিশ্বকবি। দুঃখ বা অমঙ্গলকে যদি এভাবে দেখা হয়, তা হলে তা আর মঙ্গলের অস্বীকৃতি হবে না; বরং তা পরিপূর্ণতায় পৌছানোর একটি পর্যায় হয়ে উঠবে। শিশু হাঁটতে শেখার সময় বারবার পড়ে যায় এবং আঘাতও পায়। এই দৃশ্যটিকে যদি আমরা শিশুর জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তাহলে তা আমাদের কাছে নির্মম মনে হয়; কিন্তু যদি শিশুর হাঁটতে চেষ্টা করার সময়ের এই বারবার পড়া ও আঘাত পাওয়ার অসফলতাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে দেখি, যা তাকে হাঁটতে শেখাবে বলে উপলব্ধি করতে পারি, তা হলে ঐ দৃশ্যটি আর নির্মম না হয়ে আমাদের কাছে আনন্দের উৎস হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে, মৃত্যুর ঘটনাকেও যদি আমরা ব্যক্তির জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে দেখি, তা হলে তা অমঙ্গলজনক বলে প্রতীত হয়। কিন্তু যদি আমরা মৃত্যুকে মহাজীবনের অঙ্গরূপে দেখি, যে মহাজীবন আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে প্রতিনিয়ত ঠেলে নিয়ে চলেছে, তা হলে মৃত্যুকে আমরা আর নির্মম বলব না; বরং মৃত্যুকে সেক্ষেত্রে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি ধাপ বলেই মনে হবে। সুতরাং, রবীন্দ্রদর্শনে অমঙ্গল কোন সমস্যাই নয়, যদি আমরা তা সমগ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। আমিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তা সমস্যা বিশেষ। এই কারণে আমিত্বের চেতনার পরিবর্তে আত্মার চেতনায় উন্নীতকরণই মানুষের অভীষ্ট হওয়া উচিৎ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বিষয়ক দার্শনিক চিন্তন বা উপলব্ধি থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনে দুঃখের হানাহানি প্রকৃত কোন সমস্যাই নয়। কবির জীবনের নানা পর্বে উপলব্ধ মৃত্যু চেতনা ক্রমশঃ দার্শনিক পরিণতি লাভ করেছিল। মৃত্যু তাঁর চিন্তায় পরিণত হয়েছিল অমৃতে; দুঃখ পরিণত হয়েছিল আনন্দে। কবিমন মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। কবির জীবনে একের পর এক প্রিয়জনের অকালমৃত্যুর কশাঘাত ও তাঁর অবিচল থাকা তারই সাক্ষ্য বহন করে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি, পার্থিব বস্তুতে আসক্তি, এমন কি পারিবারিক স্নেহবন্ধন তাঁকে

আবদ্ধ করতে পারেনি। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে যখন কবির মাতৃবিয়োগ ঘটে, তখনও তিনি তাঁর মৃতা মায়ের মুখে দেখেছিলেন প্রশান্তির ছায়া। ''জীবন-স্মৃতি''-তে কবি বলেছেন, ' বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; - সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না।'[২৪৩] কাজেই, সেই বয়সেই কবি তাঁর মৃতা মায়ের মুখে প্রশান্তির ছায়া দেখেছিলেন। কিন্তু কবির চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী পরমাত্মীয় নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ফলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। ''জীবনস্মৃতি''- তে কবি লিখেছেন, 'চারা গাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে - তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা ''নাই'' - অন্ধকার গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই ''আছে'' - আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায়না তখন তাহার মত দুঃখ আর কি আছে।'[২৪৪]

এ তো গেল কবির দুঃখের কথা। কিন্তু আসল কথা হল, মৃত্যুরূপ এই দুঃখের ফলেই কবি জীবন থেকে মুক্তির জগতে প্রথম প্রবেশলাভ করেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯১৭ সালের ২২শে জুন-এর চিঠিতে তিনি লিখেছেন, '......তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচ থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূণ্য হল, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূণ্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে

---

২৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃ - ১৮৪।

২৪৪ জীবনস্মৃতি, পৃ - ১৮৬।

পারিনি। কিন্তু তারপরে সেই প্রচণ্ড বেদনা থেকেই আমার জীবন মুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশলাভ করলে।'[২৪৫] ''জীবনস্মৃতি''-তেও তিনি লিখেছেন, 'তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদী নহি এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম।'[২৪৬] অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্যে যে অনস্তিত্বের অন্ধকার আছে, সেখানেই কবির দার্শনিক মন অস্তিত্বের আলো খুঁজেছিল।

আসলে রবীন্দ্রনাথ গড়ে উঠেছিলেন উপনিষদীয় বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে। তিনি বুঝেছিলেন, ব্যক্তিমানবকে অতিক্রম করে মহামানবকে উপলব্ধি করতে পারলেই এই মরজগতকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। আমাদের অহং অর্থাৎ 'ছোট আমি' আমাদের আত্মকেন্দ্রিক করে দেয়, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই কারণে 'ছোট আমি' নয়, 'বড় আমি' হল আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়, যাকে তিনি কখনো রাজা, কখনো সখা, কখনো প্রিয়া, কখনো বা প্রভুরূপে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এই 'বড় আমি'-ই হলেন জ্যোতির্ময় তেজ পুরুষ, যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং আমাদের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। অহং আমাদের অসীম আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও অহং-এর আবরণ খসে পড়লেই আমরা সেই সত্য, আনন্দময়

[২৪৫] রজতকান্ত রায় সম্পাদিত, জীবনদেবতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃ -১২৬।

[২৪৬] জীবনস্মৃতি, পৃ - ১১৮৬।

পুরুষের সান্নিধ্য পাব। আমাদের আত্মাকে যা তমসাচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি চেয়েছেন মৃত্যুকে জয় করতে। তাই তাঁর আকুল প্রার্থনা -

'হে সবিতা, তোমার কল্যাণতমরূপ

করো অপাবৃত,

সেই দিব্য আবির্ভাবে হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত।'[২৪৭]

কাজেই, কবির জীবনে চব্বিশ বছর বয়সে যে মৃত্যুশোক নেমে এসেছিল তার মাধ্যমেই তিনি শূণ্যতার মধ্যে পূর্ণতাকে, সসীমের মধ্যে অসীমকে, অস্তিত্বের মধ্যে অনস্তিত্বকে খুঁজেছিলেন। মৃত্যুর পটভূমিতে তাঁর জীবনে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়েছিল। এই সময় কবির মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক চেতনার এমন উত্তরণ ঘটেছিল যে, তাঁর পরিণত বয়সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মৃত্যুতেও তাঁর কোন শোকচ্ছাস ঘটেনি, হাহাকার হয়নি; এই মৃত্যুকে তিনি শান্ত, সংযত, সমাহিতরূপে গ্রহণ করেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজের মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনুভব করেছেন; তাই তাঁর মনে কোনো শোক নেই। ''স্মরণ'' কাব্যগ্রন্থে কবি লিখেছেন,

'জানি না কী করে
সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে
মৃত্যু মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন,
আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক -
ওই কথা মনে জানি নাই মোর শোক।'[২৪৮]

তিনি আরো লিখেছেন,

'হে কল্যাণী, গেলে যদি, গেলে মোর আগে,

---

[২৪৭] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জন্মদিনে', কবিতাসংখ্যা - ২৩, রবীন্দ্ররচনাবলী সপ্তম খণ্ড, কামিনী প্রকাশনা, পৃ - ৮৭।

[২৪৮] স্মরণ, কবিতাসংখ্যা - ১৯।

মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে?'[২৪৯]

আবার পরমপ্রিয় কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হলেও পুত্রহারা পিতা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আনন্দময় জগতে কোন মৃত্যুই কোন অভাবের সূচনা করতে পারে না। বিশ্ব সংসারে সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়-নদী, গাছপালা সবই নিজের নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকে। তাই তাঁর লেখায় পাই, 'তার পরের রাত্রে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই।'[২৫০] আসলে উপনিষদীয় রসে পুষ্ট কবির মন বুঝেছিল যে, জগতসংসার থেকে বা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে যা হারিয়ে যায়, তা আসলে আশ্রয় নেয় বিশ্বপিতার চরণে। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি লিখেছেন,

'তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।'[২৫১]

কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যুর পর হতভাগ্য সন্তানহারা পিতা বিশ্বপিতার উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

''আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।''[২৫২]

---

২৪৯ স্মরণ, কবিতাসংখ্যা - ৪।

২৫০ ২৮ শে অগস্ট ১৯৩২-এ মীরাদেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃ -১৫২।

২৫১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্মরণ, কবিতাসংখ্যা - ২, বিশ্বভারতী প্রকাশনা।

২৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পলাতকা, শেষ প্রতিষ্ঠা।

সংসারে দুঃখ তথা মৃত্যু কিছুকেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা ও জয় করার নামই জীবন। জীবন অমর হলে জরা, ব্যাধি, বার্ধক্যের ভারে মানুষ জীবনমৃত হয়েই বেঁচে থাকত; নতুনের প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ হত। কিন্তু আমরা বিশ্বপ্রকৃতিতে এর উল্টোটাই দেখি। অর্থাৎ প্রকৃতিতে শুধু নতুনেরই আবাহন। ফুল পূর্ণতা পায় ফলের মধ্যে দিয়ে; আর ফল শাখা থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনা করে। উপনিষদের রসে সমৃদ্ধ কবির হৃদয় উপলব্ধি করেছিল যে, মৃত্যু আসলে কোন বিচ্ছেদ নয়; তা হল জীবনদেবতার সঙ্গে মিলন, যিনি আমাদের পরম আশ্রয়। তাঁর রাজ্যে কাথাও কোনো দুঃখ নেই, কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো বিরহ যন্ত্রণা নেই; আছে কেবল আনন্দ, শান্তি ও সৌন্দর্য্য। তাই কবি বলেছেন,

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।'

তিনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই সেই অমৃতের স্বাদ পেয়েছিলেন। এই কারণে মৃত্যুকে আপন করে নিতে তাঁর কোনো সংশয় হয়নি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের শোক, তাপ, দুঃখ, মোহ থেকে কবি নিজের জীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন এক পরম আধ্যাত্মিক স্তরে। সুতরাং, এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-এর কথারই অনুরণন ঘটেছে - 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' - অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যুর রাজ্য থেকে অমৃতলোকে আমাকে পরিচালিত কর।[২৫৩]

এই জগত হল আসলে একটি শিক্ষায়তন। এখানে আমরা আসি শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এই শিক্ষালয়ের উর্ধ্বশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী যে যেখানেই থাকি না কেন, তাতে উপাদানগত পার্থক্য নেই; আছে শুধু পরিমাণগত তারতম্য। নিম্নশ্রেণীতে সুখ-দুঃখের অভিব্যক্তি স্থূল; আর,

---

[২৫৩] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ , ১।২।২৮।।

উর্ধ্বশ্রেণীতে সুখ-দুঃখ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম - এটাই পার্থক্য। এই জগতে সুখ-দুঃখের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে আমরা পারি না; কারণ, সুখ-দুঃখের সমগ্র শক্তি সবসময় সমান।

সংসারে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আছে - একথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে যেমন পারব না, তেমনি এই দুঃখকে জয় করার, অতিক্রম করার শক্তিও আমাদের মধ্যে আছে। এই শক্তিকে আবিষ্কারের জন্যই দুঃখের প্রয়োজন। দুঃখকে জয় করতে পারলেই মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটে। সুতরাং, দুঃখই হল মুক্তির সোপান। আসলে, আমাদের মতো সাধারণ বদ্ধজীবের কাছে জগৎ-সংসার দুঃখময় - একথা সত্য হলেও জ্ঞানীর চোখে জগতে দুঃখের কণামাত্রের অস্তিত্ব নেই। স্বামীজী বলেছেন, ‘জগতে দুঃখ আছে - তা আগে প্রমাণ করুন,....।’

আসলে জগতে দুঃখ বলে কিছু নেই। আমাদের চিত্ত যখন প্রসারিত থাকে, তখন দুঃখের তীব্রতা কম থাকে অথবা প্রায় থাকেই না। কিন্তু চেতনার সংকোচন হলে দুঃখের বহর বেড়ে যায়, তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং, দুঃখ হল চেতনার সংকোচনের ফল। আর, চেতনার সংকোচন হল অবিদ্যারই নামান্তর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা নিজেরাই দুঃখ সৃষ্টি করি। কামনা-বাসনা তাড়িত হয়ে খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসি। তাই মাতৃসাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, ‘আমি স্বখাত সলীলে ডুবে মরি শ্যামা....।’’ জগতের প্রাচুর্য্য, বৈচিত্রের মাঝে আমরা আত্মহারা হলেও আমাদের আত্মার একটা স্বাভাবিক মুমুক্ষুত্ব আছে, যা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে মাঝে মাঝে জাগ্রত করে। এই চেতনা জাগ্রত হলে মানুষ জ্ঞান আর অজ্ঞানের পথের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য আছে - তা উপলব্ধি করতে পারে। যে পথ আমাদের সুখের দিকে নিয়ে যায়, তা হল অজ্ঞানতার পথ, কারণ আসক্তি, কামনা-বাসনা, মোহের বশে মানুষ বিষয়ভোগে উন্মত্ত হয়ে যায়। তাই এই পথ হল চির অন্ধকারের পথ। আর, এর বিরোধী হল জ্ঞানের পথ।

জ্ঞানী জাগতিক বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হন এবং জাগতিক সুখের থেকেও শ্রেষ্ঠ কিছু কামনা করেন; কারণ এই প্রকর কামনাই আত্মার সংস্কার। ব্রহ্ম হওয়াই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের নিয়তি। আমরা চেষ্টা করলেই ব্রহ্ম হতে পরি। ব্রহ্মে কোন দুঃখ নেই; কারণ তা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

''ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ ঃ একটি সমীক্ষা'' - আমার গবেষণামূলক নিবন্ধটিতে এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সংসারে দুঃখ থাকলেও সেই দুঃখই আমাদের মুক্তির পথে ধাবিত করায়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, '.... অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্য মাম্।'[২৫৪] অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী যেখানে আমরা জন্মেছি, এর স্বভাবটা সুখ নয়, বরং তা অসুখ বা দুঃখ। আর সমস্যা এখানেই যে, আমরা সবসময় দুঃখকে এড়াতে চাই, সুখ পেতে চাই। জীব মাত্রই দুঃখকে দূর করতে চায় অথবা সুখ পেতে চায়। অর্থাৎ আমাদের কর্ম মাত্রেরই প্রযোজক হয়ে থাকে সুখপ্রাপ্তি অথবা দুঃখ পরিহার। যেমন, শিশু চকলেট পেলে সুখ পায়, নিমপাতায় তার দুঃখ; বিজ্ঞানী কিছু আবিষ্কারের জন্য সারাজীবন কর্ম করে চলেছেন, এটাই তার কাছে সুখ; ধনীর ধনের থেকে, বিদ্যার্থীর বিদ্যার থেকে সুখ আসে। সুতরাং, আমরা সবসময়ই সুখের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছি। কিন্তু আমরা যতই সুখ চাই, সুখ আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, কারণ সংসারে সুখ বিদ্যুতের চমকের মতই ক্ষণিক। সুখ মাত্রই দুঃখের সাথে সম্পৃক্ত। দুঃখের স্বরূপ প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের কথা খুবই তাৎপয্যপুর্ণ। তিনি বলেছেন, একজন মানুষ তীরবিদ্ধ হয়েছে, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় একটি তীর তার গায়ে লাগলো - এটিই হল দুঃখের স্বরূপ। এখানে প্রথম তীরটি হল সংসার আমাদের দিকে যেটা ছুঁড়ে দেয়; অর্থাৎ আমরা আমদের পূর্ব কর্মের ফলে অদৃষ্টবশতঃ আমরা যে দুঃখ পাই, সেটিই হল বুদ্ধ কথিত প্রথম তীর। আর, দ্বিতীয় তীরটি হল আমাদের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার জন্যই দেখা যায়, একই রোগগ্রস্ত দু'জন মানুষের একজন

---

[২৫৪] গীতা, অধ্যায় - ৯, শ্লোক - ৩৩।

রোগটির প্রতি বেপরোয়া, আর অপরজন মন থেকে ভেঙে পরেছে। সংসারের ধর্মই হল দুঃখময়তা। এই কারণেই সংসার সম্বন্ধে বুদ্ধ বলেছেন,

অনিত্যং অনিত্যং সর্বং অনিত্যম্
ক্ষণিকং ক্ষণিকং সর্বং ক্ষণিকম্
শূণ্যং শূণ্যং সর্বং শূণ্যম্
যেহেতু সংসার অনিত্য, যেহেতু তা ক্ষণিক, যেহেতু তা শূণ্য,
অতএব, দুঃখং দুঃখং সর্বং দুঃখম্ ।

সাংসারিক সুখ আমাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। অর্থ, বিদ্যা ইত্যাদি ব্যক্তিভেদে সুখের পরাকাষ্ঠা হলেও সেগুলি আমাদের জীবনে পূর্ণতা প্রদান করতে সমর্থ নয়। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, ঘর্ষণের ফলে হীরে যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে পুড়ে মানুষ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে। দুঃখময় জগতে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা থাকলেও তা দূর করার শক্তিও আমাদের মধ্যে রয়েছে। আর সেই শক্তিকে আবিষ্কারের জন্যই দুঃখের প্রয়োজন। দুঃখই মানুষকে আনন্দের উৎসের সন্ধান দিতে পারে। দুঃখকে জয় করেই আনন্দলোকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং, দুঃখই হল মুক্তির সোপান। আসলে জীবাত্মার গতি সবসময় পূর্ণতার দিকে ছোটে, তা সে মন্থর গতিতে হোক বা দ্রুত গতিতে। জীবাত্মার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে ব্রহ্ম হওয়ার মধ্যে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হওয়াই আমাদের জীবনের নিয়তি। ব্রহ্মে দুঃখের কোন যোগ নেই। পার্থিব জগতের দুঃখ-কষ্টকে জয় করে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই জীবাত্মার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজী গ্রন্থসমূহ ঃ

Bhattacharya, Gopinath, *Essays In Analytical Philosophy*, Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1989.

Bhattacharya, Sailajakumar, *Vaidika Ethics: An Analytical Approach*, Calcutta, Department of Philosophy, Jadavpur University, 2000.

Billimoria, Purushottama. Joseph Prabhu, et al., editors., *Indian Ethics*, New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Bose, Roma. *Vedanta Parijata-Saurabha of Nimbarka and Vedanta-Kaustubha of Srinivasa,(Vol : III)* Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 19433.

Chatterjee, Suniti Kumar., et al., editors., *The cultural Heritage Of India, (Vol : I)*, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute Of Culture, 2006.

Dasgupta, Surama, *Development of Moral Philosophy in India*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Second edition,1994.

De, S.K., et al., editors. *The Cultural Heritage Of India, (Vol :II)*, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute Of Culture, 2006.

Ghate, V.S., *Vedānta : A Study of The Brahma-Sūtras with the Bhāsyas of Śaṁkara, Rāmānuja, Nimbārka, Madhva and Vallabha*, V.G. Paranjpe (ed.), Poona,, Bhandarkar Oriental Research Instititute, 1926.

Hiriyanna. M., *Outlines of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 2009.

Maitra, Sushil Kumar, *The Ethics Of The Hindus*, Calcutta, University of Calcutta, Third edition, 1963.

Mohanty, J.N., *Theory and Practice*, Calcutta, Allied Publishers Limited in collaboration with Jadavpur University, First Publication, 1994.

Nag, Anita, *Six Systems of Vedānta Philosophy*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, First Publication, 1986.

O'Flaherty, wendy Doniger editor, *Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Reprint of first edition, 1999.

Olivelle, Patrick editor, *Dharma Studies in its Semantic, Cultural and Religious History*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, First Edition, 2009.

Rao, P. Nagaraja, *Introduction to Vedānta*, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, First Publication, 1958.

Sharma, B.N.K., *Philosophy of Sri Madhavācārya*, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, First Publication, 1962.

Sharma, I.C., *Ethical Philosophies of India*, Stanley M. Daugert editor, London, George Allen &Unwin LTD., 1965.

Sharma, Ratna Dutta, *Philosophical Discourse : It's Nature and Types in the Nyāya Philosophy*, Kolkata, Allied Publishers Pvt. Ltd. In collaboration with Jadavpu University, First edition, 2002.

Srinivasachari, P.N. *The Philosophy of Bhedābheda*, Madras, The Adyar Library, Second Edition, 1950.

বাংলা গ্রন্থসমূহ ঃ

অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত* , শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

অন্নংভট্ট, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ,* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় সংস্করণের পুনঃ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

আরণ্য, হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী,* গৌরীনাথ শাস্ত্রী অনূদিত ও বিবৃত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০।

উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি,* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য তর্কবেদান্ততীর্থ অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫।

উদ্দ্যোতকর, *গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক,* অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ, ১৯৯৭।

কবিরাজ, গোপীনাথ, *ভারতীয় সাধনার ধারা,* কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, সংস্কতৃ মহাবিদ্যালয় গবেষণা গন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক - ৩২, ১৯৬২ ।

কবিরাজ, বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, পুস্তক, ৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তম সংস্করণ১৯৬২-এর ৪০তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ১৯৬৪ -এর ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগ*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৬৫ -এর ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭।

গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৩।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (তৃতীয় খণ্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (চতুর্থ খণ্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খণ্ড)*, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৯।

চক্রবর্তী, অরিন্দম, *মননের মধু* গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।

চ্যাটার্জী, অমিতা সম্পাদিত, *ভারতীয় ধর্মনীতি*, কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

জৈমিনি, *মীমাংসা-দর্শনম্ প্রথম খণ্ড*, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১৩-এর পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬।

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়পরিচয়,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।

ন্যায়াচার্য, গঙ্গাধর কর, *মহাজীবনের অন্তরালে,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৯।

ন্যায়াচার্য, গঙ্গাধর কর, *নীল আকাশের নীচে,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২১।

প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথমভাগ),* শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ ও দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্য (দ্বিতীয়ভাগ),* দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ (১৪০৭ বঙ্গাব্দ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ, *ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ,* কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

বাৎস্যায়ন, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শনভাষ্য,* অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ্ , নিউ দিল্লী, ১৯৯৭।

বিদ্যারণ্য, স্বামী, *গীতাধর্ম,* কলিকাতা, মুক্তা, ১৯৮৩।

বিবেকানন্দ, স্বামী, *আমার ভারত অমর ভারত,* স্বামী সুপর্ণানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৫।

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী অনূদিত, *বেদান্তদর্শনম্,* কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ এর পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪।

বেদব্যাস, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, তুলি-কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮।

বেদব্যাস, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, তুলি-কলম, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৩।

বেদব্যাস, *গরুড় পুরাণ,* গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩।

বেদব্যাস, *বেদান্ত-দর্শনম্* (শারীরকভাষ্য ও শ্রীভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ সংযুক্ত), পন্ডিত শ্রীনলিনীনাথ রায় ভাষ্যানুবাদক, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বাংলা ১৩৪১।

বেদব্যাস, *মহাভারত*, রাজশেখর বসু অনূদিত, কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, *ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মুক্তবলীটীকাসহ)*, কলিকাতা, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা, *অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য্য, সুখময়, *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশের দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬।

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

মনু, *মনুসংহিতা*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত, কলকাতা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহঃ*, বিশ্বরূপ সাহা কর্তৃক সরল আলোচনা, কলকাতা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহ*, স্বামী ভর্গানন্দ অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

শর্মা, রত্না দত্ত, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক্ এজেন্সী, ২০১১।

শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ভারতীয় দর্শনকোষ (২য় খন্ড)*, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৪।

শ্রীকৃষ্ণযজ্ব, *মীমাংসা পরিভাষা,* স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশের দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

শ্রীম, *শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম খণ্ড,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭-এর ৪২তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৬।

শ্রীম, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭-এর ৪১তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫।

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ, ২০১১।

সরস্বতী, মধুসূদন, *গূঢ়ার্থদীপিকা,* নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত ও ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬।

সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও রত্না দত্ত শর্মা সম্পাদিত, *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।

সারদানন্দ, স্বামী, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ প্রথম ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৬০-এর ৩৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬।

সারদানন্দ, স্বামী, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, একাদশ সংস্করণ ১৯৬৩-এর ৪০তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬।